প্রথম প্রকাশ :
২৯ শ্রাবণ ১৩৬৭

প্রকাশক :
শর্মিলা পাল
ভূর্জপত্র
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৪

মুদ্রক :
শিবনাথ পাল
প্রিণ্টেক
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৪

সরলা

এরেন্দিরা

আর

তার নিদয়া ঠাকুমার অবিশ্বাস্য

করুণ কাহিনী

সূচিপত্র

পরিশিষ্ট ১

পরিশিষ্ট ২

অনুবাদকের উৎসর্গ

মিত্রা ও প্রবোধ পারিখকে

গার্সিয়া মার্কেসের দিগ্বিজয়ের সঙ্গীদের

সরলা এরেন্দিরা
আর তার নিদয়া ঠাকুমার অবিশ্বাস্য করুণ কাহিনী

এরেন্দিরা যখন তার ঠাকুমাকে স্নান করাচ্ছিলো তখনই তার দুর্ভাগ্যের হাওয়া শোঁ-শোঁ ক'রে বইতে লাগলো। তার প্রথম হামলাটা হানা দিতেই মরুভূমির নিঃসঙ্গতার মধ্যে জ্যোৎস্নার কংক্রিটে গড়া বিশাল প্রাসাদটার ভিৎশুদ্ধ কেঁপে উঠতে লাগলো। কিন্তু এরেন্দিরা আর তার ঠাকুমা সেখানে ত্যাঁদড় বন্য প্রকৃতির আচম্বিত ঝুঁকিগুলোতেই অভ্যস্ত ছিলো, সার-সার ময়ূর আর রোমক বাথটবের রঙিন কাচের ছেলেমানুষি ফালিতে সাজানো হামামটার মধ্যে দুজনের কেউই হাওয়ার কারদানিকে কোনো পাত্তাই দেয়নি।

মর্মরপাথরে তৈরি বাথটবটায় ন্যাংটো আর প্রকাণ্ড ঠাকুমাকে দেখাচ্ছিলো বিশাল এক অপরূপ শাদা তিমির মতো। এই সবে চোদ্দয় পড়েছে নাৎনি, কেমন যেন অবসাদে নেতিয়ে আছে সে, নিস্তেজ, তার অস্থিপঞ্জর এখনও নরম আর বয়সের তুলনায় সে ভারি ভদ্র আর বিনম্র। কেমন-একটা কুণ্ঠাকৃপণ ভঙ্গিতে, যার মধ্যে এক ধরনের ধর্মভীরু কঠোর সংযতভাব মেশানো, সে তার ঠাকুমাকে স্নান করাচ্ছে এমন জলে যা ফুটিয়ে নেয়া হয়েছে ওষধি আর সুগন্ধি লতাপাতায়, আর লতাপাতাগুলো লেপটে থাকছে ঠাকুমার শাঁসালো পিঠটায়, ধাতুরঙা খোলা এলো চুলে, আর তাঁর জমকালো কাঁধ দুটোয়, আর সেগুলো এমন ক্ষমাহীনভাবে উলকিদাগা যে খালাশিদেরও তা যেন লজ্জায় ফেলে দিতো।

'কাল রাতে আমি স্বপ্ন দেখলাম যে আমি একটা চিঠির জন্যে হা ক'রে ব'সে আছি,' ঠাকুমা বললেন।

এরেন্দিরা—এড়িয়ে-যাওয়া নেহাৎই অসাধ্য না-হ'লে যে পারতপক্ষে কখনোই কথা বলে না—জিগেশ করলে :

'স্বপ্নের মধ্যে সেটা কী বার ছিলো?'

'বিষ্যুৎবার।'

'তাহ'লে খারাপ খবর ছিলো চিঠিটায়,' এরেন্দিরা বললে, 'তবে সেটা আর কোনোদিনই এসে পৌঁছুবে না।'

যখন সে তার ঠাকুমাকে স্নান করানো সারলে, এরেন্দিরা তাঁকে তাঁর শোবার ঘরে নিয়ে গেলো। ঠাকুমা মানুষটা এমনই বিপুলা যে হয় তাঁর নাৎনির কাঁধে ভর দিয়ে আর নয়তো বিশপের দোর্দণ্ডের মতো একটা লাঠির ওপর ভর রেখেই শুধু চলাফেরা করতে পারেন, তবে তাঁর যাবতীয় দুঃসাধ্য চেষ্টা চালাবার সময়েও তাঁর নড়াচড়ায় এক অতীব-প্রত্ন কোনো মহিমার শক্তি প্রকাশ পায়। শোবার ঘরে গিয়ে—ঘরটা, পুরো বাড়িটার মতোই, কেমন যেন মাথা-ঘুরিয়ে-দেবার-মতো রুচির বড্ড বেশি-বেশি আশবাব দিয়ে ঠাশা—তার ঠাকুমাকে সাজিয়ে তৈরি ক'রে দিতে এরেন্দিরার দরকার হ'লো আরো দু-ঘণ্টা। গুছির পর গুছি খুলে-খুলে সে জট ছাড়ালে চুলের, তারপর গন্ধ ছিটিয়ে তা আঁচড়ে দিলে, নিরক্ষীয় ফুল-ফুল কাটা এক পোশাক চাপালে গায়ে, মুখে বুলিয়ে দিলে ট্যালকাম পাউডার, ঠোঁটে মাখালে উজ্জ্বল-লাল ওষ্ঠরঞ্জনী, গালে বোলালে লালিমা, চোখের পাতায় কস্তুরী, নখের ওপর মুক্তোর প্রলেপ, আর যখন সে তাঁকে সাজিয়ে তুললো যেন জীবন্ত প্রাণীর চেয়েও অতিকায় কোনো পুতুল, সে তাঁকে নিয়ে এলো দমআটকানো সব ফুলে ভরা গন্ধেঝিমঝিম এক কৃত্রিম বিতানে, ফুলগুলো যেখানে তাঁর পোশাকের ফুলগুলোর মতোই নিরক্ষীয়; এনে তাঁকে বসালে মস্ত এক চেয়ারে যার ভিৎ আর বংশপরিচয় কোনো সিংহাসনের মতো, আর তাকে সে সেখানে রেখে এলো উৎকর্ণ, কান পেতে শুনছেন সব হারিয়ে-যাওয়া রেকর্ড এমন-এক ফোনোগ্রাফে বাজছে, যার স্পীকারটা ঠিক যেন মস্ত এক চোঙা, যেন একটা মেগাফোন।

...

দিদিমা যখন ভেসে চলেছেন অতীতের সব জলায়, এরেন্দিরা নিজেকে ব্যস্ত রাখলে বাড়িটা ঝাঁট দিতে; বাড়িটা অন্ধকার আর রংচঙে, উদ্ভট আর আজব সব আশবাব আর উদ্ভাবিত সব কায়েসারদের মূর্তিতে ঠাশা; তেলস্ফটিকের দেবদূত আর অশ্রুস্ফটিকের ঝাড়লণ্ঠন, সোনা-রং-করা এক পিয়ানো, আর অভাবনীয় সব আকার ও রূপের অগুনতি ঘড়ি। উঠোনে আছে মস্ত এক ঢাকা চৌবাচ্চা, জল জমিয়ে রাখবার জন্যে—দূর-দূর ঝরনা থেকে ইণ্ডিয়ানদের পিঠে-পিঠে অনেক বছর ধ'রে এসেছে এ-জল; আর চৌবাচ্চার দেয়ালের গায়ে একটা আংটায় বাঁধা এক ভাঙাচোরা উটপাখি—সে-ই একমাত্র পাখাওলা জীব যে এই অভিশপ্ত আবহাওয়ার নিত্যযন্ত্রণায় টিকে থাকতে পেরেছে। সবকিছু থেকেই অনেক, অনেক দূরে এই বাড়িটা, মরুভূমির ঠিক বুকের ওপর, এমন-একটা বসতির পাশে যার রাস্তাগুলো সব ভারি-দুঃস্থ আর আগুনজ্বলা যেখানে ছাগলেরা দল বেঁধে আত্মহত্যা করে যখন

দুর্ভাগ্যের হাওয়া বইতে থাকে শনশন, তোড়ে, আর ছাগলদের বেজায় মন খারাপ হ'য়ে যায়।

এই দুর্জ্ঞেয় আশ্রয়টি গ'ড়ে ছিলেন ঠাকুমার স্বামী, এক চোরাচালানকারী যাঁকে নিয়ে রচিত হয়েছিলো অতিকথা আর কিংবদন্তি, যাঁর নাম ছিলো আমাদিস; তারই মারফৎ ঠাকুমার এক ছেলে হয়েছিলো যারও নাম ছিলো আমাদিস, যে ছিলো এরেন্দিরার বাবা। এই পরিবারের উৎসই বা কী আর অভিপ্রায়ই বা কী, তা কেউ জানতো না। ইণ্ডিয়ানদের ভাষায় সবসেরা যে-সংস্করণটি পাওয়া যায় তা এই: পিতা আমাদিস নাকি আন্তিইয়ের এক গণিকালয় থেকেই তাঁর রূপসী স্ত্রীকে উদ্ধার ক'রে এনেছিলেন, সেখানে ছুরির চকমকিতে তিনি খুন করেছিলেন কাকে যেন, তারপর স্ত্রীকে এনে তিনি রোপণ করেছিলেন মরুভূমির ঝুঁকিবিরহিত শান্তির মাঝখানে। আমাদিসরা যখন ম'রে গেলো—একজন মরলো বিমর্ষ জ্বরে-তাপে আর অন্যজন একটি মেয়েকে নিয়ে ঝগড়া করতে গিয়ে গুলিতে-গুলিতে ঝাঁঝরা হ'য়ে—ঠাকুমা তাদের মৃতদেহগুলো কবর দিয়েছিলেন উঠোনে, তাড়িয়ে দিয়েছিলেন চোদ্দজন খালি-পা তরুণী দাসী; আর সেই চোরা-উঁকি-মারা বাড়ির ছায়ায় জমকালো সব মহিমার স্বপ্নেই বিভোর হ'য়ে জাবর কাটতে লাগলেন তারপর, বেজন্মা নাৎনিটির যাবতীয় ত্যাগের সৌজন্যে—তাকে তিনি নিজেই জন্ম থেকে লালন করেছেন।

শুধু দম দিয়ে-দিয়ে ঘড়িগুলোর কাঁটা ঠিক সময়ে এনে বসাতে ছ-ঘণ্টা লাগতো এরেন্দিরার। তার দুর্ভাগ্য যেদিন শুরু হ'লো সেদিন তাকে তা করতে হয়নি কারণ পরদিন সকাল অব্দি চলবার মতো যথেষ্ট দম ছিলো ঘড়িগুলোর, কিন্তু, অন্যদিকে আবার, তাকে স্নান করাতে হয়েছিলো ঠাকুমাকে, বিস্তর পোশাক পরিয়ে সাজাতে হয়েছিলো, মুছতে হয়েছিলো মেঝে, পাকাতে হয়েছিলো দুপুরের খানা, ঘ'ষে-মেজে ঝকঝকে ক'রে দিতে হয়েছিলো স্ফটিকের বাসনকোশন। এগারোটা নাগাদ, যখন সে উটপাখির বাটিটার জল পালটে দিচ্ছে আর আমাদিসদের যুগল কবরের ওপর গজানো মরুভূমির কাঁটাঝোপে জল দিচ্ছে, তাকে যুদ্ধ করতে হচ্ছিলো বাতাসের রোষের বিরুদ্ধে: ততক্ষণে অসহ্য হ'য়ে উঠেছে হাওয়া, তবু সে তখনও ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি যে এ তারই দুর্ভাগ্যের হাওয়া শন-শন ক'রে বইছে। বেলা বারোটায় সে যখন শ্যামপেনের শেষ গেলাশগুলো মুছছে তখন তার নাকে এলো শুরুয়ার সুঘ্রাণ আর তাকে, পেছনে ভিনিসীয় কাচের ঝনঝনে ধ্বংসস্তূপ না-রেখেই, রান্নাঘরে ছুটে যাবার মতো অলৌকিক কীর্তিটা করতে হ'লো।

উথলে উপচে পড়ার আগেই ডেকচিটা কোনোক্রমে সে উনুন থেকে নামাতে পেরেছিলো। তারপর সে উনুনে চাপালে একটা স্টু যেটা সে আগেই তৈরি ক'রে রেখেছিলো আর এই ফাঁকে সে সুযোগ পেয়েছিলো রান্নাঘরের একটা চৌকির ওপর ব'সে একটু জিরিয়ে নেবার। দু-চোখ মুদেছিলো সে, আবার খুলে ফেলেছিলো, অবসাদের এক অভিব্যক্তি সমেত, তারপর শুরুয়া ঢালতে শুরু করেছিলো স্যুপের বড়ো ঢাকাওলা বাটিটায়। ঘুমোতে-ঘুমোতেই কাজ করছিলো এরেন্দিরা।

ভোজটেবিলের মাথাটায় ঠাকুমাই বসেছিলেন একা-একা, যদিও রুপোর শামাদানে মোমবাতি জ্বালানো হয়েছিলো বারোজন লোকের কথা ভেবে। তিনি তাঁর ছোট্ট ঘুন্টিটা বাজালেন আর প্রায় তক্ষুনি এরেন্দিরা এসে পৌঁছুলো ধোঁয়া-ওঠা স্যুপের বাটি নিয়ে। এরেন্দিরা যখন তাঁর বাটিতে স্যুপ ঢালছে ঠাকুমা তার ঘুমের ঘোরে কাজ করার ভঙ্গিটা খেয়াল করলেন আর নিজের হাতটা তার চোখের সামনে নড়ালেন যেন কোনো অদৃশ্য কাচের পাল্লা মুছছেন এমনভাবে। কিশোরী হাতটা দেখতেই পায়নি। ঠাকুমা চোখে-চোখেই তাকে অনুসরণ করলেন আর তারপর যখন এরেন্দিরা রান্নাঘরে ফিরে যাবার জন্যে ঘুরেছে, তিনি তাকে উদ্দেশ ক'রে হাঁক পাড়লেন :

'এরেন্দিরা!'

আচমকা জেগে গিয়ে কিশোরী স্যুপের বাটিটা হাত থেকে মেঝের ফরাশের ওপর ফেলে দিলে।

'ও ঠিক আছে, বাছা,' মমতা প্রকাশ ক'রে ঠাকুমা তাকে বললেন। 'আবারও তুই হাঁটতে-হাঁটতে ঘুমিয়ে পড়েছিলি!'

'আমার শরীরটার ও-রকম একটা অভ্যেস আছে.' কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে বললে এরেন্দিরা।

তখনও সবকিছু ঘুমে আবছা, এরেন্দিরা স্যুপের বাটি তুলে নিয়ে ফরাশ থেকে দাগটা সাফ করবার চেষ্টা করলে।

'ছেড়ে দে এখন,' ঠাকুমা তাকে বিরত হ'তে পরামর্শ দিলেন। 'বিকেলেই না-হয় এটা তুই ধুয়ে নিস।'

ফলে তার নিয়মিত বৈকালী কাজকর্মের সঙ্গে-সঙ্গে এরেন্দিরাকে খাবারঘরের ফরাশটাও ধুতে হ'লো, আর ধোবার গামলার কাছেই যখন এসে পড়েছে তখন সে সোমবারের ধোয়াধুয়ির কাজটাও সেরে নিলে, আর সারাক্ষণ হাওয়া বাড়িটাকে ঘিরে হা-হা হা-হা করলো, ভেতরে ঢোকবার একটা পথ হাৎড়ে। তাকে এত-

সমস্ত কাজ করতে হ'লো যে সে কিছু বুঝে-ওঠবার আগেই রাত্তির এসে চড়াও হ'লো, আর যখন সে খাবার ঘরের ফরাশটা আবার সবে পেতেছে, তখনই এসে হাজির শোবার সময়।

সারা বিকেল ধ'রে ঠাকুমা পিয়ানোয় ব'সে খেলা করছিলেন, রিনরিনে নকল গলায় গাইছিলেন তাঁর আমলের সব গান, আর চোখের পাতায় লেগেছিলো অশ্রু আর কস্তুরীর দাগ। কিন্তু যখন তিনি মশলিনের রাতকাপড় প'রে তাঁর বিছানায় শুলেন সুখস্মৃতির তিক্ততারা সদলবলে ফিরে এলো।

'কালকে সুযোগ ক'রে বসার ঘরের ফরাশটাও ধুয়ে নিস,' তিনি বললেন এরেন্দিরাকে। 'শোরগোলের সব দিনগুলোর পর এটা একদিনও আর রোদের মুখ দ্যাখেনি।'

'সি, আবুয়েলা,' কিশোরী উত্তর দিলে।

তার অপ্রশম্য কর্ত্রীঠাকরুনকে হাওয়া করবার জন্যে সে একটা পালকের পাখা তুলে নিলে, আর তিনি ঘুমের মধ্যে তলিয়ে যেতে-যেতে আউড়ে গেলেন নৈশ হুকুমের ফর্দটা।

'শুতে যাবার আগে সব কাপড়চোপড় ইস্ত্রি ক'রে নিস, তাহ'লেই তুই বিবেকের তাড়না ছাড়াই ঘুমোতে পারবি।'

'সি, আবুয়েলা।'

'কাপড় রাখার চোরকুঠুরিগুলো ভালো ক'রে দেখে নিবি, কারণ পোকাগুলো ঝোড়ো হাওয়ার রাতেই খিদেয় হন্যে হ'য়ে যায়।'

'সি, আবুয়েলা।'

'তারপর হাতে যে-সময় থাকবে সেই ফাঁকে ফুলগুলো উঠোনে নিয়ে যাবি যাতে তারা টাটকা হাওয়ায় দম নিতে পারে।'

'সি, আবুয়েলা।'

'আর উটপাখিটাকে খাইয়ে দিবি।'

ঠাকুমা ঘুমিয়ে পড়েছেন কিন্তু তবু হুকুমগুলো দিয়েই চলেছেন পর-পর, কারণ তাঁর নাৎনি তাঁর কাছ থেকেই উত্তরাধিকার পেয়েছে ঘুমোতে-ঘুমোতে বেঁচে থাকার। এরেন্দিরা নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো, এক-এক ক'রে রাতের কাজ হাতের কাজ সারলো, তখনও সে ঘুমন্ত ঠাকুমার হুকুমগুলোর উত্তর দিয়ে চলেছে।

'কবরগুলোয় একটু জল দিবি।'

'সি, আবুয়েলা।'

'আর আমাদিসেরা যদি এসে হাজির হয়, ওদের ব'লে দিবি ভেতরে যেন না-ঢোকে,' ঠাকুমা বললেন, 'কারণ পোরফিরিও গালানের দলবল ওদের খুন করবার জন্যে ওৎ পেতে আছে।'

এরেন্দিরা তাঁকে আর-কোনো উত্তর দিলে না, কারণ সে বুঝে গিয়েছে তার ঠাকুমা এতক্ষণে তাঁর প্রলাপে-বিকারে হারিয়ে গিয়েছেন, কিন্তু সে তাঁর একটিও হুকুম অমান্য করেনি। জানলার খিলগুলো লাগানো আছে কি না এক-এক ক'রে দেখে নিয়ে, শেষ আলোগুলো পর-পর নিভিয়ে দেবার পর সে খাবার ঘর থেকে একটা মোমবাতি তুলে নিয়ে আলো ফেলে-ফেলে চ'লে এলো তার নিজের শোবার ঘরে ; হাওয়ার উৎপাত মাঝে-মাঝে যখন থামে তখন তার ঘুমন্ত ঠাকুমার শান্ত ও বিশাল নিশ্বাসের শব্দে বাড়িটা ভ'রে যায়।

তার নিজের ঘরটাও বিলাসবৈভবে ভরা তবে ঠাকুমার ঘরটার মতো অত নয়, আর রাশি-রাশি ন্যাকড়ার পুতুল আর দম-দেয়া সব জীবজন্তুতে বোঝাই ঘরটা তার সদ্যসমাপ্ত শৈশবেরই স্মরণচিহ্ন। দিনের ফুরসৎহীন বর্বর খাটাখাটুনিতে বিধ্বস্ত, এরেন্দিরার সেই শক্তিটুকুও আর ছিলো না যে পোশাক খোলে কিংবা শামাদানটিকে রাখে রাতচৌকিতে : সে ধপ ক'রে প'ড়ে গেলো বিছানায়। একটু পরেই তার দুর্ভাগ্যের হাওয়া সশরীরে তার শোবার ঘরে এসে হাজির হ'লো একদল খ্যাপা ডালকুত্তার মতো আর মোমবাতিটাকে উলটে দিলে পর্দার গায়ে।

...

ভোরবেলায় বাতাস যখন অবশেষে থামলো, কয়েকটা ভারি-ভারি বৃষ্টির ফোঁটা পড়লো এদিক-ওদিক, নিভিয়ে দিলো শেষ অঙ্গারগুলো, আর প্রাসাদটির ধূমায়িত ভস্মকে শক্ত ও জমাট ক'রে তুললো। গাঁয়ের লোকে—বেশির ভাগই তারা ইণ্ডিয়ান—চেষ্টা করেছিলো অগ্নিকাণ্ড থেকে যা বেঁচেছে উদ্ধার করতে : উটপাখির দগ্ধীভূত মৃতদেহ, সোনায় মোড়া পিয়ানোর কাঠামো, একটা কবন্ধ ও অঙ্গহীন পাথরমূর্তি। দুর্ভেদ্য এক মনখারাপের ঘোরে ঠাকুমা তাকিয়ে-তাকিয়ে ভাবছিলেন তাঁর এত ঐশ্বর্যের এখন কীই বা আর অবশিষ্ট আছে। এরেন্দিরা—দুই আমাদিসের কবরের মাঝখানে ব'সে—এতক্ষণে শেষ করেছে তার কান্না। ঠাকুমা যখন শেষ অব্দি বিশ্বাস করলেন যে এই তাণ্ডবের মধ্যে খুবই কম জিনিশ আছে আস্ত ও অবিকৃত, তিনি সত্যিকার দয়ায় ভ'রে গিয়ে তাঁর নাৎনির দিকে তাকালেন।

'বেচারা,' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ঠাকুমা। 'এই দুর্ঘটনায় গচ্চা যাওয়া সবকিছুর দাম ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে তোর সারা জীবনটাও যথেষ্ট দীর্ঘ হবে না।'

সেদিন থেকেই এরেন্দিরা বকেয়া চুকিয়ে দিতে শুরু করলে; শুরু করলে বৃষ্টির কোলাহলের তলায়, যখন তাকে নিয়ে যাওয়া হ'লো গাঁয়ের মুদির দোকানটার মালিকের কাছে, সে এক শুঁটকো অপরিণত বিপত্নীক, কুমারীত্বের জন্যে ভালো দাম দেয় ব'লে মরুভূমিতে যার নাম সব্বাই জানে। বিন্দুমাত্র ঘাবড়ে না-গিয়ে ঠাকুমা যখন অপেক্ষা করছেন, বিপত্নীকটি বৈজ্ঞানিকের মতো নিরাসক্ত নিস্পৃহ কঠোর চোখে এরেন্দিরাকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখলে: সে আন্দাজ ক'রে নিলে তার উরু দুটোর শক্তি, তার স্তনের আকার, তার নিতম্বের ব্যাস। তার দাম কী হবে সেটা মনে-মনে হিশেব না-ক'রে, সে একটাও কথা বললে না।

'এখনও বড্ড কচি আছে,' সে বললে তার পরে। 'চুঁচি দুটো তো ঠিক কুত্তির মতো।'

তারপর মুদিয়ালি এরেন্দিরার মাপজোক হিশেব-টিশেব প্রমাণ করবার জন্যে তাকে চড়ালে দাঁড়িপাল্লায়। এরেন্দিরার ওজন নব্বুই পাউণ্ড।

'বড়ো জোর একশো পেসো, তার চাইতে এর দাম মোটেও বেশি নয়,' বললে বিপত্নীকটি।

কেলেঙ্কারি দেখে আঁৎকে উঠলেন ঠাকুমা।

'একেবারে আনকোরা কোনো ছুঁড়ির জন্যে কুললে একশো পেসো!' প্রায় চেঁচিয়েই উঠলেন ঠাকুমা। 'না, সেনিওর, তাতে বোঝা যায় যৌন শুদ্ধতার প্রতি আপনার শ্রদ্ধার অভাবটা শোচনীয় ও বিষম।'

'আমি দেড়শো পর্যন্ত উঠতে পারি,' বিপত্নীক বললে।

'এই মেয়ে আমার যা লোকশান করেছে তা দশ লক্ষ পেসোরও বেশি,' ঠাকুমা বললেন। 'এই হারে চললে আমার সব টাকা শুধে দিতে ওর দুশো বছর লাগবে।'

'আপনার বরাৎ ভালো যে ওর গুণ বলতে একটাই জিনিশ আছে—সে হ'লো ওর বয়েস,' বিপত্নীক বললে।

তুফান বাড়িটাকে উপড়ে ফেলবে ব'লেই ভয় দেখালে, আর ছাতে এতই ফুটোফোকর যে বাইরে যত ভেতরেও প্রায় ততটাই বৃষ্টি পড়ছে। ঠাকুমার মনে হ'লো সর্বনাশের এই জগতে তিনি একেবারে নিঃসঙ্গ হ'য়ে পড়েছেন।

'অন্তত তিনশো অব্দি বাড়ান,' ঠাকুমা বললেন।

'আড়াইশো।'

শেষটায় তাঁদের রফা হ'লো নগদ দুশো কুড়ি পেসোয় আর বাকি দাম

মেটানো হবে খাবারদাবারে। ঠাকুমা তখন এরেন্দিরাকে ইঙ্গিত করলেন বিপত্নীকের সঙ্গে যেতে, আর মুদিয়ালি তার হাত ধ'রে তাকে পেছনের ঘরে নিয়ে গেলো—যেন সে তাকে নিয়ে পাঠশালায় যাচ্ছে।

'আমি তোর জন্যে এখানেই অপেক্ষা করবো,' ঠাকুমা বললেন।

'সি, আবুয়েলা,' বললে এরেন্দিরা।

পেছনের ঘর, অর্থাৎ একটা চালা ঘর, ইটের তৈরি চারটে থাম, পচা হাজা তালপাতার ছাউনি, তিন ফুট উঁচু একটা আদোবে [পোড়ামাটির] দেয়াল, যার ভেতর দিয়ে বাইরের যাবতীয় গণ্ডগোল দালানটার মধ্যে গিয়ে ঢোকে। আদোবে পাঁচিলের ওপরে নানারকম হাঁড়ি-পাতিলে ফণিমনসা আর অন্যান্য রুক্ষ-মাটির উদ্ভিদ বসানো। দুটো থামের মাঝখান থেকে ঝুলছে, কোনো হু-হু ভেসে-যাওয়া ডিঙির খোলা পালের মতো ডানা ঝাপটাচ্ছে, একটা বিবর্ণ রংচটা দোলখাটিয়া। ঝড়ের শিস আর জলের ঝাপটা ছাপিয়ে কেউ শুনতে পেতো দূরের সব চীৎকার, কোথাও অনেক দূর থেকে গর্জন করছে বুনো জানোয়ার, কোথাও-বা উঠছে নৌকাডুবির আর্তনাদ।

এরেন্দিরা আর বিপত্নীকটি যখন চালাটার মধ্যে এসে ঢুকেছিলো তাদের আঁকড়ে ধরতে হয়েছিলো পরস্পরকে, বৃষ্টির দমকা যে-ঝাপটা তাদের সপসপে ভিজিয়ে চ'লে যাচ্ছে সেটা যাতে তাদের মাটিতে আছড়ে না-ফ্যালে। গলার স্বর শোনা যাচ্ছিলো না বটে কিন্তু তুফানের গরগর ছাপিয়ে স্পষ্ট শুনতে পারা যাচ্ছিলো তাদের নড়াচড়ার আওয়াজ। বিপত্নীকের প্রথম চেষ্টায় এরেন্দিরা কী-একটা চেঁচিয়ে উঠেছিলো অস্ফুট, চেষ্টা করেছিলো স'রে যেতে। বিপত্নীক তাকে উত্তর দিয়েছিলো কোনো কণ্ঠস্বর বিনাই, কব্জিটা ধ'রে মুচড়ে দিয়েছিলো হাত, হিঁচড়ে তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলো দোলখাটিয়ায়। এরেন্দিরা রীতিমতো যুঝেছিলো তার সঙ্গে, আঁচড়ে দিয়েছিলো তার মুখ। আবার চেঁচিয়ে উঠেছিলো ঘনজমাট স্তব্ধতায়, কিন্তু বিপত্নীক তাকে ঠাশ ক'রে এমন-একটা চড় মেরেছিলো যে একচড়েই সে মাটি থেকে শূন্যে উঠে গিয়েছিলো, শূন্যেই সে ঝুলে ছিলো এক ঝলক, আর তার দীর্ঘ মেডুসা চুল উড়ছিলো শূন্যে। সে আবার মাটিতে নেমে আসার আগেই বিপত্নীক আঁকড়ে ধরেছিলো তার কোমর, পাশবিক এক ঝাঁকুনি দিয়ে তাকে ছুঁড়ে ফেলেছিলো দোলখাটিয়ায়, আর হাঁটু দিয়ে তাকে চেপে ধ'রে রেখেছিলো। এরেন্দিরা, আতঙ্কে, তলিয়ে গিয়েছিলো কোন্-এক বিভীষিকায়, হারিয়ে ফেলেছিলো তার সংজ্ঞা, আর তেমনিই থেকে গিয়েছিলো সারাক্ষণ যেন

হা ক'রে সম্মোহিত দেখছিলো একটা মাছের গা থেকে ঝ'রে-পড়া জ্যোৎস্না—যে-মাছটা উড়ে যাচ্ছে তুফানের হাওয়ায় ; আর সেই ফাঁকে বিপত্নীক নিরাবরণ ক'রে দিয়েছিলো তাকে, অভ্যস্ত ব্যবস্থাপক থাবায় প্রায় হ্যাঁচকা টানেই ছিঁড়ে এনেছিলো তার পোশাক, যেন সে মাটি থেকে ঘাস ওপড়াচ্ছে চাপড়া-চাপড়া, আর তাদের সে ছড়িয়ে দিয়েছিলো চাপ-চাপ রঙের ডেলার মতো, যা ঢেউখেলানো রঙিন কাগজের মতো নেচে-নেচে উড়ে যাচ্ছিলো—হাওয়ার সঙ্গে যা শেষে উড়ে চ'লে গিয়েছিলো।

এরেন্দিরার প্রণয়ের জন্য দাম দিতে পারে, গাঁয়ে যখন এমন আর-কোনো পুরুষ বাকি রইলো না তার ঠাকুমা তাকে একটা ট্রাকে চাপালেন, যেখানে চোরাচালানকারীরা থাকে সেখানে যাবার জন্যে। তারা সফরটায় বেরুলো খোলা ট্রাকের পেছনটায় ; বস্তা-বস্তা চাল আর বালতি-বালতি তেল-ঘি. এবং আগুনের খিদে থেকে যা বাঁচানো গেছে সব সম্পত্তি নিয়ে : লাটসায়েবের বিছানার শিয়রের কাঠ, এক যুদ্ধরত অকুতোভয় দেবদূত, পোড়া সিংহাসন এবং আরো-সব অদরকারি বাতিল জঞ্জালের সঙ্গে। মোটা-মোটা তুলির টানে দুটি ক্রুশ-আঁকা একটা তোরঙ্গে তারা ব'য়ে নিয়ে গেলো আমাদিসদের হাড়গোড়।

একটা ছেঁড়া ছাতা মাথার ওপর মেলে দিয়ে ঠাকুমা নিজেকে বাঁচাতে চাচ্ছিলেন রোদ্দুর থেকে, ধুলো আর ঘামের অত্যাচারে অতিষ্ঠ তাঁর পক্ষে দম নেয়াটাই ভারি কঠিন হ'য়ে উঠেছিলো, কিন্তু এমন যা-দশাতেও তিনি তাঁর মেজাজ-মর্যাদার ওপর পুরো দখল রেখেছিলেন। স্তূপ-ক'রে-রাখা কৌটো আর চালের বস্তার আড়ালে এরেন্দিরাকে সফরের রাহাখরচ আর মালপত্তর নেবার মাশুল জোগাতে হ'লো ট্রাকের মাল ওঠায়-নামায় যে-লোকটা তার সঙ্গে প্রতি দফা কুড়ি পেসো হারে প্রেম ক'রে। গোড়ায় এরেন্দিরার আত্মরক্ষার উপায় ছিলো বিপত্নীকের হামলাকে সে যেভাবে সামলাবার চেষ্টা করেছিলো সেই প্রতিরোধব্যবস্থাই, কিন্তু ট্রাকের খালাশির কায়দাটা ছিলো অন্যরকম, ধীরমন্থর ও প্রজ্ঞায় পণ্ডিত, আর শেষটায় সে তাকে পোষ মানালে মমতায় আর কোমলতায়। ফলে মারাত্মক সফরটার পরে তারা যখন গিয়ে প্রথম শহরটায় পৌঁছুলো, এরেন্দিরা আর ট্রাকের খালাশি তখন মালপত্তরের আড়ালে অতীব তৃপ্তিকর রতিক্রিয়ার পরে সুখে ও আয়েশে এলিয়ে প'ড়ে ছিলো। ট্রাকচালক চেঁচিয়ে ঠাকুমাকে বললে :

'এইখান থেকেই জগতের শুরু।'

ঠাকুমা অবিশ্বাসভরে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলেন শহরটার হতশ্রী আর নির্জন

রাস্তাঘাট : আগের শহরের চাইতে এটা একটু বড়ো বটে, তবে যে-শহরটা ছেড়ে এসেছেন তারই মতো এটাও দুঃস্থ দুঃখী ও করুণ।

'দেখে তো আমার তা মনে হচ্ছে না,' ঠাকুমা বললেন।

'এটা চার্চের আশ্রমের পত্তনি,' ট্রাকচালক জানালে।

'দয়াদাক্ষিণ্য দানধ্যানে আমার আগ্রহ নেই, আমি চাই চোরাচালানকারীদের,' বললেন ঠাকুমা।

মালের বস্তাগুলোর আড়াল থেকে এই দ্বৈতালাপ শুনতে-শুনতে এরেন্দিরা অন্যমনস্কভাবে একটা বস্তাকে খুঁটছিলো—শেষটায় আঙুল দিয়ে সে একটা চালের বস্তা ফুটো ক'রে দিলে। হঠাৎ সে দেখতে পেলে ভেতর থেকে একটা সুতো বেরিয়ে আছে, সেটাকে ধ'রে টান দিতেই বেরিয়ে এলো খাঁটি মুক্তোর একটা হার। স্তম্ভিত হ'য়ে সে সেটার দিকে তাকিয়ে রইলো, হারটাকে সে আঙুলের ফাঁকে এমনভাবে ধ'রে আছে যেন সেটা একটা মরা সাপ ; এদিকে ট্রাকচালক তখন ঠাকুমাকে বলছে :

'দিবাস্বপ্ন দেখবেন না, সেনিওরা। চোরাচালানকারী ব'লে কিছু নেই।'

'মোটেই না,' ঠাকুমা বললেন। 'তোমার নিজের জবানই আছে আমার।'

'দেখুন চেষ্টা ক'রে কাউকে পান কি না, তাহ'লেই টের পাবেন।' ট্রাকচালক একটু ইয়ার্কি করলে। 'সকলেই তাদের কথা বলে, কিন্তু কেউই নাকি চর্মচক্ষুতে কখনও কাউকে দ্যাখেনি।'

ট্রাকের খালাশিটি টের পেলে যে এরেন্দিরা হারটা টেনে বার ক'রে এনেছে ; সে চট ক'রে সেটা তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আবারও চালের বস্তায় ঢুকিয়ে রাখলে। শহরের এই দুঃস্থ দশা সত্ত্বেও, বিষম দারিদ্র্য সত্ত্বেও, ঠাকুমা স্থির করেছেন এখানেই থাকবেন ; নাৎনিকে ডেকে বললেন ট্রাক থেকে নামতে তাঁকে সাহায্য করতে। এরেন্দিরা খালাশিকে বিদায় জানালে চুমু খেয়ে, চুমুটা একটু তাড়া ক'রেই খেতে হ'লো, তবে সেটা ছিলো স্বতঃস্ফূর্ত আর আন্তরিক।

ঠাকুমা, রাস্তার ওপরে তাঁর সিংহাসনে ব'সেই, অপেক্ষা ক'রে রইলেন কতক্ষণে তারা মালপত্তর নামানো শেষ করে। শেষ যেটা নামানো হ'লো সেটা আমাদিস-দের হাড়গোড়ে ভরা তোরঙ্গটা।

'এর ওজন তো দেখছি একটা লাশের মতো,' ট্রাকচালক রগড় ক'রে হেসে বললে :

'একটা নয়, দুটো,' ঠাকুমা বললেন, 'কাজেই যথাযোগ্য সম্মান কোরো ওদের।'

'বাজি ধ'রে বলতে পারি এরা সব মর্মরমূর্তি,' ট্রাকচালক আবারও দাঁত বার করলে।

হাড়গোড়ওলা তোরঙ্গটা সে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে পুড়ে-যাওয়া আশবাবপত্রের মধ্যে নামিয়ে রেখে দিদিমার কাছে হাত পাতলে।

বললে, 'পঞ্চাশ পেসো।'

'তোমার গোলামটা এর মধ্যেই সব দক্ষিণ হস্তে পেয়ে গেছে।'

ট্রাকচালক অবাক হ'য়ে তার সহকারী খালাশিটির দিকে তাকাতেই সে সম্মতি-সূচক একটা ইঙ্গিত করলে। ট্রাকচালক তখন ফিরে চ'লে গেলো তার চালকের খোপে, যেখানে ব'সে ভ্রমণ করছিলো এক মেয়ে, শোকপোশাক গায়ে, কোলে একটা বাচ্চা—বাচ্চাটি গরমে অতিষ্ঠ হ'য়ে কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছে। ট্রাকের খালাশি—নিজের সম্বন্ধে সে দিব্যি নিঃসংশয়—ঠাকুমাকে বললে :

'এরেন্দিরা আমার সঙ্গে আসছে—অবশ্য আপনার যদি কোনো আপত্তি না-থাকে।'

কিশোরী চমকে উঠে মাঝখানে প'ড়ে বললে :

'আমি কিন্তু কিছু বলিনি !'

'ভাবনাটা একেবারেই আমার, পুরোপুরি,' খালাশিটি বললে।

ঠাকুমা তার আগাপাছতলা নিরীক্ষণ করলেন, সেটা এজন্যে নয় যে ঐ চাউনির সামনে সে যেন কুঁকড়ে গুটিয়ে একরত্তি হ'য়ে যায়, বরং তার সাহসের পরিমাণটিই তিনি আন্দাজ করতে চাচ্ছিলেন।

'আমার কোনো আপত্তি নেই,' বললেন ঠাকুমা, 'যদি ওর অবহেলায় আমি যা-কিছু হারিয়েছি সব তুমি আমাকে পুষিয়ে দাও। সবশুদ্ধ আটশো বাহাত্তর হাজার তিনশো পেসো, তা থেকে বাদ যাবে চারশো বিশ, যা সে নিজেই এর মধ্যেই আমাকে শোধ ক'রে দিয়েছে। তাহ'লে দাঁড়ালো আটশো একাত্তর হাজার আটশো পঁচানব্বই।'

ট্রাকের এনজিন জেগে উঠলো।

'বিশ্বাস করুন, আমার কাছে অত টাকা থাকলে সব আমি দিয়ে দিতুম,' খালাশি গম্ভীরভাবে বললে। 'মেয়েটি দামি।'

ছোকরার সিদ্ধান্ত শুনে দিদিমা বেশ খুশিই হলেন।

'বেশ, তাহ'লে, বাছা, তোমার যখন টাকা হবে ফিরে এসো,' সহানুভূতির সুরে উত্তর দিলেন ঠাকুমা। 'তবে এখন তুমি বরং কেটে পড়ো, কারণ আবার

যদি হিশেব মেলাতে বসি তবে হয়তো দেখা যাবে তুমি আমার কাছে দশ পেসো ধারো।'

খালাশি লাফিয়ে উঠলো ট্রাকের পেছনটায় আর অমনি ট্রাকটা ছেড়ে দিলে। ট্রাকের ওপর থেকেই হাত নেড়ে সে বিদায় জানালে এরেন্দিরাকে, কিন্তু সে-বেচারা এতটাই অবাক হ'য়ে গিয়েছিলো যে সে কোনোই সাড়া দেয়নি।

যে-ফাঁকা জায়গাটায় ট্রাক তাদের নামিয়ে দিয়েছিলো, এরেন্দিরা আর তার ঠাকুমা ঠিক সেখানেই দস্তার পাত আর প্রাচী-র ফরাশের ধ্বংসাবশেষ দিয়ে কোনো-ক্রমে মাথা গোঁজবার একটা আশ্রয় উদ্ভাবন ক'রে নিলে। দুটো জাজিম পাতলে তারা মাটিতে আর প্রাসাদে থাকবার সময় যেমন ঘুমুতো তেমনি ভালো ঘুম হ'লো তাদের যতক্ষণ-না রোদ্দুর এসে ফুটো করলে ছাতে আর পুড়িয়ে দিলে তাদের মুখ-চোখ।

সাধারণত যেমন হয় এবার তার উলটোটাই হ'লো: এবার ঠাকুমাই এরেন্দিরাকে সাজাতে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন। এরেন্দিরার মুখটি তিনি এমনভাবে সাজালেন যেন কোনো সুন্দরী এসেছে কারু অন্ত্যেষ্টিতে, শ্রাদ্ধবাসরে; ঠাকুমার যৌবনে এমনিতর রূপেরই চলন ছিলো; তার আঙুলে পরিয়ে দিলেন নকল নখ, আর পাৎলা মশলিনের এক ফিতে এমনভাবে বেঁধে দিলেন মাথায় যে দেখে মনে হ'লো মাথায় যেন এক প্রজাপতি ব'সে আছে।

'বিশ্রী দেখাচ্ছে তোকে,' দিদিমা কবুল করলেন, 'তবে এভাবেই ভালো: মেয়েদের বেলায় পুরুষগুলো একেবারেই হাঁদা হ'য়ে যায়।'

চোখে দেখবার বেশ খানিকক্ষণ আগেই তাঁরা শনাক্ত করতে পারলেন মরুভূমির চকমকি পাথরের ওপর দুটি খচ্চরের চলার শব্দ। ঠাকুমার হুকুমে এরেন্দিরা এমন-ভাবে জাজিমের ওপর শুয়ে পড়লো যেন কোনো অপেশাদার অভিনেত্রী পর্দা ওঠবার ঠিক আগটায় শুয়ে আছে। যাজকের দোর্দণ্ডটার ওপর ভর দিয়ে ঠাকুমা বেরিয়ে এলেন আশ্রয় থেকে, এসে বসলেন তাঁর সিংহাসনে, খচ্চররা কখন এখান দিয়ে যায় তারই অপেক্ষায়।

আসছিলো ডাকহরকরা। তার বয়েস সদ্য কুড়ি পেরিয়েছে, কিন্তু তার জীবিকা তাকে এর মধ্যেই বুড়িয়ে ফেলেছে; সে প'রে আছে খাকির উর্দি, পায়ে ফিতের মোজা, মাথায় শোলার টুপি, আর তার কার্তুজের কোমরবন্ধের সঙ্গে রয়েছে একটা সামরিক পিস্তল। ভালো একটা খচ্চরের ওপর চ'ড়ে চলেছে সে, অন্যটাকে লাগাম ধ'রে টেনে নিয়ে যাচ্ছে—অন্য খচ্চরটা আরো-অনেক সময়জীর্ণ, তার ওপরেই স্তূপ ক'রে রাখা আছে ডাকের বস্তাগুলো।

ঠাকুমার পাশ দিয়ে যাবার সময় সে একটা সেলাম ঠুকলো বটে, তবে থামলো না—চলতেই থাকলো; কিন্তু ঠাকুমা তাকে ইশারায় বললেন আশ্রয়ের মধ্যে ঢুকে দেখতে। লোকটা থামলো; দেখতে পেলে এরেন্দিরা তার মরণোত্তর প্রসাধনে সেজে জাজিমের ওপর শুয়ে আছে, গায়ে তার বেগনিলাল আঁচল দেয়া ঘাঘরা।

'কী? পছন্দ হয়?' ঠাকুমা জিগেশ করলেন।

প্রস্তাবটা যে সত্যি কী, এ-কথার আগে অব্দি ডাকহরকরা তা বুঝতেই পারেনি।

'কাউকে যদি নিছক রুগীর পথ্যি খেয়ে থাকতে হয়, তবে এ তার খারাপ লাগবে কেন?' ডাকহরকরা মুচকি হেসে বললে।

'পঞ্চাশ পেসো,' ঠাকুমা বললেন।

'বাব্বা, তুমি দেখছি আস্ত তোষাখানাই চাচ্ছো!' সে বললে, 'ও-টাকায় আমি সারা মাস পেট পুরে খেতে পারবো।'

'কঞ্জুশি কোবো না,' ঠাকুমা বললেন। 'হাওয়াই ডাক কোনো চার্চের পুরুতের চাইতে বেশি পয়সা দেয়।'

'আমি অন্তর্দেশীয় বিলি করি—দিশি ডাক,' লোকটা বললে, 'হাওয়াই ডাক যে বিলি করে সে ট্রাকে ক'রে যায়।'

'সে যা-ই হোক, প্রেমও খাওয়ার মতোই জরুরি কাজ,' ঠাকুমা বললেন।

'হ্যাঁ, তবে সে তো আর তোমার পেট ভরায় না।'

ঠাকুমা সমঝে গেলেন অন্য লোকেরা যার অপেক্ষায় হা-পিত্যেশ ক'রে ব'সে থাকে তা যে বিলি ক'রে বেড়ায় তার হাতে দরদস্তর করার জন্যে অঢেল সময় আছে।

'কত আছে তবে তোমার কাছে?' ঠাকুমা তাকে জিগেশ করলেন।

ডাকহরকরা খচ্চরের পিঠ থেকে নেমে পকেট থেকে কিছু দোমড়ানো নোট বার ক'রে নিয়ে এসে ঠাকুমাকে তা দেখালে। ঠাকুমা সবগুলো নোট এমনভাবে দ্রুত হাতে ছিনিয়ে নিলেন যেন তাঁর হাত দুটো একটা বল ছাড়া আর-কিছুই নয়।

'আমি তোমার জন্যে দাম কমাবো,' তিনি বললেন, 'তবে একটা শর্তে: কথাটা তোমায় চারপাশে চাউর ক'রে দিতে হবে।'

'জগতের একেবারে অন্যপ্রান্ত অব্দি,' ডাকহরকরা বললে, 'আমি তো সেই-জন্যেই আছি।'

এরেন্দিরা এতক্ষণ চোখের পাতা ফেলতেই পারছিলো না, এবার সে নকল চোখের পাতা খুলে নিলে, আর দৈবাৎ-পাওয়া ছেলেবন্ধুর জন্যে জাজিমের এক-

পাশে স'রে গেলো। যেই লোকটা আশ্রয়ের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে, গড়ানে পর্দায় একটা জোরালো হ্যাঁচকা টান মেরে ঠাকুমা দরজার মুখটা আটকে দিলেন।

চুক্তিটা কাজেরই হয়েছিলো। ডাকহরকরার কথায় ভুলে গিয়ে দূর-দূর থেকে লোক এলো এরেন্দিরার নতুনত্বের স্বাদ নেবার জন্যে। লোকদের পেছন-পেছন এলো জুয়োর টেবিল আর খাবারের দোকান, আর তাদের সবার পেছনে এলো, বাইসাইকেলে ক'রে, এক ছবিওলা যে শিবিরের দরজাটার উলটোদিকে একটা তেপায়ার ওপর বসালে তার শোকের আস্তিনওলা ক্যামেরাটা, পেছনে টাঙালে একটা পর্দা, তাতে ঝিলের ওপর চাঞ্চল্যহীন সব রাজহাঁস আঁকা।

তাঁর সিংহাসনে ব'সে পাখা দিয়ে হাওয়া করতে-করতে ঠাকুমাকে দেখাচ্ছিলো যেন নিজের বাজারেরই অচেনা। একমাত্র যাতে তাঁর আগ্রহ ছিলো, সে হ'লো মক্কেলদের কাতারের মধ্যে শৃঙ্খলা রাখা: তারা সবাই যে-যার নিজের পালা আসবার জন্যে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো, আর এরেন্দিরার কাছে যাবার আগে পুরো টাকাটা তাদের দিতে হ'তো আগাম—আর ঠাকুমার আগ্রহ ছিলো সেই টাকা গুনতেই। গোড়ায় তিনি এতটাই কড়া খবরদারি করেছিলেন যে ভালো একজন মক্কেলকেও তিনি ভেতরে যেতে দেননি—তার কাছে পাঁচ পেসো কম ছিলো। তবে ক্রমে যখন মাসের পর মাস কেটে গেলো, ঠাকুমা বাস্তব দশার কাছ থেকে পাঠগুলো গিলে নিয়ে শেষটায় তেমন লোককেও ঢুকতে দিতেন যারা তাদের মাশুল জোগাতো ধর্মের পদক, পারিবারিক স্মৃতিচিহ্ন, বিয়ের আংটি কিংবা যা খুশি তাই, যা চকচক না-করলেও দাঁতে কেটে তিনি বুঝতে পারতেন জিনিশটা হ'লো খাঁটি সোনা।

প্রথম শহরে অনেকদিন কাটাবার পর, ঠাকুমার কাছে একটা মাল-বওয়া গাধা কেনবার মতো যথেষ্ট টাকা হ'লো, আর তিনি আরো-সব নতুন-নতুন জায়গার খোঁজে মরুভূমিতে বেরিয়ে পড়লেন—যে-সব জায়গা এরেন্দিরার দেনা শোধবার পক্ষে অনেক বেশি অনুকূল ছিলো। তিনি ভ্রমণ করতেন একটা খাটুলিতে, গাধার পিঠে সেটা চাপানো হ'তো, আর নিশ্চল সূর্যের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে এরেন্দিরা তাঁর মাথার ওপর ধ'রে রাখতো আধাশিকওলা এক ছাতা। তাদের পেছন-পেছন আসতো চারজন ইণ্ডিয়ান কুলি যারা ব'য়ে নিয়ে আসতো শিবিরের বাকি যা-কিছু: জাজিম, মেরামত ক'রে সারানো সিংহাসন, তৈলস্ফটিকে গড়া দেবদূত, আর আমাদিসদের দেহাবশেষে ভরা তোরঙ্গগুলো। বহরটার পেছন-পেছন বাইসাইকেলে চেপে আসতো ছবিওলা, কিন্তু কখনও নাগাল ধ'রে নয়, ভঙ্গিটা, যেন সে অন্যকোনো মেলায় যাচ্ছে।

অগ্নিকাণ্ডের পর যখন ছ-মাস কেটে গিয়েছে ঠাকুমা তখন ব্যাবসাটার একটা পুরো ছবি পেলেন।

'এভাবেই যদি চলতে থাকে,' এরেন্দিরাকে বললেন, 'তুই আমাকে আট বছর সাত মাস এগারো দিনের মধ্যেই সব ধার শোধ ক'রে দিতে পারবি।'

চোখ মুদে আবার তিনি হিশেবটা খতিয়ে দেখলেন, দড়ির একটা থলে থেকে সূর্যমুখির বিচি বার করতে-করতে—সেখানে তিনি টাকাও রাখেন—তারপর তিনি ভুলটা শোধরালেন :

'সে অবশ্য ইণ্ডিয়ানদের থাকা-খাওয়ার খরচ আর অন্য-সব টুকিটাকি খরচ হিশেবে না-ধ'রেই।'

এরেন্দিরা গাধার সঙ্গে তাল রেখে-রেখে চলছিলো, ধুলোয় আর গরমে সে একেবারে কাহিল হ'য়ে নুয়ে পড়েছে। সে ঐ হিশেবের জন্যে ঠাকুমাকে কোনো তিরস্কার করলে না বটে, তবে অনেক কষ্ট ক'রেই তাকে চোখের জল চেপে রাখতে হ'লো।

'আমার হাড়গোড়ের মধ্যে শুধু কাচের গুঁড়োই আছে।'

'ঘুমোবার চেষ্টা কর।'

'সি, আবুয়েলা।'

সে তার চোখ বুজলো, গভীর শ্বাস টেনে নিলে তপ্ত হাওয়া, আর ঘুমের ঘোরেই সে পা ফেলে-ফেলে চলতে লাগলো।

...

দিগন্তের ধুলোর ঝড়ে ছাগলদের ভয় পাইয়ে দিয়ে খাঁচায় ভর্তি একটা ছোটো ট্রাক দেখা দিলে আর সান্ মিগেল দেল দেসিয়ের্তোর রবিবাসরীয় আলস্য ও জড়তায় পাখির কাকলি ছিলো যেন ঠাণ্ডা জলের একটা ঝাপটা। চালকের আসনে ব'সে ছিলেন এক হৃষ্টপুষ্ট ওলন্দাজ র‍্যান্চমালিক, ঘরের বাইরে কাটিয়ে-কাটিয়ে তাঁর গায়ের চামড়া ফেটে গিয়েছে, কাঠবেড়ালির গায়ের রঙের মতো তাঁর গোঁফ-জোড়, যেটা তিনি উত্তরাধিকার পেয়েছেন কোনো বৃদ্ধ প্রপিতামহর কাছ থেকে। তাঁর ছেলে উলিসেস, সে বসেছিলো পাশের আসনে, ছিলো সোনায় মোড়া এক কিশোর, তার ছিলো নিঃসঙ্গ নাবিক চোখ আর তার চেহারাটা ছিলো কোনো চোরাগোপ্তা দেবদূতের মতো। ওলন্দাজ র‍্যান্চমালিক দেখতে পেলেন একটা তাঁবুর সামনে স্থানীয় কেল্লার সব সৈন্য সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে নিজেদের পালা আসার অপেক্ষায়। তারা ব'সে আছে মাটিতে, একই বোতল থেকে ঢকঢক ক'রে

মদ ঢালছে গলায়, বোতলটা চলেছে মুখ থেকে মুখে, মাথায় তাদের কাগজি-বাদামের ডালপালা যেন তারা হাড্ডাহাড্ডি হাতাহাতি লড়াইয়ের জন্যে তৈরি হ'য়ে ছদ্মবেশ ধ'রে আছে। ওলন্দাজ তাঁর নিজের ভাষায় জিগেশ করলেন :

'কোন শয়তানি জিনিশ ওরা বিক্রি করছে ওখানে ?'

'একটি মেয়ে,' খুব স্বাভাবিকভাবেই বললে তার ছেলে। 'তার নাম এরেন্দিরা।'

'তুই জানলি কী ক'রে ?'

'মরুভূমিতে সকলেই তার কথা জানে,' উত্তরে বললে উলিসেস।

ওলন্দাজ শহরের ছোটো সরাইটার সামনে ট্রাক থামিয়ে নেমে পড়লেন। উলিসেস ট্রাকেই থেকে গেলো। ক্ষিপ্র হাতে সে ব্রীফকেস খুলে ফেললে, তার বাবা যেটা আসনে ফেলে রেখে গিয়েছেন ; একতাড়া নোট বার ক'রে নিয়ে কয়েক গোছা নোট রাখলে নিজের পকেটে, আর তারপর সব যেমন ছিলো তেমনি রেখে দিলে। সে-রাতে, যখন তার বাবা ঘুমুচ্ছেন, সে সরাইয়ের জানলা বেয়ে নেমে চ'লে গেলো এরেন্দিরার তাঁবুতে, কাতারের মধ্যে দাঁড়াবে ব'লে।

উৎসবের হুল্লোড় তখন চরমে। মাতাল রংরুটরা একা-একাই নাচছে যাতে বিনি পয়সায় পাওয়া গান হেলায় নষ্ট না-হয়, আর ছবিওলা রাতের ছবি তুলছে ম্যাগনেসিয়াম কাগজে। ব্যাবসার ওপর নজর রাখতে-রাখতে ঠাকুমা তাঁর কোলের ওপর ব্যাঙ্কনোটগুলো গুনছেন, ভাগ ক'রে রাখছেন সমান-সমান স্তূপে, তারপর সাজিয়ে রাখছেন সেগুলো একটা ঝুড়িতে। সে-সময়ে সারের মধ্যে মোটে বারোজন সৈন্য ছিলো, কিন্তু সন্ধের পর থেকে সারিটা ভ'রে উঠেছে বেসামরিক খদ্দেরে। সারির সব শেষে দাঁড়িয়ে আছে উলিসেস।

এবার পালা এলো বিমর্ষ, মুখগোমড়া এক সৈন্যের। ঠাকুমা শুধু যে তার পথই আটকালেন তা নয়, তার টাকার সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়িও বাঁচালেন।

'না, বাছা,' তাকে বললেন তিনি। 'পৃথিবীর সব সোনা এনে দিলেও তুমি ভেতরে যেতে পারবে না। তুমি দুর্ভাগ্য নিয়ে আসো।'

সৈন্যটি—সে এখানকার নয়—হতভম্ব হ'য়ে গেলো।

'আপনি কী বলতে চাচ্ছেন ?'

'তুমি অলুক্ষুণে সব ছায়াকে টেনে নিয়ে আসো,' বললেন ঠাকুমা। 'শুধু তোমার মুখটা দেখলেই যে-কেউ বুঝতে পারবে।'

তিনি হাত নেড়ে তাকে চ'লে যেতে বললেন, তবে তাকে না-ছুঁয়েই ; ইঙ্গিত করলেন পরের সৈন্যের জন্যে যেন সে পথ ছেড়ে দাঁড়ায়।

'ওহে সুপুরুষ, ভেতরে যাও,' তাকে তিনি বললেন সহৃদয়ভাবে, 'তবে বেশি সময় নিয়ো না, তোমার দেশ তোমাকে চায়।'

সৈন্যটি ভেতরে গিয়ে পরক্ষণেই ফিরে এলো, কারণ এরেন্দিরা তার ঠাকুমার সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছিলো। ঠাকুমা হাতের ড্যানায় টাকার ঝুড়ি ঝুলিয়ে ভেতরে গেলেন, ভেতরে অবশ্য জায়গা তেমন নেই, তবে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। পেছনটায়, সামরিক বাহিনীর একটা খাটুলিতে, এরেন্দিরা কিছুতেই তার শরীরের কাঁপুনি থামাতে পারছে না, ভারি করুণ তার দশা, সৈন্যদের ঘামে তার সারা শরীরটা ঘিনঘিন করছে।

'আবুয়েলা,' হেঁচকি তুলে কাঁদলো সে, 'আমি ম'রে যাচ্ছি।'

ঠাকুমা কপালে হাত দিয়ে যখন দেখলেন জ্বর নেই, তখন তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন।

'আর মাত্র দশজন সৈন্য বাকি আছে,' ঠাকুমা বললেন।

জন্তুরা ভয় পেলে যে-রকম হাউ-মাউ করে, তেমনিভাবে এরেন্দিরা কাঁদতে শুরু ক'রে দিলে। ঠাকুমা বুঝতে পারলেন যে সে সত্যি বিভীষিকার সীমা পেরিয়ে গেছে। মাথায় হাত বুলিয়ে চাপড়ে-চাপড়ে তিনি তাকে শান্ত করলেন।

'মুশকিল হ'লো তুই ভারি দুবলা,' তিনি তাকে বললেন, 'বাস, বাস, আর কাঁদে না, বরং ওষধি মাখানো জলে স্নান ক'রে নে, তাহ'লেই রক্ত ফের শান্ত হবে।'

এরেন্দিরা আরেকটু শান্ত হ'লে তিনি তাঁবু থেকে বেরুলেন আর অপেক্ষা-ক'রে-থাকা সৈন্যটিকে তার টাকা ফিরিয়ে দিলেন। 'আজকের মতো এই অব্দি,' তিনি তাকে বললেন। 'কাল এসো, আমি তোমাকে একেবারে সারির সামনে আসতে দেবো।' তারপর তিনি সার দিয়ে দাঁড়ানো অন্যদের দিকে তাকিয়ে হেঁকে বললেন :

'বাচ্চে লোক, আজ এই অব্দিই। আবার কাল সকাল ন-টায়।'

সৈন্য ও বেসামরিক খদ্দেররা চেঁচিয়ে প্রতিবাদ ক'রে সার থেকে বেরিয়ে এলো। ঠাকুমা তাদের মুখোমুখি দাঁড়ালেন, মেজাজ তাঁর শরীফ, কিন্তু ঐ সর্বনেশে দোর্দণ্ড তিনি হেই-হেই ক'রে ঘোরাচ্ছেন।

'তোমরা সবাই যে শুধু আস্ত একেকটা গাড়ল তা-ই নয়, তোমাদের কোনো দয়ামায়াও নেই। অন্যদের কথা তোমরা ভুলেও ভাবো না।' ঠাকুমা চেঁচিয়ে বললেন, 'মেয়েটা কীসে তৈরি ব'লে তোমাদের মনে হয়? লোহায়? ওর জায়গায়

তোমরা হ'লে কী করতে দেখতে পারলে ভালো হ'তো। ইতর! বদমায়েশ! গু-খোর বজ্জাত!'

লোকেরা উত্তরে তাকে আরো বাছা-বাছা খিস্তি করলে—কিন্তু এই বিক্ষোভ-প্রতিবাদ ঠাকুমা ভালোই শামাল দিলেন—আর ঐ দোর্দণ্ড হাতে দাঁড়িয়ে রইলেন পাহারায়; শেষটায় লোকে খাবার-টেবিল তুলে নিয়ে গেলো, ভেঙে তছনছ ক'রে দিলে জুয়োর আখড়াগুলো। ঠাকুমা যেই তাঁবুর ভেতরে ঢুকতে যাবেন হঠাৎ তাঁর চোখ পড়লো উলিসেসের ওপর, জীবনের মতোই বড়ো, একা-একা দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকার ফাঁকায় যেখানে আগে অত লোক সার বেঁধে দাঁড়িয়েছিলো। কেমন-একটা অলীক আভা ঘিরে আছে তাকে, অন্ধকারেও তাকে যে দেখা যায় তা বুঝি তার রূপের অমন জেল্লার জন্যেই।

'তুমি,' ঠাকুমা তাকে জিগেশ করলেন, 'তোমার ডানার কী হ'লো?'

'যাঁর ডানা ছিলো তিনি ছিলেন আমার ঠাকুর্দা,' উলিসেস তার স্বাভাবিক ধরনেই উত্তর দিলে, 'তবে কেউই সে-কথা বিশ্বাস করেনি।'

কী-রকম মোহিত হ'য়ে ঠাকুমা আবার তাকে নিরীক্ষণ করলেন। 'হুম, আমি বিশ্বাস করি,' বললেন তিনি। 'আচ্ছা, কালকে ডানা দুটি প'রে চ'লে এসো।' তিনি তাঁবুর মধ্যে চ'লে গেলেন, উলিসেসকে ঠায় দাঁড় করিয়ে রেখে গেলেন, যেখানে সে দাঁড়িয়েছিলো সেখানেই, জলন্ত।

স্নান ক'রে নেবার পর এরেন্দিরার অনেক ভালো লাগলো। আঁচলে ঝালর লাগানো একটা খাটো শেমিজ পরেছে সে, শুতে যাবার আগে চুল শুকোচ্ছে, কিন্তু এখনও তাকে চোখের জলের ঢল আটকে রাখবার জন্যে চেষ্টা করতে হচ্ছে। তার ঠাকুমা ঘুমোচ্ছেন।

এরেন্দিরার বিছানার পেছন থেকে, খুব আস্তে-আস্তে, আবির্ভূত হ'লো উলিসেসের মাথা। শঙ্কাতুর স্বচ্ছ টলটলে ডাগর চোখ দুটি দেখতে পেলে এরেন্দিরা, কিন্তু কিছু বলবার আগে সে তোয়ালে দিয়ে জোরে-জোরে মাথা ঘষলো এটাই প্রমাণ করতে যে এ তার চোখের দেখার ভুল নয়। যখন উলিসেস প্রথমবার চোখের পাতা ফেললে, এরেন্দিরা খুব নিচু গলায় তাকে জিগেশ করলে :

'কে তুমি?'

উলিসেস তাকে নিজের কাঁধ অব্দি দেখালে। বললে, 'আমার নাম উলিসেস।' এরেন্দিরাকে সে দেখালে যে-নোটগুলো সে চুরি করেছে, আর জুড়ে দিলে :

'আমার কাছে টাকা আছে।'

এরেন্দিরা তার হাত রাখলে বিছানায়, নিজের মুখটা উলিসেসের একেবারে কাছে নিয়ে এলো, তার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলতে লাগলো যেন এটা কিণ্ডার-গার্টেনের বাচ্চাদের একটা খেলা।

'তোমার তো সারির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকার কথা,' সে তাকে বললে।

উলিসেস বললে, 'আমি সারা রাত দাঁড়িয়ে থেকেছি।'

'বেশ, কিন্তু এখন আমার এমন লাগছে যে মনে হচ্ছে কেউ যেন বৃক্কটায় এতক্ষণ ধ'রে মুগুর দিয়ে পিটিয়েছে।'

ঠিক তক্ষুনি ঠাকুমা ঘুমের ঘোরে তাঁর প্রলাপ শুরু করলেন।

'শেষ বৃষ্টি পড়ার পর কুড়ি বছর কেটে গিয়েছে,' ঠাকুমা বললেন। 'সে ছিলো এমনি ভয়াবহ তুফান যে বৃষ্টি মিশে গিয়েছিলো সমুদ্রের জলের সঙ্গে, আর পরের দিন সকালে বাড়িটা ভ'রে গিয়েছিলো শামুকে গুগলিতে আর তোর ঠাকুর্দা আমাদিস—আহা, তার আত্মা শান্তিতে থাকুক—দেখতে পেয়েছিলো জলজলে একটা বিদ্যুৎরশ্মির চাদর ভেসে বেড়াচ্ছে হাওয়ায়।'

উলিসেস আবার বিছানার আড়ালে লুকিয়ে পড়লো। এরেন্দিরা মজা পেয়ে মুচকি একটা হাসি দেখালে তাকে।

'ভয় পেয়ো না,' সে তাকে বললে। 'ঘুমের ঘোরে ঠাকুমা সবসময়েই কেমন পাগলামি করে, কিন্তু কোনো ভূমিকম্পও তাকে আর জাগাতে পারবে না।'

উলিসেস পুনরাবির্ভূত হ'লো। এরেন্দিরা তার দিকে তাকিয়ে এমনভাবে মুচকি হাসলে যাতে একটু দুষ্টুমি মেশানো—অবশ্য একটু স্নেহও মেশানো তাতে। আর জাজিম থেকে নোংরা চাদরটা সে তুলে নিলে।

'এসো,' সে বললে, 'চাদরটা পালটাতে আমায় সাহায্য করো।'

তখন উলিসেস বিছানার পেছন থেকে বেরিয়ে এলো, এসে চাদরের একটা কোনা ধরলো। চাদরটা যেহেতু জাজিমটার চাইতে বড়ো, ওদের সেটাকে কয়েক দফা ভাঁজ করতে হ'লো। প্রতিবার ভাঁজ করার সঙ্গে-সঙ্গে উলিসেস এরেন্দিরার কাছে আরো-কাছে এসে পৌঁছুলো।

'তোমাকে একবার চোখে দেখবার জন্যে আমি একেবারে পাগল হ'য়ে উঠেছিলাম,' হঠাৎ উলিসেস বললে। 'সকলেই বলে তুমি খুবই সুন্দরী, আর তারা ঠিকই বলে।'

'কিন্তু আমি ম'রে যাচ্ছি,' বললে এরেন্দিরা।

'আমার মা বলেন মরুভূমিতে যাবা মারা যায় তারা আকাশে স্বর্গে যায় না, সমুদ্রে যায়,' বললে উলিসেস।

এরেন্দিরা নোংরা চাদরটা সরিয়ে আরেকটা চাদর পাতলো জাজিমে—এ-চাদরটা ধবধবে পরিষ্কার, ইস্ত্রি-করা।

'আমি কোনোদিন সমুদ্র দেখিনি,' এরেন্দিরা বললে।

'সে প্রায় মরুভূমির মতোই, তবে বালির বদলে শুধু জল,' বললে উলিসেস।

'তাহ'লে তো তার ওপর দিয়ে হাঁটতে পারবে না তুমি।'

'আমার বাবা একজনকে জানতেন যিনি জলের ওপর দিয়ে হাঁটতে পারতেন,' বললে উলিসেস, 'তবে সে অনেকদিন আগে।'

এরেন্দিরা মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিলো, কিন্তু তবু সে ঘুমুতেই চাচ্ছিলো এখন।

'যদি তুমি কাল খুব সকাল-সকাল আসো তবে সারির একেবারে প্রথমে থাকতে পারবে,' সে বললে।

উলিসেস বললে, 'আমি ভোরবেলাতেই বাবার সঙ্গে চ'লে যাচ্ছি।'

'এ-পথ দিয়ে তুমি আর ফিরবে না নাকি!'

'তা কে বলতে পারে?' উলিসেস বললে। 'আমরা শুধু দৈবাৎ এখানে এসে পড়েছি, কারণ সীমান্তে যাবার পথটা আমরা হারিয়ে ফেলেছিলাম।'

এরেন্দিরা চিন্তিতভাবে তার ঘুমন্ত ঠাকুমার দিকে তাকালে।

'আচ্ছা,' সে মন স্থির ক'রে ফেললে। 'টাকাটা দাও আমায়।'

উলিসেস নোটের গোছাটা তাকে দিয়ে দিলে। এরেন্দিরা বিছানায় শুয়ে পড়লো, কিন্তু উলিসেস যেখানে দাঁড়িয়েছিলো সেখানেই দাঁড়িয়ে কি-রকম কাঁপতে লাগলো, সেই চরম মুহূর্তে তার প্রতিজ্ঞা কেমন যেন দুর্বল হ'য়ে গিয়েছে। এরেন্দিরা তার হাত ধ'রে তাকে তাড়া লাগালে, আর শুধু তখনই সে উলিসেসের দুর্দশাটা বুঝতে পারলে। এই ভয়টার সঙ্গে এরেন্দিরার চেনা আছে।

'এই বুঝি তোমার প্রথমবার?' এরেন্দিরা তাকে জিগেশ করলে।

উলিসেস কোনো জবাব দিলে না, বরং শুকনো একটু হাসলো। এরেন্দিরা একেবারে অন্য মানুষ হ'য়ে গেলো।

'আস্তে শ্বাস নাও,' সে তাকে বললে। 'প্রথমবারে সবসময়েই এমন হয়। পরে তুমি আর এ-সব খেয়ালও করবে না।'

এরেন্দিরা তাকে তার পাশে শোয়ালে আর যখন সে তার জামা-কাপড় খুললো তখন সে তাকে ঠিক মায়ের মতো শান্ত করলে।

'তোমার নাম কী?'

'উলিসেস।'

'এ মা, এ যে গ্রিঙ্গো নাম,' বললে এরেন্দিরা।

'না-না, এটা নাবিকের নাম।'

এরেন্দিরা তার বুকের জামা খুলে দিলে, কতগুলো অনাথ চুমু খেলে তাকে, ঘ্রাণে নিলে তার গায়ের গন্ধ।

'তোমাকে দেখে মনে হয় আগাগোড়া সোনায় বানানো,' সে বললে, 'অথচ তোমার গায়ে ফুলের গন্ধ।'

'এ নিশ্চয়ই নারঙ্গের গন্ধ,' বললে উলিসেস।

আগের চাইতে অনেকটা শান্ত, সে একটা যোগসাজশের ভঙ্গিতে মৃদু হাসলে।

'লোককে ভুল বোঝাবার জন্যে আমরা অনেক পাখি নিয়ে ঘুরে বেড়াই,' আরো জানালে সে, 'কিন্তু আসলে আমরা সীমান্ত পেরিয়ে গাদা-গাদা নারঙ্গ পাচার ক'রে দিচ্ছি।'

'নারঙ্গ তো বেআইনি কিছু নয়,' বললে এরেন্দিরা।

'এগুলো কিন্তু বেআইনি,' বললে উলিসেস। 'একেকটার দাম পঞ্চাশ হাজার পেসো।'

অনেকদিন পরে এরেন্দিরা একটু প্রাণ খুলে হাসলো।

'জানো, তোমার কী আমার ভালো লাগে?' সে বললে, 'কি-রকম গম্ভীর-গম্ভীর মুখ ক'রে তুমি কত-কী আজগুবি কথা বানিয়ে বলো।'

এরেন্দিরা আবার স্বতঃস্ফূর্ত আর মুখর হ'য়ে উঠেছে, যেন উলিসেসের সরলতা তার নিষ্পাপ ভাবভঙ্গি শুধু তার মেজাজটাই পালটে দেয়নি, যেন তার চরিত্রটাও পালটে দিয়েছে। ঠাকুমা—দুর্ভাগ্য এত অল্প দূরে—এখনও তাঁর ঘুমের ঘোরে প্রলাপ ব'কে চলেছেন।

'তখনকার দিনে, মার্চমাসের গোড়ায়, তারা তোকে বাড়ি নিয়ে এসেছিলো,' ঠাকুমা বলছেন, 'তোকে দেখাচ্ছিলো তুলোয় মোড়া একটা গিরগিটির মতো। আমাদিস—তোর বাবা—তার তখন কচি বয়েস, সুপুরুষ, সেদিন বিকেলে এত খুশি হ'য়ে উঠেছিলো যে কুড়িটা গাড়ি বোঝাই ক'রে ফুল আনতে পাঠিয়েছিলো, আর সে রাস্তা দিয়ে ফুল ছড়াতে-ছড়াতে এসেছিলো, শেষটায় সারা গাঁটাই সমুদ্রের মতো ফুলে-ফুলে সোনারং হ'য়ে উঠলো।'

বিশাল সব চীৎকার ক'রে, গোঁয়ারভাবে, তিনি কয়েক ঘণ্টা ধ'রে হৈ-হৈ ক'রে কথা ব'লেই চললেন: কিন্তু উলিসেস তাঁর কোনো কথাই শুনতে পায়নি, কারণ এরেন্দিরা তাকে এত ভালোবেসেছে, এত খাঁটি নিখাদ সেই ভালোবাসা

যে সে তাকে আবার ভালোবেসেছে আদ্ধেক দামে, যখন তার ঠাকুমা উন্মাদের মতোই ব'লেই চললেন কী-সব, আর শেষটায় এরেন্দিরা তাকে ভোর হওয়া অব্দি বিনি দামেই ভালোবেসে চললো।

...

একদল আশ্রমিক তাদের ক্রুশফলকগুলো ধ'রে কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে মরুভূমির মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলো। দুর্ভাগ্যের হাওয়ার মতোই এক খ্যাপা হাওয়া তাদের রুক্ষ মোটা কেম্বিস কাপড়ের আলখিল্লা আর তাদের রুক্ষ কর্কশ দাড়িগুলো সব ঝাঁকাচ্ছে, তারা কোনোমতে অনেক চেষ্টা ক'রে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারছে। তাদের পেছনে আছে গির্জের আশ্রম, এক ঔপনিবেশিক শিলাময় স্তূপ, রূঢ় কর্কশ চুনকাম-করা দেয়ালের ঠিক ওপরটায় আছে খুদে এক ঘণ্টাঘর।

সবচেয়ে তরুণ যে আশ্রমিক তারই ওপর দলটার দায়িত্ব, আঙুল দিয়ে দেখালে চকচকে কাদামাটিতে কেমন-একটা স্বাভাবিক ফাটল ধরেছে।

চেঁচিয়ে বললে, 'এই দাগটা পেরিয়ে তোমরা আসবে না।'

যে-চারজন ইণ্ডিয়ান ঠাকুমাকে তাঁর তক্তা লাগানো খাটুলিতে ক'রে ব'য়ে আনছিলো, ঐ ধমকটা শোনবামাত্র তারা থমকে দাঁড়ালে। যদিও খাটুলির কাঠগুলোর ওপর বেশ অস্বচ্ছন্দেই ব'সে ছিলেন ঠাকুমা আর তাঁর মনমেজাজ যদিও মরুভূমির ধূলোয় আর ঘামে কেমন ভোঁতা হ'য়ে এসেছিলো, ঠাকুমা তবু তাঁর উদ্ধত বদমেজাজটা আদ্যোপান্ত বজায় রাখলেন। এরেন্দিরা আসছিলো পায়ে হেঁটে। খাটুলিটার পেছন-পেছন মালপত্র ব'য়ে আসছিলো আটজন ইণ্ডিয়ানের এক সার আর সব শেষে তার বাইসাইকেলে চেপে আসছিলো ছবিওলা।

'মরুভূমি কারু বাপের জমি নয়,' বললেন ঠাকুমা।

'মরুভূমি ঈশ্বরের,' আশ্রমিক বললে, 'আর তোমরা তোমাদের ঐ ঘিনঘিনে ব্যাবসায় তাঁর সব পবিত্র বিধি লঙ্ঘন করেছো।'

ঠাকুমা ততক্ষণে শনাক্ত করেছেন আশ্রমিকের উপদ্বীপের ভাষা, কথ্য বুলির বিশেষ ব্যবহার ; চুঁ শোচুঁ পি সংঘর্ষটা তিনি এড়িয়ে গেলেন : তার অনড় আপোষ-হীন মতামতের দেয়ালে মাথা ঠুকে তিনি মাথা ভাঙতে চান না। তিনি পরক্ষণেই তাঁর আপন মূর্তি ধরলেন।

'আমি, বাপু, তোমার এইসব রহস্য বুঝি না।'

আশ্রমিক আঙুল তুলে এরেন্দিরাকে দেখালে।

'ঐ বালিকা নিতান্তই অপ্রাপ্তবয়স্ক।'

'কিন্তু সে আমার নাৎনি।'

'তাহ'লে তো আরো খারাপ,' আশ্রমিক উত্তর দিলে। 'স্বেচ্ছায় একে আমাদের তত্ত্বাবধানে রেখে যাও, নতুবা আমরা অন্য উপায় অবলম্বন করতে বাধ্য হবো।'

তারা যে অ্যাদ্দুর যাবে, এটা ঠাকুমা আশা করেননি।

'তাই যদি হয় তো ঠিক আছে।' তিনি আতঙ্কিত হ'য়ে আত্মসমর্পণ করলেন। 'কিন্তু আগেই হোক পরেই হোক, আমি এখান দিয়ে যাবোই।'

আশ্রমিকদের সঙ্গে সংঘাতের তিনদিন পরে, ঠাকুমা আর এরেন্দিরা গির্জের আশ্রমের কাছেই একটা গ্রামে ঘুমুচ্ছিলো, এমন সময় একদল সন্তর্পণ নিঃশব্দ লোক, পদাতিক বাহিনীর টহলের মতো পা টিপে-টিপে এসে, লুকিয়ে, তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়লো। এরা সবশুদ্ধ ছ-জন, ইণ্ডিয়ান নবীশ, বলিষ্ঠ আর কচিবয়েস, তাদের রুক্ষ কাপড়ের আলখিল্লা যেন জ্যোৎস্নায় জ্বলজ্বল করছিলো। টুঁ শব্দটি না-ক'রে তারা এরেন্দিরাকে একটা মশারির জালে জড়ালো, তারপর তাকে না-জাগিয়েই তাকে তারা তুলে নিলে, তাকে যখন তারা ব'য়ে নিয়ে গেলো মনে হ'লো মস্ত একটা ক্ষীণজীবী নশ্বর মাছ যেন চাঁদিম জালে ধরা প'ড়ে গিয়েছে।

তাঁর নাৎনিকে আশ্রমিকদের রক্ষণাবেক্ষণ থেকে উদ্ধার করতে কোনো উপায়ই বাদ দিলেন না ঠাকুমা। যখন সব চেষ্টাই—তা সে সরলসোজাই হোক বা অতীব ঘোরপ্যাঁচওলাই হোক—বিফল হ'লো, শুধু তখনই তিনি পুর কর্তৃপক্ষের শরণ নিলেন, যে-বেসামরিক পৌর দায়িত্ব ন্যস্ত ছিলো একজন সামরিক কর্মচারীর ওপর। তাঁকে তিনি দেখতে পেলেন তাঁর বাড়ির উঠোনে, বুক খোলা, সামরিক বাহিনীর একটা রাইফেল তাগ ক'রে জ্বলন্ত আকাশে একটা কালো নিঃসঙ্গ মেঘের দিকে গুলি ছুঁড়ছেন। মেঘটাকে গুলিতে ঝাঁঝরা ক'রে তিনি বৃষ্টি নামাতে চাচ্ছিলেন, আর তাঁর গুলিগুলো হচ্ছিলো ক্ষিপ্ত আর নিষ্ফল, তবে তিনি ঠাকুমার কাহনটা শোনবার মতো জরুরি সময়টা দিলেন।

'আমি তো কিছু করতে পারবো না,' ঠাকুমার সব কথা শোনবার পর তাঁকে তিনি ব্যাখ্যানা ক'রে বোঝালেন। 'পোপের সঙ্গে শাসকদের যে-চুক্তি হয়েছে সেই অনুযায়ী পুরুৎরা প্রাপ্তবয়স্ক না-হওয়া অব্দি যে-কাউকে আটকে রাখতে পারে। কিংবা তার বিয়ে-হওয়া অব্দি।'

'আপনাকেই-বা তাহ'লে এখানে মেয়র হিশেবে রেখেছে কেন ওরা?' ঠাকুমা জিগেশ করলেন।

'বৃষ্টি নামাবার জন্যে,' মেয়রের সাফ জবাব।

তারপর যখন দেখলেন মেঘটা পাল্লার বাইরে চ'লে গিয়েছে, মেয়র তাঁর সরকারি দায়িত্ব মুলতুবি রেখে ঠাকুমাকেই পুরোপুরি মনোযোগ দিলেন।

'আসলে আপনার এমন-একজনকে চাই যার যথেষ্ট ওজন আছে, যে আপনার হ'য়ে জামিন থাকবে,' মেয়র বললেন ঠাকুমাকে। 'এমন-কেউ যে হলফ ক'রে আপনার স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে শংসাপত্র দেবে, নাম সই ক'রে চিঠি লিখে যে আপনার যাবতীয় সদ্‌গুণ সম্বন্ধে জবান দেবে। আপনি সেনাদোর [সাংসদ] ওনেসিমো সানৃচেসকে চেনেন ?'

নগ্ন সূর্যের তলায় তাঁর বিপুল ও নশ্বর পাঞ্চভৌতিক নিতম্বের তুলনায় বড্ড ছোটো একটা চৌকির ওপর ব'সে ঠাকুমা বেজায় রেগে গিয়ে উত্তর দিলেন :

'মরুভূমির এই বিশালের মধ্যে আমি তো নিতান্তই এক নগণ্য স্ত্রীলোক।'

মেয়র, তাঁর ডান চোখটা গরমে কুঁচকে গিয়েছে, তাঁর দিকে করুণার ভঙ্গিতে তাকালেন।

'তাহ'লে, সেনিওরা, মিছেমিছি সময় নষ্ট করবেন না,' মেয়র বললেন, 'আপনাকে তাহ'লে জাহান্নামেই ভাজা-ভাজা হ'তে হবে।'

ঠাকুমা, অবশ্য, ভাজা-ভাজা হলেন না। আশ্রমটার ঠিক মুখোমুখি তিনি তাঁর তাঁবু গাড়লেন, তারপর ভাবতে বসলেন, যেমন ক'রে কোনো যোদ্ধা একা-একাই সুরক্ষিত কোনো নগরী দখল ক'রে নেবার কথা ভাবে। ভ্রাম্যমাণ ছবিওলা, যে তাঁকে খুবই ভালো চিনে ফেলেছিলো, তার সব মালপত্র তার সাইকেলে চাপিয়ে একা-একাই কেটে পড়বার উদ্‌যোগ করাছিলো, বিশেষত যখন সে লক্ষ করলে যে ঠা-ঠা রৌদ্রের মধ্যে ঠাকুমা আশ্রমের দিকে ঠায় নজর রেখে ব'সে আছেন।

'দেখাই যাক, কে আগে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে,' ঠাকুমা বললেন, 'ওরা না আমি !'

'ওরা এখানে আছে তিন-তিনশো বছর—আর এখনও ওরা সব সহ্য করতে পারছে,' ছবিওলা বললে, 'আমি চললাম।'

শুধু তখনই ঠাকুমা দেখতে পেলেন যে সাইকেলে তার সব জিনিশপত্তর চাপানো।

'তুমি আবার কোথায় চললে ?'

'হাওয়া যেখানে আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়,' বললে ছবিওলা, আর সত্যি চ'লেও গেলো। 'পৃথিবী তো বিপুলা।'

ঠাকুমা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

'ওহে অকৃতজ্ঞ, তুমি যত বড়ো ব'লে ভাবছো পৃথিবী তত বড়ো নয় অবিশ্যি।'

বিষম রাগ হওয়া সত্ত্বেও তিনি কিন্তু তাঁর মাথা নড়ালেন না, তাহ'লে যে ঐ আশ্রম থেকে নজর সরাতে হয়। ঐ খনিজ উত্তাপের অনেক অনেকদিন কিংবা খ্যাপা হাওয়ার অনেক অনেক রাত তিনি আর ওখান থেকে নড়লেন না, কারণ সারাক্ষণই তিনি মগ্ন হ'য়ে ছিলেন ভাবনায়, তাছাড়া আশ্রম থেকেও এর মধ্যে কেউ বেরোয়নি। তাঁবুর পাশেই ইণ্ডিয়ানরা তালপাতা দিয়ে একটা আটচালা বানিয়ে তাদের দোলখাটিয়াগুলো সেখানেই টাঙিয়ে দিয়েছিলো, ঠাকুমা কিন্তু তাঁর সিংহাসনে ব'সে মাথা নেড়ে-নেড়ে অনেক রাত অব্দি নজর রেখেই চলতেন আর তাঁর বটুয়া থেকে না-রাঁধা দানাশস্য গালে ফেলে চিবুতেন—যেন অপরাজেয় অলস বিশ্রামে কোনো বলীবর্দ।

এক রাত্তিরে ঠাকুমার একেবারে গা ঘেঁষে গেলো তেরপল-ঢাকা ট্রাকের একটা বহর, আর সে-সব ট্রাকে একমাত্র যে-আলো জ্বলছিলো তা একটা রঙিন বাল্‌বের মালা, দেখে মনে হচ্ছিলো যেন ঘুমের ঘোরে চলেছে কতগুলো বেদি। ঠাকুমা তাদের তক্ষুনি চিনে ফেললেন, কারণ এগুলো ঠিক আমাদিসদের ট্রাকের মতো দেখতে। বহরের শেষ ট্রাকটা গতি মন্থর ক'রে শেষটায় পুরোপুরি থেমেই পড়লো আর চালকের খোপ থেকে একটা লোক নেমে এসে পেছনে কী যেন সারাতে চেষ্টা করলে। তাকে দেখে মনে হয় ঠিক যেন আমাদিসদেরই হুবহু, অবিকল, সংস্করণ, মাথায় কানা-তোলা টুপি, পায়ে উঁচু বুটজুতো, বুকে কাটাকুটি ক'রে গেছে দু-সার কার্তুজের বন্ধনী, একটা ফৌজি রাইফেল আর দুটো পিস্তল। অপ্রতিরোধ্য প্রলোভনে প'ড়ে ঠাকুমা লোকটাকে ডাকলেন।

'চিনতে পারছো না আমি কে?' তাকে তিনি জিগেশ করলেন।

লোকটা একটা বিজলি মশাল জেলে নির্দয়ভাবে তাঁকে আলো ক'রে দিলে। কড়া নজর রেখে অবসন্ন মুখটিকে সে নিরীক্ষণ করলে এক ঝলক: চোখ দুটি অবসাদে মিইয়ে এসেছে, চুল শুকিয়ে জটপাকানো, তবু স্ত্রীলোকটি, এই বয়েসেও, এমন দুরবস্থাতেও, মুখের ওপর অমন রূঢ় আলো সত্ত্বেও, লোকটা বলতে পারতো, তবু এই রমণীই ছিলো জগতের সবচেয়ে সেরা রূপসী। যখন সে তাঁকে নিরীক্ষণ ক'রে নিশ্চিত হ'লো যে তাঁকে সে এর আগে কখনোই দ্যাখেনি, সে আলো নিভিয়ে দিলে।

'একটা জিনিশ আমি ঠিক জানি যে আপনি চিররহস্যের করুণাময়ী কুমারী নন।'

'ঠিক তার উলটো,' ঠাকুমা অতীব মধুর স্বরে বললেন। 'আমিই সেই মহিলা।'

বিশুদ্ধ সহজাত শক্তির বশেই লোকটা তার পিস্তলের বাঁটে হাত রাখলে।

'কোন মহিলা? কী মহিলা?'

'বড়ো আমাদিসের।'

'আপনি তাহ'লে এই জগতেরই নন,' সে কী-রকম টান-টান হ'য়ে গিয়ে বললে। 'কী চাই আপনার?'

'আমার নাৎনিকে—বড়ো আমাদিসের নাৎনিকে—উদ্ধার করবার জন্যে তোমার সাহায্য চাই। আমাদের ছেলে আমাদিসের মেয়ে গির্জের এই আশ্রমে বন্দী হ'য়ে আছে।'

লোকটা তার ভয়কে জয় করলে।

'ভুল দরজায় কড়া নেড়েছেন আপনি,' সে বললে। 'আপনি যদি ভেবে থাকেন যে আমরা ভগবানের কাজে-কারবারে জড়িয়ে পড়বো, তাহ'লে বোঝা যায় আপনি নিজের যে-পরিচয় দিলেন সেটা ঠিক নয়—আপনি তাহ'লে মোটেই আপনি নন, আমাদিসদের আপনি কস্মিন কালেও জানতেন না এবং চোরাচালানের কারবারটা যে কী সে-সম্বন্ধে আপনার কোনো বেশ্যা-ধারণাও নেই।'

সেদিন ভোরবেলায় ঠাকুমা অন্যদিনের চেয়েও কম ঘুমুলেন। শুয়ে-শুয়ে জেগে রইলেন তিনি, গভীর ভাবলেন নানা বিষয়ে, গায়ে চাপানো এক পশমিনার চাদর, আর ভোর হবার আগে তাঁর স্মৃতি জট পাকিয়ে গেলো, আর চাপা-পড়া সেই ক্ষিপ্ত প্রলাপ ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছিলো তাঁর ভেতর থেকে যদিও তিনি তখন জেগেই আছেন, আর তাঁকে আঁটো ক'রে বাঁধতে হ'লো বুক, হাত চাপা দিতে হ'লো বুকে, যাতে সমুদ্রের ধারের সেই বাড়ি তার সব মস্ত লাল-লাল ফুল যেখানে তিনি সুখী ছিলেন এককালে তার সেই বাড়ির স্মৃতি যেন এখন তাঁর দম আটকে না-দেয়। এইভাবেই প'ড়ে রইলেন তিনি, যতক্ষণ-না আশ্রমের ঘণ্টা বাজলো আর দিনের প্রথম আলো পড়লো জানলায়-জানলায় আর মরুভূমিতে—আর গির্জের প্রভাতী উপাসনার গরম-গরম রুটির গন্ধে মরুভূমি উপচে পড়লো। শুধু তখনই তিনি ঝেড়ে ফেললেন তাঁর অবসাদ, তাঁর ক্লান্তি; কেমন-একটা বিভ্রম তাঁকে যেন প্রতারণা করলে: যেন এরেন্দিরা উঠে প'ড়ে মরীয়া হ'য়ে পালাবার একটা উপায় খুঁজছে, এসে পড়তে চাচ্ছে তাঁর কাছে।

তারা তাকে জোর ক'রে আশ্রমে ধ'রে নিয়ে যাবার পর থেকে এরেন্দিরা অবশ্য এক রাত্রির জন্যেও তার ঘুম হারায়নি। তারা ঝোপ-ছাঁটার কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলেছে তার চুল যতক্ষণ-না তার মাথা দেখায় কোনো বুরুশের মতো, তার গায়ে

চাপিয়েছে কোনো সন্ন্যাসীর রুক্ষ আলখিল্লা, তাকে দিয়েছে একটা ঝাড়ন আর চুন-গোলা বালতি যাতে সে প্রতিবার সিঁড়ি দিয়ে কেউ উঠে বা নেমে গেলে সিঁড়িটায় সে চুনকাম ক'রে দিতে পারে। খচ্চরের কাজ এটা, কারণ অনবরত অবিশ্রাম কাদামাখা জুতো প'রে আশ্রমিকরা আর নবীশ বাহকরা আসছে যাচ্ছে, কিন্তু তবু এরেন্দিরার মনে হচ্ছিলো প্রতিদিনই এখন যেন রোববার—কয়েদির সেই ঝোড়ো নৌকোর মতো বিছানার পর ছুটির দিনটায় যখন সে শুয়ে থাকতো। তাছাড়া রাত্তিরে শুধু সে একাই ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তো না, কারণ এই আশ্রম নিজেকে উৎসর্গ করেছিলো—না, শয়তানকে ঠেকাবার জন্যে নয়, বরং মরুভূমির বিরুদ্ধেই এক অন্তহীন লড়াইতে। এরেন্দিরা নিজের চোখে দেখেছে ইণ্ডিয়ান নবীশেরা গোরুদের দুধ দুইবার জন্যে ডালকুত্তোর মতো হন্যে হ'য়ে যায়, তক্তার ওপর লাফঝাঁপ দেয় দিনের পর দিন পনীরকে চেপটে আটো ক'রে বানাবার জন্যে, বা কোনো ছাগীকে কীভাবে তারা সাহায্য করে যখন কঠিন হ'য়ে ওঠে তার প্রসবচেষ্টা। সে তাদের দেখেছে চামড়াপাকানো ডকশ্রমিকদের মতো ঘেমে-নেয়ে অস্থির, জলাধার থেকে জল আনবার সময়; হাতে-হাতে জল ছিটোচ্ছে কোনো দুঃসাহসী বাগানে অন্য নবীশেরা যাকে নিড়ানি দিয়ে সাফ করছে, চকমকিপাথরের মতো কঠিন সেই মরুভূমিতে সব্জি ফলাবার জন্যে। নিজের চোখেই সে দেখেছে পার্থিব নরকচুল্লিগুলো রুটি যেখানে সেঁকা হয় আর সেই ঘরগুলোও দেখেছে যেখানে জামাকাপড় ইস্ত্রি করা হয়। সে দেখেছে এক সন্নেসিনি উঠোনে তাড়া ক'রে বেড়াচ্ছে এক শুওরকে, পলাতক জন্তুটির কান পাকড়ে ধ'রে কীভাবে তার টানে আছড়ে প'ড়ে হিঁচড়ে গেছে আর কিছুতেই তাকে ছেড়ে না-দিয়ে গড়াগড়ি খেয়েছে কাদায়. আর চামড়ার ওপর-জামা পরা দুই নবীশ এসেছে শুওরটাকে বাগে আনবার জন্যে তাকে সাহায্য করতে আর একজন একটা কশাইয়ের ছুরি দিয়ে কেটেছে শুওরটার গলা আর সবাই মিলে কেমন ক'রে রক্তে-কাদায় মাখামাখি হ'য়ে গেছে। রুগীদের অন্তরণমহলে সে দেখেছে ক্ষয়রোগে-ভোগা সন্নেসিনিদের—রাতকাপড়ের কাফনে মোড়া—যেন অপেক্ষা ক'রে আছে ঈশ্বরের শেষ অনুজ্ঞাটির জন্যে, আর তারা যখন অলিন্দে ব'সে কনের সাজ বোনে পুরুষরা ধর্মপ্রচার ক'রে বেড়ায় ধূ-ধূ মরুভূমিতে। এরেন্দিরা এতদিন যেন তার নিজেরই ছায়ায় বেঁচে ছিলো, এখন সে একে-একে আবিষ্কার করছে সুন্দর আর আতঙ্কের অন্যসব রূপ যা সে কখনও কল্পনাও করেনি তার ঐ সংকীর্ণ শয্যার জগতে; কিন্তু তাকে আশ্রমে ধ'রে নিয়ে যাবার পর থেকে সবচেয়ে ভোঁতা স্থূল অথবা সবচেয়ে মনোহর নবীশও

তার মুখ থেকে একটা কথাও বার করতে পারেনি। একদিন সকালে, সে যখন তার বালতিতে শাদা রং গুলছে, সে শুনতে পেলে তারের যন্ত্রে বাজানো স্বর যেটা এমনই হালকা আলোর মতো যা মরুভূমির সব আলোর চাইতেও অনেক বেশি স্বচ্ছ, টলটলে। এই অলৌকিকে সম্মোহিত হ'য়ে, সে উঁকি মেরে দ্যাখে এক বিশাল শূন্য আপ্যায়ন ঘর, দেয়ালগুলো ফাঁকা আর বড়ো-বড়ো জানলার মধ্য দিয়ে চোখধাঁধানো জুনের আলো ঝ'রে পড়ছে আর যেন থমকে আছে স্থির ; আর ঘরের ঠিক মাঝখানে সে দেখতে পেলে এক পরমাসুন্দরী সন্নেসিনিকে যাকে সে এর আগে কখনোই চোখে দ্যাখেনি, সন্নেসিনি ক্ল্যাভিক্যাডে ঈস্টারপরবের এক অরেটোরিও বাজাচ্ছে। চোখের পাতা একবারও না-ফেলে এরেন্দিরা শুনতে লাগলো স্বর, তার বুকটা যেন সুতোর ডগায় ঝুলছে, আর সে শুনেই চললো স্বর যতক্ষণ-না মধ্যাহ্নভোজের ঘণ্টা বাজলো। খাবার পর, যখন সে তার খাগড়ার বুরুশ দিয়ে সিঁড়িতে শাদা রঙের পোঁচ বোলাচ্ছে, সে অপেক্ষা ক'রেই রইলো যতক্ষণ-না সব নবীশেরা সিঁড়ি বেয়ে আসা-যাওয়া ওঠা-নামা থামালে, তারপর যখন সে একেবারেই একা, কেউ যখন তাকে শোনবার নেই, শুধু তখনই আশ্রমে আসবার পর এই প্রথম সে কথা বললে।

বললে, 'আমি সুখী।'

ঠাকুমার মনে যে-আশা ছিলো যে এরেন্দিরা নিজেই পালিয়ে এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দেবে, এই কথা, কাজেই, তাতেই ইতি টেনে দিলে ; তবে ঈস্টারের সাত সপ্তাহ পরে পেন্টেকস্টের পরবের আগে পর্যন্ত সে বজায় রেখে গেলো তার গ্র্যানাইট মৌনতা। সেই সময়ে আশ্রমিকেরা মরুভূমিতে চিরুনি চালিয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছিলো গর্ভবতী যত উপপত্নীকে, যাতে তাদের বিয়ে দিয়ে দিতে পারে। একটা লজ্‌ঝড় ট্রাকে ক'রে চার-চারজন অতিসশস্ত্র সৈন্য আর শস্তা কাপড়ে বোঝাই সিন্দুক নিয়ে তারা সবচেয়ে দূর-দূর বসতিগুলোতে গিয়েও হানা দিচ্ছিলো। সেই ইণ্ডিয়ান মৃগয়ার সবচেয়ে কঠিন অংশ ছিলো মেয়েদের বিশ্বাস করানো : মেয়েরা ঐশ্বরিক শ্রী বা আশীর্বাদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করছিলো এই সত্যি যুক্তিটা দেখিয়ে যে মরদরা, যারা ঠ্যং ছড়িয়ে সারাক্ষণ দোলখাটিয়ায় ঘুমোয়, মনে করে উপপত্নী-দের চাইতে বৈধ পত্নীদের কাছ থেকেই তারা আরো হাড়ভাঙা খাটুনি দাবি করতে পারে। তাদের মন ভোলাবার জন্যে জরুরি হ'য়ে পড়লো ছলকৌশল : তাদের নিজেদের ভাষায় ঈশ্বরের অভিপ্রায়কে চিনির পানায় গুলে দেয়া জরুরি হ'লো যাতে কথাগুলো খুব রুক্ষ না-শোনায়, কিন্তু তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে

দমফাটা ছলচাতুরীবাজ সে শুদ্ধ বিয়েয় বিশ্বাস ক'রে বসলো একজোড়া ঝকমকে কানের দুল দেখেই। মরদদের, অন্যদিকে, একবার যখন মেয়েদের সম্মতি আদায় করা হ'য়ে গেলো, রাইফেলের কুঁদোর ঘায়ে এক-এক ক'রে তোলা হ'লো তাদের দোলখাটিয়া থেকে, বাঁধা হ'লো তাদের আষ্টেপৃষ্ঠে, চাপানো হ'লো ট্রাকের পেছনে যাতে জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে গিয়ে তাদের বিয়ে দেয়া যায়।

কয়েকদিন ধ'রেই ঠাকুমা দেখছিলেন ছোট্ট ট্রাকটা বোঝাই ক'রে গর্ভবতী ইণ্ডিয়ান মেয়েদের আশ্রমে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কিন্তু সুযোগটা তিনি গোড়ায় ধরতেই পারেননি। ধরতে পারলেন শুধু পেন্টেকস্টের রবিবারটায়, যখন তিনি দেখলেন বাজি ফাটছে হাউই উড়ছে ঘণ্টা বাজছে আর দেখতে পেলেন দুর্দশা আর হুল্লোড়ে ভরা একটা ভিড় যেটা পাঁই-পাঁই ক'রে উৎসবের দিকে ছুটেছে, আর তিনি দেখতে পেলেন মুখে ঝালর লাগানো ওড়না আর মাথায় নববধুর টোপর প'রে ভিড়ের মধ্যে রয়েছে একদল গর্ভবতী মেয়ে, ধ'রে আছে তাদের সাময়িক পুরুষ সঙ্গীর বাহু, যাদের সঙ্গে তারা বৃন্দ বিবাহ মারফৎ বৈধ সম্পর্ক পাতাবে।

মিছিলটার সব শেষে যাচ্ছিলো এক কিশোর, অপাপবিদ্ধ হৃদয়, লাউয়ের খোলের মতো ক'রে কাটা ইণ্ডিয়ান চুল তার, গায়ে ছেঁড়া কাপড়, হাতে রেশমি ফিতে লাগানো ঈস্টারের এক মোমবাতি। ঠাকুমা তাকে ডাক দিলেন।

'বাছা, আমাকে শুধু এই কথাটা বলো,' তাঁর সবচেয়ে মসৃণ স্বরে শুধোলেন ঠাকুমা, 'এ-ব্যাপারটায় তোমার ভূমিকাটা ঠিক কী।'

মোমবাতিটাই ছেলেটিকে কেমন ভয় পাইয়ে দিচ্ছিলো, আর তার গাধার মতো দাঁতের জন্যে তার পক্ষে মুখ বোজাও সম্ভব হচ্ছিলো না।

'পুরুৎরা আমাকে প্রথম খ্রিষ্টিয় ভোজ দেবে,' সে বললে।

'কত টাকা দিয়েছে ওরা?'

'পাঁচ পেসো।'

ঠাকুমা তাঁর বটুয়া থেকে একতাড়া নোট বার করলেন। ছেলেটি অবাক হ'য়ে সেগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলো।

'আমি দেবো কুড়ি পেসো,' বললেন ঠাকুমা, 'তোমার ঐ প্রথম খ্রিষ্টিয় প্রার্থনা-ভোজের জন্যে নয়, তোমাকে টাকা দেবো বিয়ে করার জন্যে।'

'কাকে?'

'আমার নাৎনিকে।'

এইভাবেই আশ্রমের উঠোনে সন্নেসিনির ঢোলা আলখিল্লা আর একটা

রেশমি শাল প'রে—এটা তাকে দিয়েছিলো নবীশরা—এরেন্দিরার বিয়ে হ'লো, ঠাকুমা তার জন্যে যে-বর কিনেছেন তার নামটা অব্দি না-জেনেই। নিশ্চল জ্বলন্ত সূর্যের তলায় দুশো গর্ভবতী নববধূর গায়ের ছাগীগন্ধের মধ্যে টালমাটাল আশায় সে শোরার জমির ওপর নতজানু হ'য়ে বসার যন্ত্রণাটা সহ্য করলে। লাতিনে হাতুড়ি-পেটা ক'রে শোনানো হ'লো সান পাবলোর চিঠির শাস্তিতালিকা, কারণ আশ্রমিকেরা খুঁজেই পায়নি এই অদৃষ্টপূর্ব বিয়ের ছলনাজালকে ঠেকাবে কী ক'রে। তবে শেষ চেষ্টা হিশেবে তারা তাকে আশ্রমে রেখে দেবার জন্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো। সেই সামরিক পুরপিতা যে মেঘকে তাগ ক'রে গুলি ছোঁড়ে, ধর্মপ্রচারের প্রধান অধ্যক্ষ, তার আনকোরা স্বামী আর তার ভাবলেশহীন ঠাকুমা—এদের উপস্থিতিতে এরেন্দিরার বিয়ে হ'য়ে গেলো; আবার এরেন্দিরা নিজেকে আবিষ্কার করলে সেই মায়াপাশে বন্দিনী যা তাকে আজন্ম চালিয়ে নিয়ে আসছে। যখন তারা তাকে জিগেশ করলে তার স্বাধীন, সুনিশ্চিত, সত্যিকার অভিপ্রায়টা কী, সে একফোঁটাও দ্বিধা দেখালে না।

'আমি চ'লে যেতে চাই,' সে বললে। আর সে আঙুল তুলে তার স্বামীকে দেখিয়ে ব্যাপারটা আরো প্রাঞ্জল ক'রে তুললো। 'তবে এর সঙ্গে নয়—আমার ঠাকুমার সঙ্গে।'

...

তার বাবার নারঙ্গ বন থেকে একটা কমলালেবু চুরি করার চেষ্টায় উলিসেস একটা আস্ত বিকেলই নষ্ট ক'রে ফেললে। কারণ যখন তার অসুখে-ভোগা গাছগুলো ছাঁটছিলো তার বাবা তার ওপর থেকে একবারও নজর সরাননি, তাছাড়া বাড়ির ভেতর থেকে সারাক্ষণ সজাগ তাকিয়েছিলেন তার মা। তাই সে তার মৎলবটাই ছেঁটে ফেললে, অন্তত সেদিনকার মতো; আর ভেতরে-ভেতরে গজগজ করতে-করতেই বাবাকে সাহায্য ক'রে গেলো সে, যতক্ষণ-না তারা শেষ নারঙ্গগাছটার পাতা-টাতা ছেঁটে ফেললে। নারঙ্গকুঞ্জটা বিশাল, লুকোনো, চুপচাপ; আর কাঠের বাড়ি, টিনের চাল, জানলায় তামার জাফরি আর খুঁটির ওপর উঁচু ক'রে দাঁড় করানো মস্ত একটা পাতিও: আদিম সব উদ্ভিদ লতাপাতায় যেখানে প্রখর তীব্র সব ফুল ফুটে আছে। উলিসেসের মা পাতিওয় একটা ভিয়েনায়-তৈরি দোলকেদারায় হেলান দিয়ে ব'সে ছিলেন, মাথাধরা সারাবার জন্যে কপালে ধূমায়িত সব লতাপাতা, আর তাঁর সতেজ ইণ্ডিয়ান চাউনি কোনো অদৃশ্য আলোর রশ্মির মতো ছেলেকে অনুসরণ ক'রে বেড়াচ্ছিলো কমলাবনটার সুদূরতম কোণটা পর্যন্ত।

উলিসেসের মা বেশ সুন্দরী, স্বামীর চেয়ে বয়েসে অনেক ছোটো, আর তিনি যে এখনও তাঁর উপজাতীয় পোশাক পরেন তা-ই নয়, তিনি তাঁর রক্তের সবচেয়ে প্রাচীন কুহেলিগুলোও জানেন।

গাছ-ছাঁটার কাঁচি-টাচি নিয়ে উলিসেস যখন বাড়ি ফিরলো, তার মা তাকে তাঁর বেলা চারটের ওষুধ এনে দিতে বললেন—কাছেই একটা টেবিলে ছিলো সে-ওষুধ। যেই সে তাদের ছুঁলো, গেলাশ আর শিশি তাদের রং পালটে ফেললো। তারপর, শুধু খেলার ছলেই, সে টেবিলের ওপর কতগুলো কাচের বাটির পাশেই যে কাচের কুঁজোটা ছিলো সেটা ছুঁলো আর অমনি তারও রং নীল হ'য়ে গেলো। মা ওষুধ খেতে-খেতে ছেলেকে ভালো ক'রে নিরীক্ষণ করলেন, তারপর যখন বুঝলেন যে এ তাঁর কোনো বিকারের ঘোর নয়, তখন তাকে তিনি গুয়াহিরা ইণ্ডিয়ান ভাষায় জিগেশ করলেন :

'কতদিন ধ'রে তোর এ-রকম হচ্ছে ?'

'সেই যখন আমরা মরুভূমি থেকে ফিরে এলাম তখন থেকেই,' উলিসেস বললে, তেমনি গুয়াহিরা ভাষায়। 'এ শুধু হয় কাচের জিনিশ ছুঁলেই।'

দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাবার জন্যে সে টেবিলের ওপর যত বাটি-গেলাশ ছিলো সব এক-এক ক'রে ছুঁলো আর তারা সব নানান রঙে ঝলমল ক'রে উঠলো।

'ও-রকম হয় শুধু প্রেমে পড়লেই,' তার মা বললেন। 'কে সে ?'

উলিসেস কোনো উত্তর দিলে না। তার বাবা—তিনি আবার গুয়াহিরা ভাষা বোঝেন না—তখন একরাশ কমলা নিয়ে পাতিওর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

'কী বলছিস তোরা দুজনে ?' তিনি জিগেশ করলেন উলিসেসকে, ওলন্দাজ ভাষায়।

'বিশেষ কিছুই না,' উলিসেস উত্তর দিলে।

বাবা যখন বাড়ির ভেতরে চ'লে গেলেন তখন তিনি ক্ষণিকের জন্যে উলিসেসের চোখের আড়াল হ'য়ে গিয়েছিলেন, তবে সে তাঁকে একটু পরেই আপিশঘরের মধ্যে দেখতে পেলে, একটা জানলা দিয়ে। যতক্ষণ-না ছেলের সঙ্গে একা হলেন মা অপেক্ষা ক'রে ছিলেন, তারপর আবার জিগেশ করলেন :

'কে সে, বল আমায়।'

'ও কেউ-না,' উলিসেস বললে।

উলিসেস উত্তর দিয়েছিলো একেবারেই আনমনাভাবে, কারণ বাবা আপিশ-ঘরে কী করেন না-করেন প্রতিটি খুঁটিনাটি নড়াচড়া সে অধীরভাবে লক্ষ করছিলো।

যখন তিনি নম্বর ঘুরিয়ে সিন্দুকের তালা খুললেন তার আগে কমলাগুলো তিনি সিন্দুকের ওপর রেখেছিলেন। কিন্তু সে যখন অপলকে তার বাবার ওপর নজর রাখছে তার মা তখন একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়েছিলেন।

'অনেকদিন তুই কোনো রুটি খাসনি,' মন্তব্য করলেন তার মা।

'রুটি আমার ভাল্লাগে না।'

সচরাচর যা হয় না, তা-ই হ'লো : মা-র মুখ হঠাৎ কেমন সজীব হ'য়ে উঠলো। 'মিছে কথা,' তিনি বললেন। 'রুটি তুই খাস না কারণ তুই প্রেমে প'ড়ে হাবুডুবু খাচ্ছিস—আর যারা প্রেমরোগে ভোগে তারা রুটি খেতে পারে না।' তাঁর গলার স্বরও, তাঁর চোখের মতোই, অনুনয় থেকে ভয় দেখাবার মতো সতেজ হ'য়ে উঠলো।

'সে কে, আমাকে যদি বলতিস, তাহ'লে ভালো হ'তো,' তিনি বললেন, 'না-হ'লে আমি তোকে মন্ত্রপড়া জলে স্নান করাবো—যাতে তোর এই দশা কেটে যায়।'

আপিশঘরে ওলন্দাজ সিন্দুক খুললেন, কমলাগুলো রাখলেন ভেতরে, তারপর আবার সাঁজোয়া ডালাটা বন্ধ ক'রে দিলেন। উলিসেস তখন জানলা থেকে স'রে এসে অধীর গলায় তার মাকে উত্তর দিলে :

'তোমায় তো বলেইছি ও কেউ-না,' সে বললে। 'যদি তোমার বিশ্বাস না-হয়, বাবাকে জিগেশ কোরো।'

ওলন্দাজ তাঁর আপিশঘরের দরজায় তাঁর খালাশির পাইপটা জ্বালতে-জ্বালতে আবির্ভূত হলেন, তাঁর বগলে জরাজীর্ণ এক বাইবেল। তাঁর স্ত্রী তাঁকে এস্পানিওলে জিগেশ করলেন :

'মরুভূমিতে তোমাদের সঙ্গে কার দেখা হয়েছিলো?'

'কারু সঙ্গে না,' তাঁর স্বামী উত্তর দিলেন, কিছুটা যেন মেঘের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছেন। 'আমাকে যদি বিশ্বাস না-হয়, উলিসেসকে জিগেশ কোরো।'

যতক্ষণ-না সব তামাক পুড়ে গেলো পাইপটা চুষতে-চুষতে তিনি হলঘরটার শেষপ্রান্তে ব'সে রইলেন। তারপর তিনি এলোপাথারি খুললেন তাঁব বাইবেল, আর দু-ঘণ্টা ধ'রে প্রবহমান ঝমঝমে ওলন্দাজ ভাষায় দাগ-দেয়া অংশগুলো প'ড়ে গেলেন।

মাঝরাতেও উলিসেস এমন তীব্রভাবে চিন্তা করছিলো যে সে ঘুমুতেই পারছিলো না। আরো একঘণ্টা সে তার দোলখাটিয়ায় ছটফট ক'রে এপাশ-ওপাশ করলে : স্মৃতির বেদনাকে জয় ক'রে নেবার চেষ্টা করছে সে; কিন্তু শেষটায় এই

বেদনাই তাকে এমন শক্তি দিলে যে সে তার মন স্থির ক'রে ফেললে। তারপর সে প'রে নিলে তার গাউচো পাৎলুন, পশমি ঢিলে জামা, আর তার ঘোড়ায় চড়ার বুটজুতো, তারপর লাফিয়ে নামলে জানলা দিয়ে, পাখি বোঝাই ট্রাকটা নিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলো। নারঙ্গবনের মধ্য দিয়ে যাবার সময় সে তিনটে টশটশে পাকা কমলা তুলে নিলে—বিকেলবেলায় সে এগুলো চুরি করতে পারেনি।

বাকি রাতটা সে ছুটলো মরুভূমির মধ্য দিয়ে, আর ভোরবেলায় শহর ও গ্রামগুলোয় জিগেশ করতে শুরু করলে এরেন্দিরার শুলুকসন্ধান, কিন্তু কেউই তাকে কোনো খবর দিতে পারলে না। শেষটায় কারা যেন তাকে পাত্তা দিলে যে সেনাদোর ওনেসিমো সান্‌চেসের নির্বাচনী অভিযানের দলটার সঙ্গে সে ভ্রমণ করছে, আজ হয়তো সেনাদোর সান্‌চেস আছেন নুয়েভা কাস্তিইয়ায়। উলিসেস কিন্তু তাঁকে সেখানে পেলে না, পেলে বরং তার পরের শহরে, এবং এরেন্দিরা এখন আর তাঁদের সঙ্গে নেই, কারণ ঠাকুমা শেষ অব্দি সেনাদোরকে তাঁর নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে নিজের হাতে চিঠি লিখতে রাজি করিয়েছেন, আর সেই চিঠিটা দেখিয়ে তিনি এখন মরুভূমির সবচেয়ে শক্ত খিল-হুড়কো লাগানো দরজা উদ্বোধন করতে চলেছেন। তৃতীয়দিনে উলিসেসের দেখা হ'লো ডাকহরকরার, সেই যে-ছোকরা অন্তর্দেশীয় চিঠিপত্র বিলি ক'রে বেড়ায়, আর ডাকহরকরাই তাকে বললে কোন দিকে যেতে হবে।

'ওরা সমুদ্রের দিকে যাচ্ছে,' ডাকহরকরা বললে, 'আর তুমি বরং একটু তাড়াই কোরো, কারণ যমেরও অরুচি ঐ বুড়ি মৎলব এঁটেছে সমুদ্র পেরিয়ে আরুবা দ্বীপে যাবে।'

সেই দিকনির্দেশ অনুসরণ ক'রে, আদ্ধেকটা দিন পথ চলবার পর, উলিসেস দেখতে পেলে চওড়া দাগে-ভরা তাঁবুটা ঠাকুমা যেটা দেউলে-হ'য়ে-যাওয়া একটা সার্কাসের দলের কাছ থেকে কিনেছেন। ভবঘুরে সেই ছবিওলা আবার তাঁর কাছে ফিরে এসেছে, এখন সে পুরোপুরি মেনে নিয়েছে যে জগৎ সত্যিই অতটা বড়ো নয় যেমন সে একদিন ভেবেছিলো, আর সে জমিয়ে বসিয়েছে তার রাখালিয়া দৃশ্যপট তাঁবুর খুব কাছেই। পেতলের শিঙা ফুঁকে বাজনদারদের একটা দল এরেন্দিরার খদ্দেরদের মুগ্ধ ক'রে রেখেছে, প্রায় মৌন একটা ভাল্‌জ বাজিয়ে।

উলিসেস, ভেতরে যাবার জন্যে, অপেক্ষা করলে কখন তার পালা আসে; আর প্রথম যে-জিনিশটা তার নজরে এলো সেটা হ'লো তাঁবুর ভেতরের শৃঙ্খলা: সব পরিপাটি গোছানো, পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। ঠাকুমার খাট্‌লি আবার ফিরে

পেয়েছে তার লাটসাহেবি জাঁকজমক ও মহিমা, দেবদূতের মূর্তিটা যথাস্থানে বসানো —আমাদিসদের হাড়গোড়ে-ভরা তোরঙ্গ দুটির পাশে, অধিকন্তু আছে রাং ঝালাই করা একটা স্নানের টব, সিংহের পায়ের ওপর সেটা দাঁড় করানো। তার আনকোরা চাঁদোয়া খাটানো বিছানায়, এরেন্দিরা শুয়ে আছে ন্যাংটো আর শান্ত স্থির, তাঁবুর পর্দার ফাঁক দিয়ে যে-আলো চুঁইয়ে পড়ছে তাতে তাকে দেখাচ্ছে সে যেন শিশুদের মতো লাবণ্য বিকিরণ করছে। চোখ খুলেই সে ঘুমুচ্ছে। উলিসেস তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালে, হাতে তার নারঙ্গগুলো, আর সে দেখতে পেলে যে এরেন্দিরা তাকে দেখছে না অথচ তার দিকেই তাকিয়ে আছে। তখন সে তার চোখের ওপর তার হাতের পাতা নাড়ালে, ডাকলে তাকে সেই নামে যে-নামটা সে বানিয়ে নিয়েছে যখনই তার ইচ্ছে হয় এরেন্দিরার কথা ভাবতে :

'রান্দিরেএ !'

এরেন্দিরা জেগে উঠলো। উলিসেসের সামনে নিজেকে কেমন নগ্ন লাগলো তার, একটা অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে সে একটা চাদর দিয়ে গলা অব্দি ঢেকে ফেললে।

'তাকিয়ো না আমার দিকে,' এরেন্দিরা বললে, 'আমি বীভৎস !'

'তোমার সারা গায়ে নারঙ্গের রং,' বললে উলিসেস। সে তাব চোখের সামনে কমলাগুলো তুলে ধরলে যাতে এরেন্দিরা নিজেই তুলনা ক'রে নিতে পারে। 'এই হ্যাখো।'

এরেন্দিরা চোখের থেকে হাত সরালে, দেখতে পেলে যে সত্যি তার গায়ের রং কমলার মতোই।

'আমি চাই না যে তুমি এখন থাকো,' সে বললে।

'আমি শুধু তোমাকে এটা দেখাতেই এসেছি,' বললে উলিসেস। 'চেয়ে হ্যাখো, এখানে।'

সে তার নখ দিয়ে একটা নারঙ্গের খোশা ছাড়ালে, তারপর হাতের চাপে সেটা ভেঙে দু-আধখানা করলে, আর ভেতরে কী আছে সেটা দেখালে এরেন্দিরাকে : নারঙ্গটার ঠিক মাঝখানে একটা মস্ত খাঁটি হিরে।

'এই নারঙ্গগুলোই আমরা সীমান্ত পেরিয়ে নিয়ে যাই,' সে বললে।

'কিন্তু এরা তো সত্যিকার নারঙ্গ—গাছে-হওয়া !' এরেন্দিরা, চমকে গিয়ে, বললে।

'নিশ্চয়ই।' উলিসেস মুচকি হাসলে। 'এগুলো আমার বাবা ফলান।'

এরেন্দিরা তা বিশ্বাসই করতে পারছিলো না। সে তার চোখের ঢাকা সরিয়ে হিরেটা আঙুলে ধ'রে অবাক হ'য়ে সেটার দিকে তাকিয়ে রইলো।

'এ-রকম তিনটে হ'লেই আমরা সারা পৃথিবী ঘুরে আসতে পারবো,' বললে উলিসেস।

হতাশ তাকিয়ে এরেন্দিরা তাকে হিরেটা ফিরিয়ে দিলে। উলিসেস ব'লেই চললো :

'তাছাড়া আমার সঙ্গে একটা মাল-বওয়া ট্রাক আছে,' জানালে সে। 'আর তাছাড়া···গ্যাখো।'

জামার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে সে বার ক'রে আনলে একটা শাবেক আমলের পিস্তল।

'দশ বছরের আগে আমি কোথাও যেতে পারবো না,' বললে এরেন্দিরা।

'তুমি যাবে,' বললে উলিসেস। 'আজ রাতে, যখন ঐ শাদা তিমি ঘুমিয়ে পড়বে. আমি বাইরে থাকবো, প্যাঁচার মতো ডাক দেবো।'

সে এমন চমৎকার নকল ক'রে প্যাঁচার ডাক শোনালে যে ঠিক মনে হয় যেন সত্যি প্যাঁচার ডাক, আর তা শুনে এই প্রথম এরেন্দিরার চোখ দুটি মৃদু হাসলো।

'উনি আমার ঠাকুমা,' সে বললে।

'কে ? প্যাঁচা ?'

'না। তিমি।'

ভুলটায় দুজনেই হেসে উঠলো, কিন্তু এরেন্দিরা পরক্ষণেই কথার জের তুলে নিলে।

'তার ঠাকুমার অনুমতি বিনা কেউ কোথাও—কোনোখানেই—যেতে পারে না।'

'সে-কথাটা ওঁকে বলবার কোনো কারণ নেই।'

'সে উনি যে-ক'রেই হোক জেনে যাবেন,' বললে এরেন্দিরা। 'উনি সবকিছুই স্বপ্নে দেখতে পান।'

'যখন উনি স্বপ্ন দেখতে শুরু করবেন তুমি চ'লে যাচ্ছো, ততক্ষণে আমরা সীমান্ত পেরিয়ে যাবো। আমরা সীমান্ত পেরুবো চোরাচালানিদের মতো।'

সিনেমার তুখোড় বন্দুকবাজদের মতো আত্মবিশ্বাস নিয়ে পিস্তলটা বাগিয়ে, সে নকল ক'রে শোনালে গুলির আওয়াজ টিশুম-টিশুম, যাতে তার বেপরোয়া ভাব দেখে এরেন্দিরা তেতে ওঠে। এরেন্দিরা হ্যাঁও বললে না, নাও বললে না, তবে তার চোখ দুটো যেন দীর্ঘশ্বাস ফেললো। সে একটা চুমু খেয়ে উলিসেসকে বাইরে পাঠিয়ে দিলে। উলিসেস, একেবারে গ'লে গিয়ে, ফিশফিশ ক'রে বললে :

'কাল আমরা দেখতে পাবো জাহাজগুলো কেমন ক'রে জল কেটে চ'লে যায়।'

সে-রাত্তিরে, সন্ধে সাতটার একটু পরে, এরেন্দিরা তার ঠাকুমার চুল আঁচড়ে দিচ্ছিলো, যখন আবার তার দুর্ভাগ্যের হাওয়া শন-শন বইতে শুরু ক'রে দিলে। তাঁবুর আশ্রয়ে ছিলো ইণ্ডিয়ান বেহারারা আর সেই পেতলের বাজনাদার দলের সর্দার: মাইনের জন্যে অপেক্ষা করছিলো তারা। ঠাকুমা হাতের কাছে যে-বাক্সটা ছিলো তা থেকে নোটগুলো তুলে নিয়ে গোনা শেষ করলেন, তারপর হিশেবের জাবদা খাতাটা দেখে তিনি সবচেয়ে বুড়ো ইণ্ডিয়ানের পাওনা চুকিয়ে দিলেন।

'এই-যে, তোমার টাকা,' তিনি তাকে বললেন। 'কুড়ি পেসো হপ্তা—তা থেকে আট বাদ যাবে খোরাকি, তিন বাদ যাবে জলের জন্যে, পঞ্চাশ সেণ্ট কাটা যাবে নতুন জামার জন্যে, তার মানে সাড়ে-আট। নাও, গুনে নাও।'

বুড়ো ইণ্ডিয়ান টাকা গুনে নেবার পর তারা সবাই সেলাম ঠুকে বাইরে চ'লে গেলো।

'ধন্যবাদ, শাদা মেমসাব।'

তারপর এলো বাজনদারদের সর্দার। ঠাকুমা হিশেবের খাতা দেখলেন, ছবিওলার দিকে তাকালেন—সে তখন তার ক্যামেরার হাপর সারাবার চেষ্টা করছে দলা-দলা গাটাপার্চা দিয়ে।

'এই ব্যাপারটা কী হবে?' ঠাকুমা তাকে জিগেশ করলেন। 'বাজনার জন্যে তুমি সিকিভাগ দেবে, কি দেবে না?'

'ছবির মধ্যে তো কোনো গান আসে না।'

'কিন্তু গান বাজে ব'লেই লোকের ছবি তোলাতে ইচ্ছে করে,' ঠাকুমা উত্তর দিলেন।

'বরং উল্টো হয়,' ছবিরওলা বললে। 'গান তাদের মনে করিয়ে দেয় যারা মারা গেছে, আর তারপর তারা ছবিতে ফুটে ওঠে চোখ বোজা।'

বাজনদারদের সর্দার বাধা দিলে।

'তারা যে চোখ বোজে সে কিন্তু গানের জন্যে নয়,' সে বললে। 'রাত্তিরে ছবি তোলবার সময় তুমি যে বিজলির ঝিলিক বানাও তাতেই তাদের চোখ ধাঁধিয়ে যায়।'

ছবিওলা তবু জোর দিয়ে বললে: 'উঁহু, সে হয় গানের জন্যে।'

ঠাকুমা এই ঝগড়ার নিষ্পত্তি করলেন। 'মক্ষিচুষ হোয়ো না,' তিনি বললেন ছবিওলাকে, 'দ্যাখো, সেনাদোর ওনোসিমো সানচেসের জন্যে কী ভালোই না

চলেছে সবকিছু—চুটিয়ে ছবি তুলছো তুমি—আর সে তো তাঁর সঙ্গে বাজনদারের দল আছে ব'লেই।' তারপর, রুক্ষ স্বরে, তিনি শেষ করলেন :

'কাজেই যা তোমার দেয়া উচিত, মিটিয়ে দাও, আর নয়তো তোমার কপাল তোমারই—নিজের পথ নিজেই দেখে নাও। ঐ বাচ্চা মেয়েটা পুরো খাই-খরচার বোঝা শুধু একা নিজের কাঁধে তুলে নেবে, এ ঠিক নয়।'

'আমার কপাল আমিই বুঝবো,' ছবিওলা বললে। 'আমি তো আসলে একজন শিল্পী কিনা।'

ঠাকুমা অগত্যা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বাজনদারদের প্রাপ্য চুকিয়ে দিলেন। একতাড়া নোট তার হাতে তুলে দিয়ে তিনি তাঁর হিশেবের খাতার সঙ্গে মিলিয়ে নিলেন।

'দুশো চুয়ান্নটা গানের সুর,' তিনি তাকে বললেন। 'সুর পিছু পঞ্চাশ সেণ্ট ক'রে, তার সঙ্গে যোগ হবে রোববারে বত্রিশ আর ছুটির দিনে সুর পিছু ষাট সেণ্ট—একুনে একশো ছাপ্পান্ন পেসো কুড়ি সেণ্ট।'

বাজনদার কিছুতেই সে-টাকা নেবে না।

বললে, 'সব শুদ্ধ একশো বিরাশি পেসো চল্লিশ সেণ্ট হবে। ভাল্‌জের দাম আরো বেশি।'

'তা কেন হবে?'

'কারণ তাদের সুর আরো করুণ,' বাজনদার বললে।

ঠাকুমা তাকে টাকাটা নিতে বাধ্য করলেন।

'বেশ, এ-হপ্তায় তাহ'লে প্রতি ভাল্‌জের সঙ্গে দুটো ক'রে আহ্লাদের সুর বাজাবে—তাহ'লেই আমাদের শোধবোধ হ'য়ে যাবে।'

ঠাকুমার যুক্তি বাজনদারের মাথায় কিছুই ঢুকলো না, তবে মনে-মনে জটটা খোলবার চেষ্টা করতে-করতে সে অঙ্কটা মেনে নিলে। ঠিক সেই মুহূর্তে ভয়াল বাতাস তাঁবুটাকেই উপড়ে নেবার ভয় দেখালো, আর বাতাস তার পেছনে যে-স্তব্ধতা রেখে গেলো, তার মধ্যে বাইরে স্পষ্ট, করুণ, একটা প্যাঁচার ডাক শোনা গেলো।

সে যে ঘাবড়ে গেছে, এটা লুকোবার জন্যে এরেন্দিরা যে কী করবে তা ভেবেই পেলে না। সে টাকার বাক্সের ডালা বন্ধ ক'রে সেটা খাটুলির তলায় ঢুকিয়ে দিলে, কিন্তু তার হাতে চাবির গোছা তুলে দেবার সময় ঠাকুমা তার হাতের ভয়ের ভাষা ঠিক প'ড়ে ফেলেছিলেন। 'ভয় পাসনে,' তাকে তিনি বললেন। 'ঝড়ের রাতে প্যাঁচা ডাকে, সবসময়।' তবু সে যে আশ্বস্ত হয়েছে এমন কিন্তু বোঝা

গেলো না, বিশেষত সে যখন দেখলে যে ছবিওলা তার পিঠে ক্যামেরা চাপিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

'ইচ্ছে করলে তুমি কাল অব্দি সবুর করতে পারো,' ঠাকুমা বললেন ছবিওলাকে। 'আজ রাত্তিরে মরণ ছাড়া পেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

ছবিওলাও প্যাঁচার ডাক শুনেছিলো, কিন্তু তার জন্যে সে তার সিদ্ধান্ত পাল্টালে না।

'থেকে যাও, বাছা।' ঠাকুমা চাপ দিলেন। 'তোমাকে যে আমি পছন্দ ক'রে ফেলেছি, অন্তত তার খাতিরেও থেকে যাও।'

'আমি কিন্তু গানের জন্যে কানাকড়িও দেবো না,' ছবিওলা বললে।

'উঁহু, না,' ঠাকুমা বললেন। 'সে চলবে না।'

'তবেই দ্যাখো,' ছবিওলা বললে, 'কারু জন্যেই তোমার প্রাণে মায়া-দয়া নেই।'

রাগে ঠাকুমা কেমন ফ্যাকাশে হ'য়ে গেলেন।

'তাহ'লে, যা, ভাগ!' চ'টে উঠলেন ঠাকুমা। 'ভাগ, নিচুমন!'

এতটাই তিনি রেগে গিয়েছিলেন যে এরেন্দিরা যখন তাঁকে বিছানায় শোয়াতে নিয়ে গেলো তখনও তিনি ছবিওলার ওপর ঝাল ঝেড়ে চলেছেন। 'ডাইনি মায়ের বাচ্চা!' ঠাকুমা গজগজ করছিলেন। 'কার মনে কী আছে সে-কথা কী জানে বেজন্মাটা?' এরেন্দিরা তাঁর কথায় কোনো পাত্তাই দিলে না, কারণ হাওয়ার তোড় যেই একটু কমে অমনি প্যাঁচাটা জেদ ধ'রে একগুঁয়ের মতো ডাকে, আর সে-ডাক শুনে এরেন্দিরা যে কী করবে তা ভেবেই পায় না, আর কেবলই ছটফট করে। ঠাকুমা শেষ অব্দি বিছানায় শুলেন, পুরোনো প্রাসাদে শুতে যাবার আগে রোজ যে-পালা হ'তো তারই পুনরাবৃত্তি হ'লো, সেই একই রীতি, আর যখন তাঁর নাৎনি তাঁকে হাওয়া করলো আস্তে-আস্তে তাঁর রাগ প'ড়ে এলো, আর আবার তিনি তাঁর বন্ধ্যা শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে শুরু করলেন।

'তোকে সকাল-সকাল উঠতে হবে,' তখন তিনি বললেন, 'যাতে লোকজন আসার আগেই আমার স্নানের জন্যে লতাপাতা সেদ্ধ করতে পারিস।'

'সি, আবুয়েলা।'

'হাতে যা সময় থাকবে, তাতে তুই ইণ্ডিয়ানদের নোংরা কাপড়-চোপড় কেচে নিবি—তাহ'লে আসছে হপ্তায় ওদের মাইনে থেকে আরো টাকা কেটে নেয়া যাবে।'

'সি, আবুয়েলা।'

'আর উটপাখিটাকেও খেতে দিস।'

এরেন্দিরা বললে, 'সি, আবুয়েলা।'

হাতপাখাটা সে শিয়রের কাছে রেখে মৃতদের হাড়গোড়ে ভরা সিন্দুকের সামনে সে দুটো বড়ো পুজোর মোমবাতি জেলে দিলে। ঠাকুমা, এখন ঘুমের ঘোরে, তাঁর হুকুম দেবার ফর্দে পেছিয়ে পড়েছেন।

'আর আমাদিসদের জন্যে মোমবাতি জেলে দিতে ভুলিসনে।'

'সি, আবুয়েলা।'

তখনই এরেন্দিরা বুঝতে পারলে যে ঠাকুমা আর জাগবেন না, কারণ তিনি এতক্ষণে তাঁর প্রলাপ বকতে শুরু ক'রে দিয়েছেন। সে শুনতে পেলে তাঁবুটাকে ঘিরে হাওয়া গরগর করছে, কিন্তু তবু সে তখনও বুঝতে পারেনি যে এ তারই দুঃসময়ের হাওয়া। সে রাতের দিকে তাকিয়ে রইলো অনিমেষ যতক্ষণ-না আবার ডেকে উঠলো প্যাঁচা আর মুক্তির জন্যে তার যে-সহজাত অনুভূতি সেটাই শেষ-কালে তার ঠাকুমার কুহকের ওপর জিতে গেলো।

তাঁবু থেকে সে পাঁচ পা বেরিয়েছে কি বেরোয়নি সে ছবিওলার মুখোমুখি এসে পড়লো, ছবিওলা তখন তার সাইকেলের পিঠে তার সব জিনিশপত্তর চাপাচ্ছে। যেন দুজনে কোনো শলা করেছে গোপনে, এমনিভাবে তাকে দেখে হাসলো ছবিওলা, আর তখন সে একটু শান্ত হ'লো।

'আমি কিছুই জানি না,' ছবিওলা বললে। 'আমি কিছুই দেখিনি। আর আমি গানের জন্যেও কোনো পয়সা দেবো না।'

সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সে বিদায় নিলে। আর তখন এরেন্দিরা ছুটে গেলো মরুভূমিতে, চিরকালের মতো সে মনস্থির ক'রে ফেলেছে, একবারেই, আর যেখান থেকে প্যাঁচা ডাকছিলো, সেখানকার হাওয়ার ছায়ারা তাকে গিলে ফেললো।

সেবারে ঠাকুমা সঙ্গে-সঙ্গেই বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে হাজির। স্থানীয় দফতরের সিপাহসালার সকাল ছ-টার সময় লাফিয়ে নামলে তার দোলখাটিয়া থেকে যখন ঠাকুমা তার চোখের সামনে মেলে ধরলেন সেনাদোরের চিঠি। উলিসেসের বাবা দরজার কাছে অপেক্ষা করছিলেন।

'চিঠিতে কী লেখা আছে, তা আমি কোন জাহান্নাম থেকে জানবো?' সিপাহসালার চ্যাঁচালে। 'আমি পড়তেই পারি না।'

ঠাকুমা বললেন, 'এটা সেনাদোর ওনেসিমো সান্‌চেসের লেখা অনুমোদনপত্র।'

আর-কোনো প্রশ্ন না-তুলেই সিপাহশালার তার দোলখাটিয়ার পাশে যে-

রাইফেলটা প'ড়ে ছিলো সেটা তুলে নিলে আর গাঁক-গাঁক ক'রে তার লোকদের হুকুম দিতে শুরু করলে। পাঁচ মিনিট পরে তারা একটা পলটনের ট্রাকে চেপে সীমান্তের দিকে উড়ে চললো, এমনকী বিরুদ্ধ হাওয়াকে কেটেই, উল্‌টো দিক থেকে বওয়া যে-হাওয়া পলাতকদের সব চিহ্ন মুছে ফেলেছে। সিপাহসালার বসেছে সামনে, চালকের পাশের আসনে। পেছনে বসেছেন ওলন্দাজ আর ঠাকুমা, আর দু-ধারের পাদানিতে একজন ক'রে সশস্ত্র পুলিশ।

শহরের কাছে এসে তারা বর্ষাতি-ঢাকা ট্রাকের একটি বহর থামালে। পেছনে কয়েকজন লোক লুকিয়ে যাচ্ছিলো, তারা কেম্বিস কাপড়ের তেরপল তুলে ছোটো গাড়িটাকে তাগ ক'রে মেশিনগান আর ফৌজি রাইফেল উঁচিয়ে ধরলো। প্রথম ট্রাকের চালককে সিপাহসালার জিগেশ করলে পাখিবোঝাই একটা খামারের ট্রাক তারা কত পেছনে রেখে এসেছে।

উত্তর দেবার আগেই চালক গাড়ি ছাড়লো।

'আমরা গোয়েন্দা কবুতর নই,' ঘেন্নায় সে ঠোঁট বেঁকালে। 'আমরা চোরা-চালান করি।'

সিপাহসালার দেখতে পেলে মেশিনগানগুলোর কালিঝুলি মাখা নল তার চোখের পাশ দিয়ে চ'লে গেলো আর সে হাত তুলে আত্মসমর্পণ ক'রে মিটিমিটি হাসলে।

'অন্তত,' সে তাদের উদ্দেশে চ্যাচালে, 'তোমাদের এটুকু শোভনতাবোধ থাকা উচিত ছিলো যে প্রকাশ্য দিবালোকে এমন ক'রে যেতে নেই।'

শেষ ট্রাকের পেছনে, বাম্পারের গায়ে, লেখা : তো মা র ক থা ই আ মি ভা বি, এ রে ন্দি রা।

যত তারা উত্তরমুখো চলেছে হাওয়া ততই শুকনো খরখরে হ'য়ে উঠছে, আর হাওয়ার চাইতেও বেশি খেপে গিয়েছে রোদ্দুর। ঘেরা ট্রাকটার মধ্যে গরম আর ধুলোবালির জন্যে শ্বাস নেয়াও কঠিন।

ছবিওলাকে প্রথমে দেখতে পেলেন ঠাকুমাই : যেদিকটায় তাঁরা উড়ে যাচ্ছেন সেদিকটাতেই জোরে সাইকেল চালিয়ে ছবিওলা চলেছে। মাথায় শুধু একটা বান্দানা জড়ানো, তাছাড়া রোদ্দুর থেকে বাঁচবার আর-কোনো উপায়ই নেই তার।

'ঐ-যে, ও!' আঙুল তুলে দেখালেন ঠাকুমা। 'ঐ হতচ্ছাড়া নিচু জাতই ওদের লোক!'

পাদানির ওপরে দাঁড়িয়ে-থাকা সেপাইদের একজনকে সিপাহসালার বললে ছবিওলার দায়িত্ব নিতে।

'ওকে পাকড়ে নিয়ে এখানে আমাদের জন্যে অপেক্ষা কোরো,' সিপাহসালার বললে। 'আমরা এক্ষুনি ফিরে আসছি।'

সেপাই চলতি ট্রাকের পাদানি থেকে লাফিয়ে নেমে দু-দুবার চেঁচিয়ে থামতে বললে ছবিওলাকে। উলটো দিক থেকে হাওয়া বইছিলো ব'লে ছবিওলা তাকে শুনতে পায়নি। ট্রাক যখন তার পাশ দিয়ে চ'লে গেলো ঠাকুমা তার দিকে হেঁয়ালি-ভরা একটা ইশারা করলেন, কিন্তু সে সেটাকে ভুল ভাবলে সম্ভাষণ ব'লে, আর সে হেসে হাত নেড়ে তার জবাব দিলে। গুলির আওয়াজ সে শুনতে পায়নি। হাওয়ায় সে পৎপৎ উড়লো একবার, তারপর, মড়া, ধপ ক'রে পড়লো তার সাইকেলের ওপরেই, রাইফেলের গুলিতে ধড় থেকে মুণ্ডুটা উড়ে গিয়েছে: সে জানতেও পারেনি গুলিটা এসেছিলো কোত্থেকে।

দুপুরের আগেই তারা ছড়ানো পালক দেখলো এদিক-ওদিক। হাওয়ায় উড়ে আসছে তারা, কচি-কচি সব পাখির পালক। ওলন্দাজ তাদের দেখেই চিনতে পারলেন, কারণ এগুলো তাঁরই পাখির পালক, হাওয়া তাদের খাবলে-খুবলে উপড়েছে। চালক দিক পালটালে, প্যাডেলে পা চেপে সব তেল পাঠিয়ে দিলে এনজিনে, আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই তারা দিগন্তের কাছে দেখতে পেলে মাল-বওয়া ট্রাকটাকে।

পেছন দেখবার আয়নায় ফৌজি গাড়িটা আসছে দেখেই উলিসেস চেষ্টা করলে দুই গাড়ির মধ্যকার ব্যবধান বাড়িয়ে দিতে, কিন্তু তার এনজিনের এর চাইতে বেশি কোনো ক্ষমতা নেই। একফোঁটাও না-ঘুমিয়ে এতক্ষণ ধ'রে এসেছে তারা, অবসাদে তেষ্টায় তাদের প্রাণ যায় আর-কি। এরেন্দিরা, উলিসেসের কাঁধে মাথা রেখে ঢুলছিলো, হঠাৎ আঁৎকে জেগে উঠলো। সে দেখতে পেলে ট্রাকটা, সেটা এক্ষুনি তাদের নাগাল ধ'রে ফেলবে, আর সরল নিষ্পাপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় দস্তানার খুপরি থেকে এক হ্যাঁচকা টানে পিস্তলটা বার ক'রে নিয়ে এলো।

'এটা কোনো কাজের নয়,' বললে উলিসেস। 'এটা ছিলো সার ফ্রান্সিস ড্রেকের পিস্তল।'

এরেন্দিরা কয়েকবার পিস্তলটা ঠুকে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। হাওয়ায় পালক-ওপড়ানো পাখি বোঝাই লজ্‌ঝড় ট্রাকটাকে ফৌজি টহল পেরিয়ে গেলো, তারপর একটা তীক্ষ্ণ মোচড় মেরে ঘুরে গিয়ে তার রাস্তা আটকে দাঁড়ালো।

এ-রকম সময়েই আমার সঙ্গে তাদের পরিচয় হ'য়ে যায়, যেটা ছিলো তাদের সবচেয়ে জমকালো সময়; কিন্তু আমি হয়তো তাদের জীবনের খুঁটিনাটির দিকে তাকাতুমই না যদি-না অনেক বছর পরে রাফায়েল এস্কালোনা, একটা গানের মধ্যে, এই নাটকটির ভয়াবহ পরিসমাপ্তি উদ্‌ঘাটন ক'রে দিতেন, আর তখনই আমার মনে হ'লো এই কাহনটা ফাঁদা বোধহয় ভালো হবে। তখন আমি রিওআচা প্রদেশে বিশ্বকোষ আর ডাক্তারি বই ফিরি ক'রে বেড়াতুম। আলভারো সেপেদা সামুদিও, সেও তখন ঐ এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলো, বিয়ার ঠাণ্ডা রাখার যন্ত্রপাতি বেচতে; আর সে আমাকে তার ট্রাকে ক'রে মরুভূমির শহরগুলোয় নিয়ে যেতো, উদ্দেশ্য আমার সঙ্গে কোনোকিছু নিয়ে কথা বলে, কিন্তু আমরা এতই বকবক করেছি—সব বিষয়ে এবং কোনো বিশেষ বিষয়েই নয়—আর এত বিয়ার গিলেছি যে আমরা টেরই পাইনি কখন কিংবা কোথায় আমরা পুরো মরুভূমিটা পেরিয়ে একেবারে সীমান্তে পৌঁছে গিয়েছি। আর দেখি, ঐ-তো ভ্রাম্যমাণ প্রণয়ের শিবির, তাঁবুর কেম্বিস কাপড়ের গায়ে এই বয়ান লেখা: এরেন্দিরা—সবার সেরা; এখন কাটো, আবার এসো পরে—ঐ অধীরা এরেন্দিরা তোমার তরে সবুর করে; কী অর্থ হয় জীবনে—এরেন্দিরা বিহনে? অন্তহীন ঢেউ-খেলানো সার চ'লে গেছে, কত জাতির কত-যে লোক, সমাজের কত স্তরের পুরুষ, সারটাকে দেখাচ্ছে কোনো সাপের মতো যার মেরুদণ্ডটা মানুষের, ফাঁকা সব জমি আর স্কোয়ারে ঢুলছে, রং-বাহারি সব হাটে-বাজারে কোলাহলে শোরেগোলে, সেই শহরের সমস্ত রাস্তা থেকে বেরিয়ে আসছে কাতারে-কাতারে লোক, পিলপিল পিলপিল, সেই শহর দিয়ে যাচ্ছে কত-যে ব্যাবসাদার আর তাদের হৈ-হট্টগোল। সব রাস্তাতেই খোলাখুলি জুয়োর আড্ডা, প্রত্যেক বাড়িই শুঁড়িখানা, প্রত্যেক দুয়ারই ফেরারিদের আশ্রয়। কত-যে মানে-বোঝা-যায়-না গান, কত-যে ফিরিওলার বেসাতি নিয়ে হাঁকাহাঁকি, সেই ঘোরজাগানো দুঃস্বপ্ন-দেখানো জলন্ত উত্তাপের মধ্যে সবকিছু মিলে তৈরি ক'রে দিচ্ছে আতঙ্কের একটাই হাহাকার।

সেইসব লোক যাদের নিজের দেশ ব'লে কিছু নেই, সব ফেরেব্বাজ জোচ্চোর বাঁটপাড়ের মেলায় ছিলো সাধু ব্লাকামান, টেবিলের ওপর সটান দাঁড়ানো, জিগেশ করছে কারু কাছে সত্যিকার কোনো সাপ আছে কি না, সাপের বিষের যে-প্রতিষেধক সে আবিষ্কার করেছে নিজের শরীরেই যাতে সেটা পরখ ক'রে দেখাতে পারে। ছিলো এক মেয়ে, যে বদলে গিয়েছিলো মাকড়শায়, শুধু তার মা-বাবার

কথা শোনেনি ব'লেই, পঞ্চাশ সেণ্ট দিলে যে তাকে ছুঁয়ে দেখতে দেয় লোককে, লোকে যাতে বুঝতে পারে এর মধ্যে কোনো জোচ্চুরি নেই, আর যারাই তার এই দুর্দশা নিয়ে প্রশ্ন করতে চায় তাদেরও সে নাকি সব কথার জবাব দেবে। চিরজীবনের মধ্য থেকে এক দূত এসে হাজির, যে ঘোষণা করলে ভয়াল ভয়ংকর ভুতুড়ে বাদুড়ের অত্যাসন্ন আগমনবার্তা, যার জ্বলন্ত গন্ধক আর ঝামায় ভরা নিশ্বাস উলটে দেবে প্রকৃতির সব নিয়মকানুন আর সমুদ্রের সব রহস্যকে যে অতল থেকে নিয়ে আসবে জলের ওপর।

একটাই বিশ্রামে ভরা গুপ্ত 'পশ্চাদ্দেশ' ছিলো শহরের, সেটা লাল আলোর পতিতাপল্লি, শহুরে শোরগোলের শুধু ফুলকিরাই যেখানে গিয়ে পৌঁছোয়। সিন্ধু-গোলাপের চৌকোণ থেকে-আসা স্ত্রীলোকেরা পরিত্যক্ত ক্যাবারের একঘেয়েমিতে শুধু হাই তোলে। তারা ব'সে-ব'সেই ঘুমোয় তাদের সিয়েস্তা, যে-সব লোক তাদের কামনা করেছে অজাগর থেকেছে তাদের কাছে, আর কড়িকাঠ থেকে যে-পাখা ঝোলে তার তলায় তারা অপেক্ষা ক'রে থাকে ভুতুড়ে বাদুড়ের আবির্ভাবের জন্যে। হঠাৎ তাদের মধ্য থেকে একজন উঠে পড়লো, গেলো একটা অলিন্দে, যেখানে হাঁড়ি-পাতিলে ফুল ফুটে তাকিয়ে আছে নিচে রাস্তার দিকে। নিচে ঐখান দিয়ে এরেন্দিরার অনুরক্তরা চলেছে পিলপিল পিলপিল।

'এসো-এসো,' মেয়েটি চেঁচিয়ে বললে তাদের, 'ওর এমন কী-জিনিশ আছে যা আমাদের নেই?'

'সেনাদোরের কাছ থেকে এক চিঠি,' কেউ-একজন চেঁচিয়ে সাড়া দিলে।

শোরগোল আর হাসির হররা শুনে অন্য মেয়েরা এসে দাঁড়ালে অলিন্দে।

'দিনের পর দিন ধ'রে সারটা এ-রকমই চলেছে,' তাদের একজন বললে, 'শুধু ভাবো পঞ্চাশ পেসো ক'রে এক্কেকজনা।'

প্রথমে যে এসেছিলো, সে মনস্থির ক'রে নিলে :

'বেশ, আমি গিয়ে দেখবো ঐ সাত মাসের বাচ্চার কাছে কোন রতন আছে।'

আমিও যাবো,' আরেকজন বললে, 'ব'সে-ব'সে চৌকিগুলো বিনিপয়সায় গরম করার চাইতে তা ভালো হবে।'

যাবার পথে অন্য অনেকেই তাদের সঙ্গে যোগ দিলে, আর যখন তারা গিয়ে এরেন্দিরার তাঁবুতে পৌঁছুলো, ততক্ষণে তারা একটা হল্লাগোল্লা মিছিল বানিয়ে ফেলেছে। কাউকে কিছু না-ব'লেই তারা ভেতরে ঢুকে পড়লো, বালিশ তুলে ছুঁড়ে মারলো যে-লোকটাকে তারা দেখতে পেলে, দেখতে পেলে সে তার টাকা

কীভাবে খরচ করছে, তারপর তারা তুলে নিলে এরেন্দিরার খাটিয়াটা আর একটা খাটুলির মতো ধরাধরি ক'রে সেটা নিয়ে এলো রাস্তায়।

'এ যে দেখি ঘোর দৌরাত্ম্য!' ঠাকুমা একেবারে ফেটে পড়লেন। 'বেইমানের ঝাঁক! দস্যুর দঙ্গল!' আর তারপর সার বেঁধে দাঁড়ানো লোকদের দিকে ফিরে চ্যাঁচালেন: 'আর তোরা, বলি ওরে মরদ-দেখতে মাগির দল, কোথায় তোদের বিচিগুলো, একটা অসহায় শিশুর ওপর এমন হামলা দেখে তোদের লজ্জা হয় না! জাহান্নামের সব চুতিয়া, যত রাজ্যের কটাই-মজুর!'

ঠাকুমা গলা ছেড়ে চ্যাঁচাতেই থাকেন, যদ্দুর যাঁর গলা যায় তদ্দুর, যাকেই কাছে পান ধমাশ ক'রে তাকেই কষান তাঁর দোর্দণ্ডের বাড়ি, কিন্তু ভিড়ের চেল্লা-চিল্লিতে আর রগড়ের সিঁটিতে তাঁর কোনো ফোঁস-ফোঁস রোষই শোনা যাচ্ছিলো না।

এই মস্করা-রগড় থেকে এরেন্দিরা যে পালাতে পারেনি তার কারণ যখন সে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলো সেদিন থেকেই খাটিয়ার একটা তক্তার ফালির সঙ্গে ঠাকুমা তাকে কুকুর-বাঁধার শেকল দিয়ে বেঁধে রেখেছিলেন। তবে তারা তার কোনো ক্ষতি করলে না। তারা তাকে শুধু প্রদর্শন করলে চাঁদোয়ালাগানো একটা বেদিতে, হট্টগোলে ভরা শহরের সবচেয়ে ব্যস্ত রাস্তায়, যেন শেকলে-বাঁধা অনু-তাপিনীর রূপকেরই একটা স্তবক, আর শেষটায়, গির্জেয় যে-মঞ্চের ওপর কফিন রাখে তেমনি একটা মঞ্চে, শহরের ঠিক মাঝখানে, প্রধান স্কোয়ারটায়, তারা তাকে শুইয়ে রাখলে। এরেন্দিরা একেবারে কুণ্ডলী পাকিয়ে গিয়েছিলো, তার মুখ লুকিয়ে; কিন্তু কাঁদেনি; আর এইভাবেই সে প'ড়ে রইলো স্কোয়ারে, লজ্জায়-ধিক্কারে-রোষে ছিঁড়ে-যাওয়া, ভয়াল সূর্যের তলায় তার অলুক্ষুণে নিয়তির সঙ্গে কুকুর-বাঁধার শেকল দিয়ে বাঁধা—যতক্ষণ-না একজন অন্তত এতটা দয়া করলে যে তাকে একটা জামা দিয়ে ঢেকে দিলে।

সেই একবারই আমি তাদের দেখেছি, তবে পরে আমি জেনেছি যে তারা ঐ সীমান্ত শহরেই থেকে গিয়েছিলো, পৌর সেপাইদের সুরক্ষায়, যতক্ষণ-না ঠাকুমার সিন্দুকগুলো টাকায়-পয়সায় প্রায় ফেটেই পড়ে; আর শুধু তখনই তারা ছেড়ে আসে মরুভূমি, আর ধাওয়া করে সমুদ্রের দিকে। গরিবগুরবোদের মধ্য থেকে এত ধনসম্পদ জড়ো করতে এর আগে কাউকে কখনও দেখা যায়নি। বলদে-টানা গাড়ির একটা মিছিল ছিলো, যার ওপর প্রাসাদের সর্বনাশের পর উদ্ধার-করা টুকিটাকি এটা-ওটার শস্তা নকল বোঝাই ক'রে চাপানো, শুধু রাজকীয় আবক্ষ-মূর্তি বা দুর্লভ সব ঘড়িই নয়, সেই সঙ্গে ছিলো হাতফেরতা এক পিয়ানো, হাতল-

ঘোরানো একটা ভিকট্রোলা আর পিছুটান-জাগানো সব গানের রেকর্ড। ইণ্ডিয়ান-দের একটা দল দেখাশোনা করে মালপত্রের, আর বাজনদারদের একটা দল গ্রামে-গ্রামে ঘোষণা করে তাদের বিজয় আবির্ভাব।

কাগজের ফুলের মালায় সাজানো একটা খাটুলিতে ক'রে যেতেন ঠাকুমা, তাঁর বটুয়া থেকে মুঠো-মুঠো দানা নিয়ে চিবোতে-চিবোতে, গির্জের একটা চাঁদোয়ার ছায়ায়। তাঁর প্রকাণ্ড গতর প্রকাণ্ডতর হয়েছে এখন, কারণ তাঁর ব্লাউসের তলায় এখন তিনি নৌকোর পাল বানাবার কাপড়ে তৈরি একটা গেঞ্জি পরেন, তার মধ্যে তিনি রাখেন সোনার চাক্তিগুলো, যেমনভাবে লোকে ছোটো-ছোটো খোপওলা বান্দোলিয়ায় কার্তুজ রাখে। এরেন্দিরা থাকতো তাঁর পাশে, রংচঙে পোশাকে সাজা, ঝুমকো গয়নাগুলো ঝুলছে গা থেকে, কিন্তু কুকুর-বাঁধার শেকল এখনও তার হাঁটুতে বাঁধা।

'নালিশ করার কোনোই কারণ নেই তোর,' সীমান্ত শহর ছেড়ে আসবার সময় তার ঠাকুমা তাকে বলেছিলেন। 'রানীর মতো পোশাক-আশাক, বিলাসবৈভবে ভরা একটা বিছানা, একেবারে তোরই নিজস্ব এক রোশনচৌকি, আর সেবার জন্যে খাড়া চোদ্দ-চোদ্দজন ইণ্ডিয়ান। তোর কি তা চমৎকার ব'লে মনে হয় না?'

'সি, আবুয়েলা।'

'যখন তোর জন্যে আর আমি থাকবো না,' ঠাকুমা ব'লেই চলেছিলেন, 'তোকে আর তখন পুরুষের দয়ার ওপর নির্ভর ক'রে কাটাতে হবে না, কারণ তখন কোনো পেল্লায় শহরে তোর নিজের বাড়ি থাকবে। তুই থাকবি স্বাধীন, সুখী।'

এটা অবশ্য ভবিষ্যতের একটা সম্পূর্ণ নতুন আর অদৃষ্টপূর্ব ছবি। অন্যদিকে, তিনি আর এখন মূল দেনার কথাটা তোলেনই না: সে-দেনার খুঁটিনাটিগুলো এখন বেঁকেচুরে জট পাকিয়ে গেছে, ব্যাবসার খরচ যত জটিল হয়েছে তার কিস্তিগুলোও ততই বেড়েছে। তবু এরেন্দিরা ভুলেও কোনো দীর্ঘশ্বাস পড়তে দেয় না, সেটা হয়তো কাউকে এক ঝলক দেখাতে পারতো তার মনের মধ্যে কোন ভাবনারা পাক খাচ্ছে। হ্রদের ধারের শহরগুলোর বোধহীন অসাড়তায়, ধাতুর পাতের গুঁড়োয় ভরা খনির চান্দ্র সব জালামুখে, নীরবেই সে শোরার খনিতে বিছানার অত্যাচারের কাছে আত্মসমর্পণ করে; আর সারাক্ষণ তখন ঠাকুমা তার কাছে গেয়ে শোনান ভবিষ্যতের ছবি, যেন তিনি তাশ প'ড়ে-প'ড়ে তার ভবিষ্যৎ ব'লে দিচ্ছেন। একদিন বিকেলে, তারা যখন বুকে-চেপে-বসা একটা বাররানকা থেকে

বেরিয়ে এসেছে, তারা লক্ষ করলে সুপ্রাচীন লরেলের এক বাতাস আর তারা শুনতে পেলে হ্যাঁচকা ছেঁড়া-ছেঁড়া জ্যামেকার ভাষার কথাবার্তা আর অনুভব করলে বেঁচে-থাকার একটা আকৃতি, আর বুকের মধ্যে কেমন যেন একটা গেরো বেঁধে গেলো। তারা সমুদ্রে পৌঁছেছে।

'এই-যে সমুদ্র,' অর্ধেক জীবন নির্বাসনে কাটাবার পর ক্যারিবিয়নের কাচের মতো আলোয় শ্বাস টেনে ঠাকুমা বললেন : 'তোর ভালো লাগছে না এখানে?'

'সি, আবুয়েলা।'

সেখানেই তারা তাঁবু গাড়লে। ঠাকুমা রাতটা কাটালেন অনর্গল কথা ব'লে, স্বপ্ন না-দেখেই, আর মাঝে-মাঝেই তিনি গুলিয়ে ফেললেন তাঁর পিছুটান আর ভবিষ্যতের দিকে তাকাবার প্রাঞ্জল দৃষ্টি। সচরাচর যখন শুতে যান তার চেয়েও পরে শুতে গেলেন, আর জেগে উঠলেন সমুদ্রের শব্দে, মেজাজ শরীফ, চাপ উধাও। তা সত্ত্বেও, এরেন্দিরা যখন তাঁকে স্নান করাচ্ছে তিনি আবার ভবিষ্যৎবাণী করলেন, আর এটা হ'লো এমনই এক জরাতুর অলোকদৃষ্টি যে মনে হ'লো এটা যেন তাঁর রাতপাহারার প্রলাপবিকার।

'সম্ভ্রান্ত এক মহিলা হ'য়ে উঠবি তুই,' ঠাকুমা বললেন নাৎনিকে। 'সেনিওরা, অশেষ গুণের আধার, তোর অধীনে তোর তাঁবে যারা থাকবে তারা সসম্ভ্রমে শ্রদ্ধা করবে তোকে, আর কর্তৃপক্ষের একেবারে ওপরমহলের লোক তোকে সম্মান করবে, খাতির করবে। জাহাজের কাপ্তেনরা তোকে জগতের সব বন্দর থেকে ছবি-ছাপা পোস্টকার্ড পাঠাবে।'

এরেন্দিরা তাঁর কথা শুনছিলোই না। বাইরে থেকে বসানো এক নলের মধ্য দিয়ে ওষধি লতাপাতায় সুগন্ধি উষ্ণ জল গলগল ক'রে ঢুকছে স্নানের গামলায়। এরেন্দিরা সে-জল একটা লাউয়ের খোলে তুলে নিয়ে—অভেদ্য, এমনকী যেন শ্বাসও নিচ্ছে না—একহাতে তা ঠাকুমার ওপর ঢালছে আর অন্যহাত দিয়ে তাঁর গায়ে সাবান মাখাচ্ছে।

'তোর বাড়ির নামডাক মুখে-মুখে উড়ে বেড়াবে, আন্তিইয়ের সুতোর মালার মতো দ্বীপ থেকে ওলন্দাজ দেশের সীমা অব্দি,' ঠাকুমা ব'লেই চলেছেন। 'আর তোর বাড়ি রাষ্ট্রপতি-ভবনের চাইতেও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হ'য়ে উঠবে, কারণ সরকারের সব নীতি-টিতি ওখানেই আলোচনা হবে, আর ওখানেই নির্ধারিত হবে দেশের ভবিতব্য।'

আচমকা নলের মধ্যে জলের তোড় থেমে গেলো। কী হচ্ছে দেখতে এরেন্দিরা

তাঁবু থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো, আর দেখতে পেলো যে-ইণ্ডিয়ানের ওপর জল ঢালবার ভার ছিলো সে রসুইঘরের পাশে কাঠ কাটছে।

'সব জল বেরিয়ে গেছে,' ইণ্ডিয়ানটি বললে। 'আমাদের আরো-কিছু জল ঠাণ্ডা করতে হবে।'

এরেন্দিরা উনুনের কাছে গিয়ে দেখতে পেলে আরো-একটা মস্ত ডেকচিতে সুগন্ধি ওষধি মেশানো জল টগবগ টগবগ ফুটছে। সে তার হাত জড়িয়ে নিলে কাপড়ে আর দেখতে পেলে ইণ্ডিয়ানটির সাহায্য ছাড়াই সে ডেকচিটাকে তুলতে পারে।

সে ইণ্ডিয়ানটিকে বললে, 'তুমি যেতে পারো। আমি নিজেই জল ঢেলে দেবো।'

ইণ্ডিয়ানটি রসুইঘর থেকে বেরিয়ে-যাওয়া অব্দি সে অপেক্ষা করলে। তারপর সে ঐ টগবগে জল তুলে নিলে উনুন থেকে, প্রচণ্ড চেষ্টা ক'রে ডেকচিটা তুললো নলের মুখ অব্দি, আর যেই সে সেই মারণজল নলের মুখে ঢালতে যাবে যাতে সেটা তক্ষুনি স্নানের গামলায় চ'লে যায় এমন সময় ঠাকুমা তাঁবুর মধ্য থেকে হেঁকে উঠলেন :

'এরেন্দিরা!'

মনে হ'লো তিনি যেন সব দেখে ফেলেছেন। নাৎনি, হাঁক শুনে ভয় পেয়ে, শেষ মুহূর্তে অনুশোচনায় ভ'রে গেলো।

'আসছি, আবুয়েলা,' সে বললে। 'আমি জল ঠাণ্ডা করছি।'

সে-রাত্তিরে সে শুয়ে-শুয়ে অনেক রাত অব্দি ভাবলে—আর ওপাশে সেই সোনার গেঞ্জি গায়ে ঠাকুমা ঘুমের ঘোরে তাঁর গান গেয়েই চললেন। নিজের বিছানা থেকে এরেন্দিরা তীব্র চোখে তাকালে, ছায়ার মধ্যে তার চোখ দুটিকে দেখালো যেন কোনো বিড়ালির চোখ। তারপর, যেন কেউ জলের তলায় ডুবে গিয়েছে এমনভাবে সে ফিরে গেলো নিজের বিছানায়, বুকের ওপর তার হাত দুটি, চোখ দুটি ডাগর খোলা, আর সে তার যত জোর আছে সব দিয়ে মনে-মনে চেঁচিয়ে ডাকলে :

'উলিসেস!'

আচমকা নারঙ্গবিতানের বাড়িতে ধড়মড় ক'রে উঠে বসলো উলিসেস। এরেন্দিরার গলা সে এতই স্পষ্ট শুনতে পেয়েছে যে ঘরের ছায়ায় তার চোখ এরেন্দিরাকে খুঁজে-খুঁজে বেড়ালো। এক ঝলক ভেবে নিয়ে, সে তার জুতো জামা-কাপড় একটা পুঁটুলিতে বেঁধে শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। সে যখন পাতিও পেরিয়ে গিয়েছে তখন তার বাবার গলা তাকে চমকে দিলে :

'কোথায় যাচ্ছিস তুই ?'

চাঁদের আলোয় উলিসেস তাঁকে দেখলো নীল।

'পৃথিবীতে,' সে উত্তর দিলে।

'এবার আর আমি তোকে বাধা দেবো না,' ওলন্দাজ বললেন। 'তবে একটা বিষয়ে আমি তোকে হুঁশিয়ার ক'রে দিচ্ছি : তুই যেখানেই যাবি তোর বাবার অভিশাপও যাবে তোর পেছন-পেছন।'

'তা-ই হোক তবে,' বললে উলিসেস।

একটু অবাক, এমনকী ছেলের প্রতিজ্ঞা দেখে একটু গর্বিতও, ওলন্দাজ তার পেছন-পেছন এলেন নারঙ্গকুঞ্জের মধ্যে দিয়ে, আস্তে-আস্তে তাঁর চোখে ফুটে উঠেছে মৃদু হাসি। তাঁর স্ত্রী তাঁর পেছনেই ছিলেন, ইণ্ডিয়ান স্ত্রীলোকরা যেমন দাঁড়ায় তেমনি অপরূপভাবে। যখন উলিসেস ফটক বন্ধ ক'রে দিলে, ওলন্দাজ কথা বললেন :

'ও ফিরে আসবে,' বললেন তিনি, 'জীবনের মার খেয়ে ও ফিরে আসবে — তুমি যা ভাবছো তার চেয়েও তাড়াতাড়ি।'

'তুমি একটা গাড়ল,' উলিসেসের মা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, 'ও আর কোনোদিনই ফিরে আসবে না।'

সেবারে উলিসেসকে কাউকেই জিগেশ করতে হয়নি যে এরেন্দিরা কোথায়। একটা চলতি ট্রাকে লুকিয়ে চেপে উঠে সে পেরিয়ে এলো মরুভূমি, খাওয়া-দাওয়ার জন্যে চুরি করলে সে, অনেকবারই চুরি করলে নিছক ঝুঁকি নেবার বিশুদ্ধ মজা আর উত্তেজনাটা পাবে ব'লে, আর চলতেই থাকলো যতক্ষণ-না সে সমুদ্রতীরে আরেকটা শহরে খুঁজে পেলে তাঁবুটা, সে-শহরের কাচের বাড়িগুলো একটা আলোয় সাজা শহরের রূপ নিয়েছিলো, যেখানে ডুকরে-ডুকরে ওঠে আরুবা দ্বীপের উদ্দেশে বেরিয়ে-পড়া নোঙর-তোলা জাহাজগুলোর নৈশ ভোঁ। খাটিয়ার তক্তার সঙ্গে শেকল দিয়ে বাঁধা, এরেন্দিরা ঘুমিয়ে ছিলো, সেই একই ভঙ্গিতে, যেমন বেলাভূমিতে পাওয়া যায় জলে-ডোবা কোনো লোকের মৃতদেহ, যে-ভঙ্গিতে শুয়ে থেকে সে ডেকে পাঠিয়েছিলো উলিসেসকে ; অনেকক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে, তাকে না-জাগিয়ে, তার দিকে তাকিয়ে রইলো উলিসেস, কিন্তু সে তার দিকে এমন তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলো যে এরেন্দিরা জেগে গেলো। তারপর তারা চুমু খেলে অন্ধকারে, আস্তে সোহাগ করলে পরস্পরকে, ক্লান্তভাবে পোশাক খুললো এক-এক ক'রে, আর নীরব মমতায় আর গোপন সুখে মগ্ন হ'লো রতি ও আরতিতে, যেটা ছিলো প্রণয়ের চেয়েও বেশি-কিছু।

তাঁবুর অন্য কোণায় ঠাকুমা একটা প্রকাণ্ড পাশ ফিরলেন আর প্রলাপ বকতে শুরু করলেন।

'গ্রীক জাহাজ এসে যখন পৌঁছেছিলো, এটা তখনকার কথা,' বললেন ঠাকুমা। 'খালাশিরা সব বদ্ধ পাগল—অথচ তারা মেয়েদের সুখে ভরিয়ে দিতো, কিন্তু পয়সার বদলে তাদের দিতো জলের জীব, স্পঞ্জ, জ্যান্ত-সব স্পঞ্জ, যেগুলো পরে বাড়িঘরে হেঁটে বেড়াতো হাসপাতালের রোগীদের মতো উহু-উহু কাৎরে আর যাতে তারা লোনা জলে পিপাসা মেটাতে পারে সেইজন্যে কাঁদিয়ে দিতো বাচ্চাদের।'

পাতালের একটা নড়াচড়ার ভঙ্গি ক'রে তিনি ধড়মড় ক'রে বিছানায় উঠে বসলেন।

'সেই সময়েই সে এসে পৌঁছেছিলো, আমার দেবতা,' তিনি গাঁক-গাঁক করলেন, 'আরো বলিষ্ঠ, আরো দীর্ঘাকৃতি, আমাদিসের চাইতেও আরো-অনেকবেশি পুরুষ।'

উলিসেস—সে এর আগে এই প্রলাপের দিকে কখনোই মন দেয়নি—ঠাকুমাকে বিছানায় উঠে বসতে দেখে লুকিয়ে পড়বার চেষ্টা করলে। কিন্তু এরেন্দিরা তাকে শান্ত করলে।

তাকে বললে : 'ভয় পেয়ো না। যখনই উনি কাহনের এই জায়গায় এসে পড়েন তখনই উনি ধড়মড় ক'রে উঠে বসেন বিছানায়—কিন্তু উনি জাগেন না।'

উলিসেস তার কাঁধে হেলান দিলে।

'সে-রাত্তিরে আমি খালাশিদের সঙ্গে গান গাইছিলাম আর প্রথমে ভেবেছিলাম এ বুঝি কোনো ভূমিকম্প,' ঠাকুমা তোড়ে ব'লে চললেন। 'ওরাও সবাই নিশ্চয়ই তা-ই ভেবেছিলো কারণ তারা, হেসে খুন, চেঁচিয়ে-মেচিয়ে ছুটে পালিয়ে সারা, আর শুধু সে-ই ছিলো সেই তারার গানের চাঁদোয়ার তলায়। যেন কালকের ঘটনা, এমনিভাবে সব মনে পড়ে আমার, তখন সকলেই যে-গান গাইতো সেই গানই গাইছিলাম আমি। এমনকী উঠোনের তোতাগুলো অব্দি সেই গান গাইতো।'

মাদুরের মতো চ্যাপটা, যেমন লোকে শুধু স্বপ্নেই গায়, তিনি গেয়ে উঠলেন তাঁর তিক্ততার গান :

> দাও হে, প্রভু, দাও, ফিরিয়ে দাও ফের
> আমার নিষ্পাপ যা ছিলো, সব—
> যাতে আবার আমি তার সোহাগসুখই
> প্রথম থেকে করি পুনরুদ্ভব।

শুধু তখনই উলিসেস ঠাকুমার পিছুটানে আগ্রহ আর কৌতূহল বোধ করলে।

'ঐ তো ওখানে ছিলো সে,' ঠাকুমা ব'লেই চলছিলেন, 'কাঁধে একটা ম্যাকাও, লম্বা ল্যাজের টিয়া, আর মানুষখেকো-মারা গাদাবন্দুক, ঠিক যেভাবে ওয়াতাররাল এসে পৌঁছেছিলো গিয়ানায়, আর যখন সে এসে আমার সামনে দাঁড়ালে আমি তার মারণনিশ্বাস গায়ে পেলাম, সে বললে : "হাজার বার আমি সারা জগৎ চক্কর দিয়েছি, সব দেশের মেয়েই চেখে দেখেছি আমি, কাজেই বিষয়টা ভালো জানি ব'লেই আমি তোমায় বলতে পারি, তুমি তাদের মধ্যে সবচেয়ে গরবিনী, সবচেয়ে কৃপাময়ী, পৃথিবীর সবচেয়ে রূপসী মেয়ে।"

আবার শুয়ে পড়লেন ঠাকুমা, বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। উলিসেস আর এরেন্দিরা অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইলো, প্রকাণ্ড ঘুমন্ত বৃদ্ধার বড়ো-বড়ো শ্বাসপ্রশ্বাসের ছায়ার মধ্যে দোল খেতে-খেতে। হঠাৎ এরেন্দিরা, তার গলায় একটুও কাঁপন নেই, বললে :

'ওঁকে খুন করতে তোমার সাহস হবে?'

আচমকা প্রশ্নটা শুনে উলিসেস ঠিক বুঝে উঠতে পারলে না কী উত্তর দেবে।

'কে জানে,' সে বললে। 'তোমার সাহস হয়?'

'আমি পারিনি,' এরেন্দিরা বললে, 'উনি আমার ঠাকুমা।'

তখন উলিসেস আবার সেই প্রকাণ্ড ঘুমন্ত দেহটার দিকে তাকালে, যেন মনে-মনে খতিয়ে নিচ্ছে জীবনের কী তেজ আছে তাঁর এখনও, তারপর মনস্থির ক'রে বললে :

'তোমার জন্যে আমি সবকিছু করতে পারি।'

...

পাঁচশো গ্রাম ইঁদুরমারা বিষ কিনে আনলে উলিসেস ; জামরুলের মোরব্বা আর ফেনানো ক্ষীরের সঙ্গে তা খুব ক'রে ঘেঁটে মিশিয়ে সেই ক্ষীর সে একটা পিঠের মধ্যে ঢেলে দিলে—তা থেকে সে আগেই ভেতরের পুরটা চেঁছে সরিয়ে দিয়েছিলো। তারপর সে ওপরে রাখলে আরো-এক পল্লা ঘন ক্ষীর, চামচে বুলিয়ে-বুলিয়ে সেটা এমন মসৃণ ক'রে ফেললে যে এই পৈশাচিক কৃৎকলাপের কোনো চিহ্নই আর রইলো না, আর ফাঁদটা সে সম্পূর্ণ করলে তার ওপর বাহাত্তরটা খুদে-খুদে গোলাপি মোমবাতি বসিয়ে।

ঠাকুমা তাঁর সিংহাসনে ব'সে দোর্দণ্ডটা ভয়দেখানোভাবে শূন্যে তুলে নাড়ছিলেন, এমন সময় দেখতে পেলেন তারা তাঁর জন্মদিনের কেকটা নিয়ে তাঁবুর মধ্যে এসে ঢুকছে।

'ওরে বেহায়া শয়তান!' তেড়ে উঠলেন ঠাকুমা। 'তোর কী সাহস যে তুই এখানে পা দিস!'

উলিসেস তার দেবদূত মুখের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো।

'আমি ক্ষমা ভিক্ষা করতে এসেছি,' সে বললে, 'আজকের এই দিনে, আপনার এই জন্মদিনে।'

এই ডাহা মিথ্যাটায় নিরস্ত্র হ'য়ে—কেননা কথাটা লক্ষ্যভেদ করেছিলো—ঠাকুমা টেবিলটা এমনভাবে সাজাতে বললেন যেন এটা কোনো বিয়ের ভোজ। উলিসেসকে তিনি তাঁর ডান পাশে বসালেন, আর এরেন্দিরা তাদের পাতে খাবার পরিবেষণ করলে, আর এক বিধ্বংসী ফুঁয়ে একসঙ্গে সব মোমবাতি নিভিয়ে দিয়ে, কেকটা তিনি দুই সমান অংশে কেটে ভাগ করলেন, আর একটা টুকরো দিলেন উলিসেসকে।

'যে-পুরুষ জানে কেমন ক'রে ক্ষমা পেতে হয় সে তো অর্ধেক স্বর্গ জিতেই ফেলেছে,' ঠাকুমার বাণী। 'তোমাকেই আমি প্রথম টুকরোটা দিলাম—সেটাই আসলে পরম সুখের ডাক।'

'আমার মিষ্টি ভালো লাগে না,' উলিসেস বললে, 'আপনিই খান।'

ঠাকুমা এরেন্দিরাকেও কেকের একটা টুকরো দিতে চাইলেন। সে সেটা নিয়ে রসুইঘরে চ'লে গেলো, আর সেটা আবর্জনার স্তূপে ছুঁড়ে ফেলে দিলো।

বাকি সবটা একাই খেলেন ঠাকুমা। একেকটা আস্ত টুকরো মুখে পুরছেন, চিবোনো-টিবোনোর কোনো বালাই নেই, কপ ক'রে গিলে ফেলছেন, আহ্লাদে মুখ দিয়ে অস্ফুট উম্‌ম্‌ম্ আওয়াজ বেরুচ্ছে, আর তাঁর উপভোগের লিম্বো থেকে কেবলই তাকাচ্ছেন উলিসেসের দিকে। যখন তাঁর নিজের রেকাবিটা চেটেপুটে সাবাড় করা হ'য়ে গেলো তখন উলিসেস যে-চাকটা খেতে চায়নি সেটাও তিনি খেয়ে ফেললেন। শেষ চাকটা চিবুতে-চিবুতে টেবিলঢাকা থেকে গুঁড়োগুলো তুলে নিলেন, তারপর সেগুলোও মুখে পুরে দিলেন।

ইঁদুরদের একটা আস্ত প্রজন্মই খতম হ'য়ে যেতো, এতটাই সেঁকোবিষ খেয়েছেন ঠাকুমা। অথচ তবু তিনি পিয়ানো বাজিয়ে মাঝরাত অব্দি গান গাইলেন, আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে গেলেন বিছানায়, আর এমনকী স্বাভাবিকভাবেই ঘুমিয়ে পড়লেন। যেটা শুধু নতুন হ'লো সেটা তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাস—তাতে পাওয়া গেলো পাথরের ওপর কিছু-একটা আঁচড়ানোর আওয়াজ।

এরেন্দিরা আর উলিসেস অন্য বিছানাটা থেকে তাঁর ওপর নজর রাখছিলো,

অপেক্ষা ক'রে ছিলো কখন ওঠে মৃত্যুর ঘড়ঘড়। কিন্তু ঘুমের ঘোরে রোজকার মতো তিনি যখন প্রলাপ বকতে শুরু করলেন, গলাটা শোনালো আগের মতোই সজীব, সতেজ।

'আমি পাগল হ'য়ে গিয়েছিলাম, ঈশ্বর, আমি একেবারেই পাগল হ'য়ে গিয়েছিলাম!' গাঁক-গাঁক করলেন ঠাকুমা। 'সে যাতে ভেতরে আসতে না-পারে সেজন্যে দু-দুটো হুড়কো লাগিয়ে দিয়েছিলাম আমার শোবার ঘরের দরজায়, দরজার গায়ে ঠেকিয়ে রেখেছিলাম টেবিল, সাজচৌকি, ঘরের সবগুলো চেয়ার, আর সে কিনা তার হাতের আংটি দিয়ে শুধু একটা টোকা দিলে; আর সুরক্ষার সব আয়োজন মুহূর্তে ভেঙেচুরে ছত্রখান! টেবিলের ওপর থেকে চেয়ারগুলো যেন নিজে-নিজেই উল্টে পড়লো, টেবিল আর সাজচৌকি পরস্পরের কাছ থেকে আপনা থেকেই স'রে গেলো, হুড়কোগুলো নিজে থেকেই উঠে গেলো খাঁজ থেকে।'

এরেন্দিরা আর উলিসেস তাজ্জব হ'য়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলো; যতই প্রলাপ অতি গম্ভীর আর নাটকীয় হ'য়ে উঠলো আর কণ্ঠস্বর হ'য়ে উঠলো আরো-অন্তরঙ্গ, ততই তাদের চোখগুলো বিস্ময়ে বিস্ফারিত হ'য়ে উঠলো।

'আমার মনে হ'লো আমি বুঝি ম'রেই যাচ্ছি, ভয়ে একেবারে ঘেমে-নেয়ে অস্থির, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অনুনয় করছি দরজাটা যেন না-খুলেই খুলে যায়, সে যেন না-ঢুকেই ভেতরে ঢোকে, সে যেন কখনও চ'লে না-যায় আবার কখনও ফিরেও না-আসে, আমায় যাতে তাকে খুন করতে না-হয়।'

ফিরে-ফিরে তিনি আউড়েই চললেন তাঁর নাটক, কয়েক ঘণ্টা ধ'রে অবিশ্রাম, এমনকী সব অন্তরঙ্গ গোপন খুঁটিনাটিগুলো শুদ্ধু, যেন আবারও ব্যাপারটা সত্যি-সত্যি ঘ'টে যাচ্ছে তাঁর স্বপ্নে। ভোরের একটু আগে বিছানায় তিনি পাক খেয়ে গড়িয়ে গেলেন ভূকম্পনতরঙ্গের মতো স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল আর গলাটা ভেঙে গেলো বোবা কান্নার আবির্ভাবে।

'তাকে আমি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলাম কিন্তু সে তা হেসেই উড়িয়ে দিলে,' চীৎকার ক'রে উঠলেন ঠাকুমা। 'আবারও তাকে সাবধান করলাম আমি আর আবারও সে হেসে উঠলো, যতক্ষণ-না সে চোখ খুললো আতঙ্কে, এই ব'লে: "উঃফ রানী! উঃফ রানী!" আর তার কথাগুলো তার মুখ দিয়ে আর বেরুচ্ছিলো না, বরং বেরুচ্ছিলো তার গলায় ছুরিটা যেখানে পোঁচ দিয়ে কেটেছে সেখান দিয়ে।'

ঠাকুমার ভয়াবহ আহূত স্মৃতিচারণ শুনে উলিসেস আঁৎকে উঠে এরেন্দিরার হাত চেপে ধরলে।

'খুনে বুড়ি !' আর্ত চেঁচিয়ে উঠলো সে।

এরেন্দিরা তাকে কোনো পাত্তাই দিচ্ছিলো না, কারণ ঠিক সেই মুহূর্তে ভোরের আলো ফুটতে শুরু ক'রে দিয়েছিলো। ঘড়ি ঘণ্টা বাজালো পাঁচটা।

'যাও !' এরেন্দিরা বললে, 'এখুনি উনি জেগে উঠবেন।'

'একটা হাতির চেয়েও কড়া জান ওঁর,' আর্ত ও বিস্মিত উলিসেস বললে, 'এ হ'তেই পারে না !'

এরেন্দিরা ছুরির ধারের মতো চোখে তাকালে তার দিকে, তার বাক্‌রোধ ক'রে দিলে।

বললে : 'পুরো গণ্ডগোলটা হ'লো এই যে তোমার কাউকে খুন করারও মুরোদ নেই !'

এই তিরস্কারের রূঢ় স্থূলতায় উলিসেস এতটাই ঘা খেলে যে সে তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। গোপন তার ঘৃণা নিয়ে এরেন্দিরা নির্নিমেষ তাকিয়ে রইলো তার ঘুমন্ত ঠাকুমার দিকে, হতাশা থেকেই প্রচণ্ড আক্রোশ জেগে উঠেছে তার মধ্যে, আর সূর্য উঠলো আর পাখি জাগলো আর হাওয়া ছুটলো। তারপরেই ঠাকুমা তাঁর চোখ খুলে শান্ত হেসে তার দিকে তাকালেন।

'ভগবান তোর সঙ্গে থাকুন, বাছা।'

একমাত্র লক্ষণীয় বদল হ'লো দৈনিক কার্যক্রমের তুলকালাম বিশৃঙ্খলা। দিনটা ছিলো বুধবার, কিন্তু ঠাকুমা চাইলেন গায়ে চাপাবেন রোববাসরীয় পোশাক, ঠিক করলেন বেলা এগারোটার আগে এরেন্দিরা কোনো মক্কেলকেই তোয়াজ বা আপ্যায়ন করবে না, আর তাকে বললেন তাঁর নখ তামাটের রঙে রাঙিয়ে দিতে আর মস্ত জমকালো খোঁপা ক'রে তাঁর চুল বেঁধে দিতে।

'এর আগে কখনোই আমার ছবি তোলবার জন্যে এত সাধ হয়নি,' বিস্মিত স্বরে ব'লে উঠলেন ঠাকুমা।

এরেন্দিরা তার ঠাকুমার চুল আঁচড়াতে শুরু করলে, কিন্তু যেই সে চুলের মধ্যে চিরুনি চালিয়েছে চিরুনির দাঁতের ফাঁকে-ফাঁকে গোছা-গোছা চুল উঠে এলো। আঁৎকে উঠে সে ঠাকুমাকে তা দেখালে। ঠাকুমা সেটা খুঁটিয়ে দেখলেন আঙুল দিয়ে টান দিলেন আরেকটা গোছা, আর চুলের আরেকটা ঝোপ তাঁর হাতে উঠে এলো। সেটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে তিনি আবার চুল ধ'রে টান দিলেন, আরো-একটা লম্বা গোছা উঠে এলো। তারপর তিনি দু-হাত দিয়ে তাঁর চুল টানতে শুরু ক'রে দিলেন ; হেসেই খুন ঠাকুমা ; মুঠো-মুঠো চুল ছুঁড়ে দিচ্ছেন হাওয়ায় কেমন

এক অবোধ উল্লাসে, যতক্ষণ-না তাঁর মাথাটা দেখালো ছোবড়া ছাড়ানো নারকোলের মালার মতো।

দু-হপ্তা কেটে যাবার আগে উলিসেসের আর-কোনো পাত্তাই পেলে না এরেন্দিরা, তারপরেই হঠাৎ সে শুনতে পেলে তাঁবুর বাইরে প্যাঁচা ডেকে উঠলো। ঠাকুমা তখন পিয়ানো বাজাতে শুরু করেছেন আর তাঁর স্মৃতির ভেতর এতটাই তলিয়ে গেছেন যে বাস্তবের কোনো বোধই তাঁর ছিলো না। তাঁর মাথায় রংচঙে পালকের একটা পরচুল।

এরেন্দিরা পাঁচার ডাকে সাড়া দিলে আর তখনই সে খেয়াল করলে পিয়ানো থেকে বেরিয়ে-আসা সলতেটা—সেটা ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে গিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। সে ছুটে চ'লে গেলো সেখানে যেখানে উলিসেস লুকিয়ে আছে ঝোপের মধ্যে, গিয়েই সে লুকিয়ে পড়লো তার পাশে, আর বুকে কেমন-একটা আঁটো ভাব অনুভব ক'রে তারা দুজনে লক্ষ করলে ছোট্ট নীল শিখাটি কেমন ক'রে সলতে বেয়ে-বেয়ে বুকে হেঁটে যাচ্ছে, পেরিয়ে যাচ্ছে কালো অন্ধকার জমি, ঢুকে পড়ছে তাঁবুর মধ্যে।

'কানে হাত চাপা দাও,' বললে উলিসেস।

দুজনেই কান ঢাকলে, যদিও কোনো দরকারই ছিলো না, কারণ সেখানে কোনোই বাবুম-বুবুম-বুম হ'লো না। শুধু তাঁবুর ভেতরটা আলো হ'য়ে উঠলো, ঝকমকে এক দীপ্তি, বিচ্ছুরণ, স্তব্ধতায় ফেটে পড়লো, আর উধাও হ'য়ে গেলো বেণু-রেণু ভেজা জিনিশের ঘূর্ণিহাওয়ায়। ঠাকুমা এখন মারা গেছেন এই কথা ভেবে অবশেষে যখন এরেন্দিরা ভেতরে ঢোকবার সাহস পেলে সে গিয়ে দেখলো তাঁকে, পরচুলটা পোড়া, তাঁর রাতকাপড় ছিঁড়ে ফালি-ফালি, চিলতে, কিন্তু তিনি নিজে আগের চাইতেও আরো জ্যান্ত, একটা কম্বল চাপা দিয়ে আগুন নেভাবার চেষ্টা করছেন।

উলিসেস পিছলে বেরিয়ে গেলো ইণ্ডিয়ানদের চীৎকার শোরগোলের আড়াল দিয়ে। ইণ্ডিয়ানরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলো না কী করা উচিত, আরো ঘাবড়ে যাচ্ছিলো ঠাকুমার উলটোপালটা হুকুমে। যখন তারা শেষটায় শিখাগুলোকে জয় ক'রে নিতে পারলে, আর তাড়িয়ে দিলে ধোঁয়া, তারা তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলে সেখানে যেন প'ড়ে আছে একটা ভাঙাচোরা জাহাজ।

'এ-সবই অমঙ্গলটার কাজ', ঠাকুমা বললেন। 'পিয়ানো কখনো এমনভাবে ফেটে পড়ে না।'

নতুন তাণ্ডবটার কারণ প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে ঠাকুমা একের পর এক খ্যাপাটে

অনুমান ক'রে গেলেন, কিন্তু এরেন্দিরার ব্যাপারটা এড়িয়ে-যাওয়া কিংবা তার অবিকার ভঙ্গি শেষটায় তাঁকে কেমন ধাঁধায় ফেলে দিলে। তাঁর নাৎনির ব্যবহারে কোনো চিড় কোনো ফাটল তিনি আবিষ্কার করতে পারলেন না, উলিসেসের অস্তিত্বটাও তিনি বিবেচনা ক'রে দেখলেন না। ভোর অব্দি তিনি জেগে রইলেন, সুতোগুলো জোড়া দেবার চেষ্টা ক'রে-ক'রে আর লোকশানের বহরটা আন্দাজ করতে-করতে খুব কমই ঘুমুলেন তিনি, তাও সে-ঘুম হ'লো ছেঁড়া-ছেঁড়া। পরদিন সকালে এরেন্দিরা তার ঠাকুমার সোনার চাক্তিবসানো গেঞ্জিটা খুলে নিলে, দেখতে পেলে তাঁর ঘাড়ের কাছে ফোসকা-ফোসকা, স্তনের ওপর বেরিয়ে আছে কাঁচা মাংস। 'ঘুমের ঘোরে পাশ ফেরবার ভালো কারণ ছিলো,' এরেন্দিরা যখন তাঁর পোড়ায় ডিমের শাদা মাখাচ্ছে, তিনি বললেন। 'আর তাছাড়া ভারি একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি আমি।' গভীর মনোনিবেশ ক'রে স্বপ্নের ছবিটাকে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করলেন ঠাকুমা, আর অবশেষে ছবিটা তার স্মৃতিতে স্বপ্নের মতোই স্পষ্ট আর প্রাঞ্জল হ'য়ে এলো।

'শাদা দোলখাটিয়ায় একটা ময়ূর,' তিনি বললেন।

এরেন্দিরা শুনে অবাক হ'য়ে গেলো, কিন্তু পরক্ষণেই সে মুখে প'রে নিলে প্রতিদিনের অভিব্যক্তি।

'এটা একটা সুলক্ষণ,' মিথ্যে বললে সে। 'স্বপ্নের ময়ূররা হ'লো দীর্ঘস্থায়ী সব প্রাণী।'

'ভগবান যেন তোর কথাই শোনেন,' ঠাকুমা বললেন, 'কারণ আবার আমরা ফিরে এসেছি প্রথম খোপটায়, যেখান থেকে আমরা শুরু করেছিলাম। আবার সব নতুন ক'রে শুরু করতে হবে আমাদের।'

এরেন্দিরা তার মুখের ভাব পালটালে না। সেঁক দেবার পুঁটুলিগুলো একটা রেকাবিতে নিয়ে সে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেলো; তার ঠাকুমা ব'সেই রইলেন, ধড়টা ডিমের শাদায় ভেজানো, আর মাথার খুলিতে সর্ষেবাটা মাখা। রেকাবিতে আরো ডিমের শাদা রাখছিলো এরেন্দিরা। তালগাছের ছায়ায়, যেখানে রসুইঘর, সেখানে ব'সে-ব'সে। এমন সময় হঠাৎ উনুনের আড়ালে সে দেখতে পেলে উলিসেসের চোখ, যেমন সে দেখেছিলো প্রথমবার তার বিছানার পেছনে। এরেন্দিরা আঁৎকে ওঠেনি, শুধু ক্লান্ত অবসন্ন গলায় তাকে বললে :

'শুধু যেটা করতে পেরেছো সে হ'লো আমার দেনার বহরটা আরো বাড়িয়ে দিয়েছো।'

উদ্বেগে উলিসেসের চোখ মেঘে ঢেকে গেলো। নিশ্চল, চুপচাপ, সে তাকিয়ে রইলো এরেন্দিরার দিকে, দেখলো কেমন ক'রে সে একের পর এক ডিম ফাটিয়েই চলেছে পরম ঘৃণায়, যেন উলিসেসের কোনো অস্তিত্বই নেই তার কাছে। মুহূর্ত পরে চোখ দুটি নড়ালে, তাকিয়ে দেখলে রসুইঘরের জিনিশগুলো, ঝোলানো বাসনকোশন, সুঁতলিতে বাঁধা মশলা, মাংস কাটার ছুরি। উলিসেস উঠে দাঁড়ালে, এখনও সে কিছু বলছে না, আস্তে ঢুকলো সে তালপাতার ছাউনির তলায়, তারপর ছুরিটা হাতে তুলে নিলে।

এরেন্দিরা তার দিকে আর তাকায়নি, কিন্তু উলিসেস যখন ছাউনি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে সে তাকে খুব নিচু গলায় বললে :

'সাবধান থেকো, কারণ এর মধ্যেই উনি একবার মৃত্যুর হুঁশিয়ারি পেয়েছেন। শাদা দোলখাটিয়ায় একটা ময়ূরের স্বপ্ন দেখেছেন উনি।'

ঠাকুমা দেখলেন ছুরি হাতে উলিসেস ঘরে এসে ঢুকলো, আব একটা প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে তাঁর সেই দোর্দণ্ডের সাহায্য ছাড়াই তিনি উঠে দাঁড়ালেন, আর দু-হাত তুললেন শূন্যে।

'ছেলে!' তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন। 'তোর কি মাথা খাপাপ হ'য়ে গেছে?'

উলিসেস তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, ছুরিটা আমূল বসিয়ে দিলে তাঁর নগ্ন বুকে। ঠাকুমা কাৎরে উঠলেন, ঝাঁপিয়ে পড়লেন তার ওপর, তাঁর সবল ভালুক হাতে তার গলা টিপে মারবার চেষ্টা করলেন।

'কুত্তির বাচ্চা!' গরগর ক'রে উঠলেন ঠাকুমা। 'বড্ড দেরি ক'রে আবিষ্কার করলাম তোর মুখটা আসলে বেইমান দেবদূতের মতো।'

আর-কিছু বলতে পারলেন না ঠাকুমা, কারণ উলিসেস তখন কোনোরকমে ছুরিটা টেনে বার ক'রে নিয়েছে, এবার সে ছুরিটা ঢোকালে পাশ থেকে। ঠাকুমার মুখ থেকে গোপন এক গোঙানি বেরিয়ে এলো, হানাদারকে তিনি আরো জোরে জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করলেন। উলিসেস ছুরিটা হানলে তৃতীয়বার, দয়া'বিহীন, আর রক্তের একটা দমকা, উঁচু চাপে ছাড়া পেয়ে, ফোয়ারার মতো ছিটকে পড়লো তার মুখে : তেলতেলে রক্তের ফোয়ারা, জলজ্বলে, সবুজ, যেন তা পুদিনার মধু।

এরেন্দিরা দেখা দিলে দরজায়, তার হাতে রেকাবি, আর যুদ্ধটা সে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলে কোনো অপরাধীর ভাবলেশহীন মুখে।

বিশাল, যেন কোনো একশিলা, ব্যথায় আক্রোশে গর্জন করছেন, ঠাকুমা পাকড়ে ধরলেন উলিসেসের শরীর। তাঁর বাহু, তাঁর পা, এমনকী তাঁর নিকেশ মাথা রক্তে

সবুজ হ'য়ে গিয়েছে। তাঁর প্রকাণ্ড হাপরের মতো শ্বাসপ্রশ্বাস, মৃত্যুর প্রথম ঘড়-ঘড়ানি, কেমন যেন ছন্দহারানো, সারা জায়গাটা ভর্তি ক'রে দিচ্ছে। হাতিয়ার সমেত হাতটা কোনোরকমে আরো-একবার ছাড়িয়ে নিয়ে এলো উলিসেস, খুলে দিলে তাঁর পেটের মধ্যে একটা চির, আর রক্তের এক দমকা বিস্ফোরণ তাকে ভিজিয়ে সবুজ ক'রে দিলে, মাথা থেকে পায়ের পাতা অব্দি। ঠাকুমা চেষ্টা করলেন খোলা হাওয়ায় পৌঁছুতে, হাওয়া চাই এখন, হাওয়া, বাঁচতে হ'লে হাওয়া চাই, আর মুখ থুবড়ে প'ড়ে গেলেন। উলিসেস নিস্প্রাণ বাহুপাশ ছাড়িয়ে বেরিয়ে এলো, আর এক মুহূর্তও না-থেমে প্রকাণ্ড প'ড়ে-থাকা শরীরটায় শেষবার বসিয়ে দিলে ছুরি।

এরেন্দিরা তখন রেকাবিটা নামিয়ে রাখলে টেবিলে, ঝুঁকে পড়লো তার ঠাকুমার ওপর, তাঁকে স্পর্শ না-ক'রেই সব খুঁটিয়ে দেখলে। যখন সে নিঃসংশয় হ'লো যে তিনি মারা গেছেন, তার মুখ হঠাৎ অর্জন ক'রে বসলো কোনো বয়স্কের পাকা ভাব যেটা তার কুড়ি বছরের দুর্ভাগ্যও অ্যাদ্দিন তাকে দিতে পারেনি। ক্ষিপ্র, নিখুঁত, সুঠাম হাতে সে সোনার গেঞ্জিটা পাকড়ে ধরলো, তারপর তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

উলিসেস বসেছিলো মৃতদেহের পাশে, যুদ্ধ ক'রে ক্লান্ত, আর যতই সে তার মুখ পরিষ্কার করার চেষ্টা করলে ততই তার মুখ চটচটে সবুজ জ্যান্ত পদার্থে ভ'রে গেলো—মনে হচ্ছে যেন তার আঙুল থেকেই তা গলগল ক'রে বেরিয়ে আসছে। যখন সে দেখতে পেলে এরেন্দিরা সোনার গেঞ্জি নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে শুধু তখনই সে নিজের দশা সম্বন্ধে সম্বিৎ ফিরে পেলে।

সে চেঁচিয়ে ডাকলে এরেন্দিরাকে, কিন্তু কোনো সাড়া পেলে না। সে নিজেকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে গেলো তাঁবুর মুখে, আর দেখতে পেলে এরেন্দিরা শহর থেকে দূরে সমুদ্রতীর ধ'রে ছুটতে শুরু ক'রে দিয়েছে। তখন সে একটা শেষ চেষ্টা করলে তার পেছনে ধাওয়া ক'রে যাবার, বারে-বারে চেঁচিয়ে ডাকলে তাকে ব্যথাতুর ধরা গলায় যেটা এখন আর কোনো প্রেমিকের গলা নয়, বরং যেন কোনো ছেলের গলা, কারু সাহায্য ছাড়াই কোনো স্ত্রীলোককে খুন ক'রে সে যেন একেবারে নিঃশেষ হ'য়ে গিয়েছে। ঠাকুমার ইণ্ডিয়ানরা যখন তার নাগাল পেলে সে তখন বেলাভূমিতে মুখ থুবড়ে প'ড়ে আছে, আর হাউ-হাউ ক'রে কাঁদছে আতঙ্কে আর নিঃসঙ্গতায়।

এরেন্দিরা তাকে শুনতেই পায়নি। সে ছুটে যাচ্ছে হাওয়ায়, কোনো হরিণের

চেয়েও ক্ষিপ্র, আর জগতের কোনো কণ্ঠস্বরই তাকে থামাতে পারতো না। একবারও মাথা না-ঘুরিয়েই, সে পেরিয়ে গেলো শোরার খনি, ধাতুর পাতের জ্বালামুখ, ঝুপড়ি-আটচালাগুলোর জবড়জং, যতক্ষণ-না শেষ হ'লো সমুদ্রের প্রকৃতিবিজ্ঞান আর শুরু হ'লো মরুভূমি। তবু কিন্তু সে ছুটেই চললো সোনার গেঞ্জিটা নিয়ে উষর হাওয়ার পরপারে, আর কখনও-শেষ-না-হওয়া সূর্যাস্তগুলো পেরিয়ে। তার কথা আর-কোনোদিনই শোনা যায়নি অথবা পাওয়া যায়নি তার দুর্ভাগ্যের সামান্যতম চিহ্নও।

১৯৭২

মৃত্যুই ধ্রুব প্রণয়ের পরপারে

মৃত্যুর মুখোমুখি হবার যখন ছ-মাস এগারো দিন বাকি তখনই সেনাদোর ওনেসিমো সানৃচেস খুঁজে পেলেন তাঁর জীবনের নারীকে। তার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিলো কুহকের গ্রাম রোসাল দেল ভিরেইতে, অলীক যে-গ্রামটি রাত্তিরে হ'য়ে ওঠে চোরাচালানিদের জাহাজ ভেড়াবার ঘাট, আর অন্যদিকে, প্রকাশ্য দিবালোকে যাকে দেখায় নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় কোনো খাঁড়ির মতো, পথ ভুল ক'রে যেটা মরুভূমিতে ঢুকে পড়েছে, এমন-এক সমুদ্রের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে যেটা ঊষর, দিকহারা, সবকিছু থেকেই এত দূরে যে ভুলেও কেউ সন্দেহই করতে পারতো না যে কারু ভাগ্যকে বদ্‌লে-দেবার ক্ষমতা রাখে এমন-কেউ সেখানে থাকে। এমনকী তার নামটাও যেন একটা মস্করা, কারণ গাঁয়ের মধ্যে একমাত্র যে-গোলাপটি আছে সেটা পরেছিলেন সেনাদোর ওনেসিমো সানৃচেসই স্বয়ং, সেই একই বিকেলে যখন তাঁর সঙ্গে দেখা হ'লো লরা ফারিনার।

প্রতি চার বছর পর-পর তাঁকে যে নির্বাচনী প্রচার-অভিযানে বেরুতে হয়, তাতে এই গ্রামে থামাটা অপরিহার্যই। কার্নিভালের টানাগাড়িগুলো এসে পৌঁছেছে সকালবেলায়। তারপর এসেছে ভাড়া-করা ইণ্ডিয়ানদের নিয়ে ট্রাক-গুলো, সরকারি কোনো অনুষ্ঠানে চিরকাল তাদের শহরগুলোয় নিয়ে-যাওয়া হয় ভিড় বাড়াতে। বেলা এগারোটার একটু আগে, অনুচরদের গান-বাজনা হাউই-পটকা আর জিপগাড়িগুলোর সঙ্গে, মন্ত্রীমহোদয়ের ধনুকর্মাণ সোডার রঙের মোটর-গাড়ি এসে পৌঁছেছে। সেনাদোর ওনেসিমো সানৃচেস তাঁর বাতানুকূলিত গাড়ির ভেতরে এতক্ষণ ছিলেন অবিচল আর আবহাওয়াবিহীন, অথচ যেই তিনি গাড়ির দরজা খুললেন আগুনের একটা হলকা তাঁকে সজোরে ঝাঁকুনি দিয়ে গেলো, আর তাঁর খাঁটি রেশমি জামাটা হালকারঙের কোনো সুরুয়ায় ভিজে সপসপে হ'য়ে উঠলো, নিজেকে তাঁর হঠাৎ বয়েসের তুলনায় বড্ড বুড়ো লাগলো, আর ভারি একা লাগলো তাঁর, আগের চাইতেও একা। বাস্তব জীবনে তিনি সদ্য পা দিয়েছেন বিয়াল্লিশে, গয়টিনগেন থেকে ধাতুবিৎ এনজিনিয়ার হিশেবে সাম্মানিক সহ স্নাতক হয়েছেন ; গোগ্রাসে তিনি বই পড়েন, যদিও খুব-একটা লাভ হয় না তাতে, পড়েন

তিনি খুব বাজে তর্জমা-করা ধ্রুপদী সব লাতিন বই। এক ঝলমলে আলেমান মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছে, যিনি তাঁকে দিয়েছেন পাঁচটি সন্তান, আর তারা সবাই সুখেই আছে বাড়িতে ; তিনি নিজেই ছিলেন সবচাইতে সুখী যতক্ষণ-না তিনমাস আগে তারা তাঁকে বললে যে আগামী বড়োদিনের মধ্যেই চিরকালের মতো তাঁর ইহলোকের লীলা ঘুচবে।

জনসভার জন্যে যাবতীয় প্রস্তুতি যখন সারা হচ্ছে, তাঁর বিশ্রামের জন্যে তারা যে-বাড়িটা বরাদ্দ করেছিলো সেনাদোর সেখানে ঘণ্টাখানেক একা থাকবার সুযোগটা বাগিয়ে নিয়েছেন। শুয়ে-পড়ার আগে খাবার জলের গেলাশটায় তিনি গোলাপটা চুবিয়ে দিলেন, গোটা মরুভূমিতেই এটাকে তিনি বাঁচিয়ে নিয়ে এসেছেন, যে-পথ্য সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসছেন তাতেই সেরেছেন দুপুরের খাওয়া যাতে দিনের বাকি সময়ে তাঁর জন্যে অনবরত ও পুনরাবৃত্ত পাঁঠার মাংসের ভাজা-ভুজি অপেক্ষা ক'রে আছে সেটা এড়িয়ে যেতে পারেন। কয়েকটা ব্যথাকমানো বড়িও গিলে ফেললেন তিনি, ব্যবস্থাপত্রে যে-সময়ে খেতে বলা হয়েছে তার আগেই, যাতে ব্যথাটা চাগিয়ে ওঠবার আগেই সেটাকে তিনি ঠেকাতে পারেন। তারপর তিনি দোলখাটিয়ার কাছে টেনে নিয়ে এলেন বিজলি পাখাটা, গোলাপের ছায়ায় মিনিট পনেরো শুয়ে রইলেন বিবস্ত্র, ঢুলতে-ঢুলতে প্রচণ্ড চেষ্টা করলেন মনকে অন্য খাতে বওয়াতে যাতে মৃত্যুর কথা তাঁকে ভাবতে না-হয়। ডাক্তাররা ছাড়া, আর-কেউই জানে না যে রায় বেরিয়ে গিয়েছে তাঁর, নির্দিষ্ট একটা সময়ও শুধু তিনি বাঁচবেন, কারণ তিনি ঠিক ক'রে নিয়েছেন তাঁর এই গুপ্তকথা তিনি একাই সহ্য করবেন, কোনো বদল ঘটাবেন না জীবনযাপনে, সেটা কিন্তু অহমিকাবশত নয়, বরং মৃত্যুকে তাঁর মনে হচ্ছিলো একটা ডাহা কেলেঙ্কারি।

বেলা তিনটেয় যখন আবার তিনি জনসমক্ষে উপস্থিত হলেন, তাঁর মনে হ'লো সবকিছুই এখন তাঁর আয়ত্তে : বিশ্রাম হয়েছে, পরিচ্ছন্ন, রুক্ষ তাকতায় তৈরি স্ল্যাক্স আর ফুল-কাটা জামা গায়ে, আর ব্যথাকমানো বড়ির দৌলতে তাঁর মেজাজটাও শরীফ। তৎসত্ত্বেও, তিনি যা ভেবেছিলেন তিল-তিল এই মরণ তার চেয়েও বেশি ক্ষতিকর ; কারণ যখন তিনি মঞ্চে উঠছেন, তখন যারা তাঁর সঙ্গে করমর্দন করবার সৌভাগ্যের জন্যে নিজেদের মধ্যে ঠেলাঠেলি করছিলো তাদের জন্যে এক অদ্ভুত বিতৃষ্ণা তিনি অনুভব করলেন। খালি-পা ইণ্ডিয়ানরা প্রায় সইতেই পারে না ঊষর বন্ধ্যা ছোট্ট স্কোয়ারের তপ্ত শোরার কয়লা ; অন্যসময়ে তাদের দেখে তাঁর দয়াই হ'তো, কিন্তু এখন বরং উলটোটাই হ'লো। হাত নেড়ে তিনি হাততালির

দমকাটা থামিয়ে দিলেন, প্রায় যেন তেড়েফুঁড়েই, রুষ্ট, আর কোনো মুদ্রা ব্যবহার না-ক'রেই তিনি কথা বলতে শুরু ক'রে দিলেন, দৃষ্টি নিবদ্ধ সমুদ্রের ওপর—যে-সমুদ্র গরমে এখন হাঁসফাঁস করছে। তাঁর মাপা, গভীর কণ্ঠস্বরের মধ্যে যেন অতল জলেরই ছোঁয়াচ, কিন্তু যে-ভাষণটি তিনি মুখস্থ করেছেন আর গমপেষাইয়ের মতো জাঁতা থেকে এতবার বার ক'রে দিয়েছেন যে তাঁর কাছে মনেই হ'লো না সে-ভাষণে কোনো সত্য কথা বলবার ধরন আছে, বরং তা যেন মার্কাস অরেলিয়াসের 'ধ্যানপুথি'র চতুর্থ খণ্ডের নিয়তিবাদী উচ্চারণের উলটোটাই ব'লে মনে হ'লো।

'আমরা এখানে আছি প্রকৃতিকে হার মানাবো ব'লে,' তার সমস্ত বিশ্বাসের বিরুদ্ধেই তিনি শুরু করলেন। 'আমাদের নিজেদের দেশে আমরা আর কুড়িয়ে-পাওয়া অনাথ হ'য়ে থাকবো না, পিপাসা আর বিকট জলবায়ুর মহালে ঈশ্বর-পরিত্যক্ত হ'য়ে থাকবো না আমরা, আর থাকবো না নিজ বাসভূমে পরবাসী। সেনিওরা ও সেনিওরগণ, আমরা একেবারে অন্য মানুষ হ'য়ে উঠবো—মহান এবং সুখী জনগণ হ'য়ে উঠবো আমরা।'

তাঁর এই সার্কাসের পেছনে একটা ছক একটা নকশা আছে। যখন তিনি কথা বলছেন, তার অনুচরেরা হাওয়ায় ছুঁড়ে দিলে ঝাঁকে-ঝাঁকে কাগজের পাখি আর এই নকল পাখিরা হাওয়ায় প্রাণ পেয়ে গেলো, তক্তা বসিয়ে তৈরি-করা মঞ্চের ওপর ঘুরে বেড়ালো এলোমেলো, তারপর উড়ে চ'লে গেলো সমুদ্রে। ঠিক তখন, অন্য অনুচরেরা ঠেলাগাড়িগুলোর মধ্য থেকে নিয়ে এলো শোলার পাতা লাগানো কতগুলো খুঁটি, নাটমঞ্চের গাছ, আর ভিড়ের পেছনে শোরার জমিতে সেগুলো তারা পুঁতে দিলে। কাচের জানলা বসানো লাল ইঁটের বাড়ির ভাণ—কার্ডবোর্ডে তৈরি তার সদর—বসিয়ে দিয়ে শেষ করলে ভোজবাজি, আর এই বাড়িগুলো দিয়ে তারা ঢেকে দিলে সত্যিকার, ভাঙাচোরা, ঝুপড়ি আর আটচালাগুলো।

সেনাদোর তাঁর ভাষণ বিলম্বিত করলেন লাতিন থেকে দুটি উদ্ধৃতি দিয়ে যাতে প্রহসনটায় আরো সময় কাটে। তিনি তাদের প্রতিশ্রুতি দিলেন বৃষ্টি তৈরির কারখানা, খাবারটেবিলের প্রাণীদের জন্যে সহজে-বহনীয় বংশবর্ধক, সুখবিলাসের স্নেহপদার্থ যা শোরার জমিতে ফলাবে শাকসব্জি, আর জানলায়-জানলায় বাক্সভর্তি সব বেগনি ফুল। যখন তিনি দেখলেন তাঁর কাল্পনিক জগৎ বসানো হ'য়ে গেছে, তিনি আঙুল তুলে সেটা দেখালেন। 'সেনিওরা ও সেনিওরগণ, এইরকমই হবে সবকিছু আমাদের জন্যে।' চেঁচিয়ে বললেন: 'দেখুন! এইরকমই হবে সব—আমাদের জন্যে।'

শ্রোতারা ফিরে তাকালে। রং-করা কাগজে বানানো বড়ো একটা সমুদ্রগামী জাহাজ বাড়িগুলোর পেছন দিয়ে ভেসে চলেছে, সেই নকল নগরীর সবচেয়ে উঁচু বাড়ির চাইতেও সেটা উঁচু। সেনাদোর শুধু নিজেই খেয়াল করলেন যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বারে-বারে নিয়ে-যাওয়া এই লজ্‌ঝড় শহরের ওপর চাপানো কার্ডবোর্ডের শহরটাকে উৎকট ও ভয়ংকর জলবায়ু এর মধ্যেই খেয়ে ফেলেছে, এটা এখন রোসাল দেল ভিরেইয়ের মতোই গরিব, বেচারি, ধূলিমলিন ও হতশ্রী।

বারো বছরের মধ্যে এই প্রথমবার, নেলসন ফারিনা সেনাদোরকে অভ্যর্থনা করতে যায়নি। রুক্ষ, পালিশ না-করা, কাঠে তৈরি বাড়ির ছায়ায়—যে-বাড়িটা সে তৈরি করেছে সেই একই ভেষজবিদের হাতে, যে-হাত দিয়ে টেনে নিয়ে সে তার প্রথমা স্ত্রীকে কুচি-কুচি ক'রে কেটেছিলো—তার সিয়েস্তার ভগ্নাবশেষের মধ্যে তার দোলখাটিয়া থেকেই সে বক্তৃতাটা শুনছিলো। ডেভিলস আইল্যাণ্ড [যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর] থেকে পালিয়ে এসে সরল সব ম্যাকাওতে ভরা এক জাহাজে ক'রে সে আবির্ভূত হয়েছিলো রোসাল দেল্ ভিরেইয়ে, সঙ্গে ছিলো পরমা রূপসী ও খিস্তি-খেউড়ে মহাওস্তাদ এক কালো মেয়ে, যাকে সে আবিষ্কার করেছিলো পারামারি-বোতে, আর যার মারফৎ সে জন্ম দিয়েছে এক মেয়ের। কিছুদিন বাদেই সেই সুন্দরী কৃষ্ণা স্বাভাবিক কারণেই মারা যায়—অন্য স্ত্রীর কপালে যা ছিলো সেই দুর্ভোগ তাকে আর সইতে হয়নি—সেই যার কুচি-কুচি টুকরো দিয়ে সে তার ফুল-কপি ফলানোর জমিতে সার দিয়েছিলো, বরং তার ওলন্দাজ নাম সমেত স্থানীয় গোরস্থানে এই দ্বিতীয়া স্ত্রীকে কবর দেয়া হয়েছিলো সর্বাঙ্গসুঠাম। মেয়েটি উত্তরা-ধিকার পেয়েছে শ্যামলা রং আর তার দেহসৌষ্ঠব, সঙ্গে পেয়েছে বাবার অবাক-অবাক হলুদ চোখ, আর নেলসন ফারিনার এ-কথা ভাববার সংগত কারণই আছে যে সে জগতের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েকে বড়ো ক'রে তুলছে।

যেদিন থেকে সেনাদোর ওনেসিমো সান্‌চেসের সঙ্গে তাঁর প্রথম নির্বাচনী সফরে তার আলাপ হয়েছে সেদিন থেকেই নেলসন ফারিনা তাঁকে অনুনয় ক'রে চলেছে তার জন্যে একটা নকল শনাক্তপত্রের ব্যবস্থা ক'রে দিতে, যা তাকে আইনের খপ্পর থেকে বাঁচাবে। সেনাদোর খুবই বন্ধুভাবে কিন্তু দৃঢ় স্বরে প্রস্তাবটা নাকচ ক'রে দিয়েছেন। নেলসন ফারিনা কিন্তু কখনোই হাল ছেড়ে দেয়নি, গত কয়েক বছর ধ'রে যখনই সুযোগ পেয়েছে তখনই, ততবারই, ভিন্ন কোনো ছুতোয় বা ওজরে ফিরে অনুরোধ জানিয়েছে। কিন্তু এবারে সে প'ড়ে রইলো দোলখাটিয়ায়, ক্যারি-বিয়নের বোম্বেটেদের সেই জলন্ত আড্ডায় জ্যান্ত ঝলসে মরবার জন্যে দণ্ডিত।

যখন সে শেষ হাততালি শুনতে পেলে, সে তার মাথা তুললো, বেড়ার কাঠগুলোর ওপর দিয়ে তাকিয়ে সে দেখতে পেলে রগড়টার, প্রহসনটার, পশ্চাদ্দেশ : বাড়িঘরের ঠেকনো, গাছগুলোর কাঠামো, গোপন মায়াবীরা—সমুদ্রগামী জাহাজটাকে যারা ঠেলে-ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। ঢং দেখে সে কোনো বিদ্বেষ ছাড়াই শব্দ ক'রে থুতু ফেললে।

'ম্যের্দ,' সে বললে, 'সে ল্য ব্লাকামেন দ্য লা পোলিতিক।' (যাঃ কলা, এ যে স্রেফ রাজনীতির ব্লাকামান।')

ভাষণের পর, দস্তুর অনুযায়ী, সেনাদোর শহরের রাস্তাগুলো দিয়ে হেঁটে গেলেন গানবাজনা আর পটকা ও হাউইয়ের মধ্য দিয়ে, শহরের লোকেরা তাঁকে চারপাশ থেকে আক্রমণ ক'রে কেবলই তাঁকে তাদের দুঃখের কাহন কাঁদুনি গেয়ে শোনালে। সেনাদোর সদাশয়ভাবেই তাদের সব কথা শুনলেন, আর এ-রকম সময়ে চিরকালই তাদের কোনো দুরূহ দাক্ষিণ্য দেখাবার ভড়ং ছাড়াই তিনি পেয়ে যান সবাইকে সান্ত্বনা জানাবার বাঁধা গৎ। এক স্ত্রীলোক দাঁড়িয়েছিলো তার বাড়ির ছাতে তার ছোটো ছজন ছেলেমেয়ে সমেত, আর সব কোলাহল আর বাজিপটকার মধ্যেও সে চেঁচিয়ে নিজের কথা শোনাতে পারলে।

'আমি বেশি-কিছু চাচ্ছি না, সেনাদোর,' সে বললে। 'শুধু একটা গাধা চাই—ফাঁসি-যাওয়ার কুয়ো থেকে জল আনবার জন্যে।'

ছ-ছজন রোগা টিংটিঙে ছেলেমেয়েকে তাকিয়ে দেখলেন সেনাদোর। 'তোমার মরদের কী হ'লো?' সেনাদোর জানতে চাইলেন।

'সে তার কপাল ফেরাতে গেছে আরুবা দ্বীপে,' স্ত্রীলোকটি খোশমেজাজেই জবাব দিলে। 'আর গিয়ে যা পেয়েছে সে হ'লো এক ভিনদেশী মাগি—সেই তাদেরই একজন যারা তাদের দাঁতেও হিরে বসায়।'

উত্তরটা একটা হাসির হররা তুললো।

'ঠিক আছে,' সেনাদোর ঠিক ক'রে ফেললেন : 'তুমি তোমার গাধা পেয়ে যাবে।'

একটু পরেই তাঁর এক অনুচর সেই স্ত্রীলোকের বাড়িতে একটা ভালোজাতের মালবওয়া গাধা নিয়ে এসে হাজির হ'লো আর মোছা-যায়-না এমন রঙে তার পাছায় লিখে দেওয়া হ'লো চুনাওয়ের একটা জিগির, যাতে কেউ কখনও না-ভোলে যে এটা স্বয়ং সেনাদোরেরই একটি উপহার।

রাস্তার ছোট্ট প্রসার ধ'রে তিনি এইরকম আরো অন্য ছোটোখাটো বদান্যতা

দেখালেন। একজন রুগী সবাইকে ধ'রে তার বিছানাটা নিয়ে এসেছিলো দরজার কাছে যাতে সেনাদোর রাস্তা দিয়ে যাবার সময় সে তাঁকে চর্মচক্ষে দেখতে পারে—সেনাদোর এমনকী তার মুখে এক দাগ ওষুধও ঢেলে দিলেন। শেষ মোড়টায়, বেড়ার কাঠগুলোর ফাঁক দিয়ে দেখলেন নেলসন ফারিনা শুয়ে আছে তার দোল-খাটিয়ায়, কী-রকম মনখারাপ আর ছাইধূসর দেখাচ্ছে তাকে, তবু সেনাদোর তাকে সম্ভাষণ জানালেন—ভাব-ভালোবাসার কোনো আদিখ্যেতা না-ক'রেই অবশ্য।

'এই-যে, কেমন?'

নেলসন ফারিনা তার দোলখাটিয়ায় পাশ ফিরে তার দৃষ্টির করুণ অম্বরে তাঁকে ভিজিয়ে দিলে।

'মোয়া, ভু সাভে (আমি, আপনি তো জানেনই),' সে বললে।

সম্ভাষণ শুনে তার মেয়ে বেরিয়ে এলো উঠোনে। সে পরেছিলো শস্তা রং-চটা গুয়াহিরো ইণ্ডিয়ান আংরাখা, রঙিন ফিতে দিয়ে বাঁধা তার মাথার চুল, রোদ্দুরের হাত থেকে মুখটিকে বাঁচাবার জন্যে তাতে ছিলো রং মাখা; তবু এমনকী, সেই বেমেরামতি দশাতেও এটা কল্পনা করা সম্ভব ছিলো যে সারা জগতে আর-কেউ অত সুন্দরী নয়। সেনাদোরের প্রায় দম আটকে গেলো। 'গোল্লায় যাবো আমি!' নিশ্বাসের ফাঁকে তিনি ফিশফিশ করলেন। 'প্রভু যে কত তাজ্জব ব্যাপারই ঘটান!'

সে-রাত্তিরে নেলসন ফারিনা তার মেয়েকে সাজালে তার সেরা পোশাকে, তারপর তাকে সেনাদোরের কাছে পাঠিয়ে দিলে। রাইফেলে সশস্ত্র দুই পাহারোলা ধার-করা বাড়িটার গরমে ঢুলছিলো, তারা তাকে সেনাদোরের ঘরের পাশে একমাত্র চৌকিটায় বসতে হুকুম করলে।

পাশের ঘরে সেনাদোর তখন রোসাল দেল্ ভিরেইয়ের মাতব্বরদের সঙ্গে ব'সে সভা করছেন: তাঁর বক্তৃতা থেকে যে-সব সত্য তিনি ছেঁটে বাদ দিয়েছিলেন সেগুলোই গেয়ে শোনাবেন ব'লে তাদের তিনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন। মরুভূমির অন্যান্য শহরে যে-ধরনের লোকের সঙ্গে তাঁর মোলাকাৎ হয়েছে, এদেরও সবাইকেই তাদের মতো এতই একরকম দেখতে যে সেনাদোরের নিজেরই এই চিরন্তন নৈশ আলোচনা সভা অসহ্য ও বিরক্তিকর ঠেকছিলো। তাঁর জামা ঘামে ভিজে সপসপ করছে, এক বিজলি পাখার গরম হাওয়ার হলকায় গায়েই তিনি জামাটা শুকোবার চেষ্টা করছেন—পাখাটা ঘরের ভারি গরমে ঘোড়ার নাদির ওপর নীল মাছির মতো গুঞ্জন করছে।

'বাহুল্য বলা যে আমরা কাগজের পাখি খেতে পারি না,' সেনাদোর বলছিলেন। 'আপনারা আর আমি, আমরা সবাই জানি যেদিন এই ছাগলের নাদির গাদায় গাছ গজাবে আর ফুল ফুটবে, যেদিন জলের গর্তগুলোয় কিলবিলে পোকার বদলে ইলিশমাছ পাওয়া যাবে, সেদিন আপনার আমার আর-কিছুই করার থাকবে না এখানে। কী? আমি স্পষ্ট বোঝাতে পারছি তো কথাটা?'

কেউ কোনো উত্তর দিলে না। কথা বলতে-বলতে সেনাদোর ক্যালেণ্ডার থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়েছিলেন, তা থেকে নিজের হাতেই তিনি বানিয়ে নিচ্ছিলেন এক কাগুজে প্রজাপতি প্রজাপতিটাকে বিশেষ কোনোদিকে তাগ না-ক'রেই তিনি শূন্যে ছুঁড়ে দিলেন, আর পাখার হাওয়ায় প্রজাপতিটা ফরফর ক'রে এলোমেলো উড়ে বেড়ালো ঘরে, তারপর আধখোলা দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলো। মৃত্যুর সঙ্গে যোগসাজশ হ'লে সবকিছুর ওপর যেমন দখল জন্মায়, তেমনি ভঙ্গিতেই সেনাদোর কথা ব'লে চললেন।

'সেইজন্যেই,' বললেন সেনাদোর, 'আপনাদের কাছে আমাকে নিশ্চয়ই ফিরে বলতে হবে না যে আপনারা সবকিছুই খুব ভালো জানেন: আমার পুনর্নির্বাচন আমার কাছে যতটা, আপনাদের কাছে সেটা তার চেয়েও বেশি লাভের ব্যাবসা—কারণ আমি এইসব বদ্ধ ডোবা আর ইণ্ডিয়ান ঘামে একেবারেই অসহ্য বোধ করছি—অথচ আপনারা, অন্যদিকে, তার ওপর নির্ভর ক'রেই টাকা কামাচ্ছেন, আখের গুছোচ্ছেন।'

লরা ফারিনা কাগজের প্রজাপতিটাকে উড়ে আসতে দেখলো। শুধু সে-ই তাকে দেখতে পেলো, কেননা এ-ঘরের শান্ত্রীরা সিঁড়ির ওপর তাদের রাইফেল-গুলো জড়িয়ে ধ'রে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। কয়েকবার ফরফর ক'রে ঘুরে, রাঙন ছাপানো প্রজাপতিটা পুরো ডানা খুলে, দেয়ালের গায়ে পুরোপুরি লেপটে বসলো—আর সেখানেই আটকে রইলো। লরা ফারিনা তার নোখ দিয়ে সেটাকে উপড়ে তোলবার চেষ্টা করলে। পাহারোলাদের একজন, পাশের ঘরে হাততালির শব্দ শুনে সে জেগে গিয়েছে, তার ব্যর্থ চেষ্টাটা তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলে।

'ও আর উঠবে না,' ঘুম-ঘুম গলায় সে বললে, 'ও তো দেয়ালে এঁকে দেয়া।'

লরা ফারিনা আবার তার চৌকিতে বসতে-না-বসতেই লোকজন সব সভা থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করলে। সেনাদোর দরজায় দাঁড়িয়ে, হাতটা খিলের ওপর; পাশের ঘরটা যখন একেবারে ফাঁকা হ'য়ে গেলো, শুধু তখনই তিনি খেয়াল করলেন লরা ফারিনাকে।

'তুমি এখানে কী করছো?'

'সে দ্য লা পার্ দ্য মঁ পের (এটা আমার বাবার কাণ্ড),' সে বললে।

সেনাদোর বুঝতে পারলেন। পাহারোলাদের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন তিনি, খুঁটিয়ে দেখলেন লরা ফারিনাকে—আপাদমস্তক; তাঁর সব ব্যথাবেদনার চাইতেও এই মেয়েটির অসাধারণ সৌন্দর্য যেন আরো নাছোড় দাবি জানাচ্ছে, আর তখনই তিনি ঠিক ক'রে ফেললেন যে তিনি নন বরং মৃত্যুই তাঁর হ'য়ে সমস্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে।

'এসো, ভেতরে,' তিনি বললেন তাকে।

ঘরের চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে লরা ফারিনা একেবারে অভিভূত হ'য়ে গেলো। হাজার-হাজার ব্যাঙ্কনোট পৎপৎ উড়ছে হাওয়ায়, তারা যেন পাখা নাড়ছে প্রজাপতিটার মতোই, কিন্তু সেনাদোর বোতাম টিপে পাখা বন্ধ ক'রে দিতেই নোটগুলি হাওয়া খুইয়ে ফরফর ক'রে ঘরের নানান জিনিশের ওপর এসে পড়লো!

'দেখলে তো,' তিনি বললেন, মুচকি হেসে। 'এমনকী গুও উড়তে পারে।'

লরা ফারিনা স্কুলের ছেলেদের একটা চৌকির ওপর ধপ ক'রে ব'সে পড়লো। টান-টান ও মসৃণচিক্কণ তার গায়ের চামড়া; খনির তেলের মতো রং টশটশ করছে, যেন তেমনি সৌর ঘনত্বে ভরপুর; তার মাথার চুল যেন কোনো তরুণ ঘোটকীর কেশরের মতো; আর ডাগর চোখগুলো আলোর চাইতেও উজ্জ্বল। সেনাদোর তার দৃষ্টির সুতো অনুসরণ ক'রে অবশেষে গোলাপটিকে দেখতে পেলেন, শোরা সেটায় এখন দাগ ধরিয়ে দিয়েছে।

'এটা একটা গোলাপ,' সেনাদোর বললেন।

'হ্যাঁ, জানি,' কেমন-একটু হতভম্বভাবেই বললে লরা ফারিনা। 'রিওআচায় থাকতেই জেনেছিলাম এগুলো কী ফুল।'

সেনাদোর একটি ফৌজি খাটিয়ায় ব'সে পড়লেন, জামার বোতাম খুলতে-খুলতে তিনি গোলাপ নিয়েই কথা ব'লে চললেন। তাঁর বুকের যেদিকটায় হৃৎপিণ্ড আছে ব'লে তিনি কল্পনা করেছিলেন, সেখানে—নৌবহরের জাহাজের কাপ্তেনদের বুকে যেমন উল্কি থাকে, তেমনি—একটা উল্কি দাগা: একটা হরতন এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় ক'রে একটা তীর চ'লে গিয়েছে। তাঁর ভেজা জামাটা মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলে তিনি লরা ফারিনাকে বললেন তাঁর বুটজোড়া খুলতে সাহায্য করতে।

খাটিয়ার মুখোমুখি নতজানু হ'য়ে বসলো লরা ফারিনা। সেনাদোর, চিন্তিতভাবে, তাকে খুঁটিয়ে দেখেই চলেছেন, আর সে যখন জুতোর ফিতে খুলছে, তিনি

মনে-মনে অনুমান করবার চেষ্টা করলেন এই দেখা-হওয়াটায় দুজনের মধ্যে কে-সে ভির্মি খেয়ে পড়বে দুর্ভাগ্যে।

'একেবারেই কচি মেয়ে তুমি,' তিনি বললেন।

'সেটা কিন্তু বিশ্বাস করবেন না,' সে বললে, 'এই এপ্রিলে আমি উনিশে পা দেবো।'

সেনাদোর হঠাৎ খুব কৌতূহলী হ'য়ে উঠলেন।

'কত তারিখে?'

'এগারো,' সে বললে।

সেনাদোর একটু ভালো বোধ করলেন। 'আমাদের দুজনেরই মেষরাশি,' তিনি বললেন। তারপর একটু হেসে যোগ করলেন:

'সেটা কিন্তু নিঃসঙ্গতার চিহ্ন।'

লরা ফারিনা এ-সব কথায় কোনো মনোযোগ দিচ্ছিলো না, কারণ সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলো না এই বুটজোড়া নিয়ে সে কী করবে। সেনাদোর আবার, তাঁর দিক থেকে, বুঝতে পারছিলেন না লরা ফারিনাকে নিয়ে তিনি কী করবেন, কারণ তিনি কোনোদিনই আকস্মিক প্রেমে-টেমে অভ্যস্ত নন, তাছাড়া তিনি জানেন নাগালের মধ্যে যে-মেয়েটি আছে তার জন্ম হয়েছিলো কলঙ্কে। ভাববেন ব'লে একটু সময় ক'রে নেবার জন্যে, তিনি লরা ফারিনাকে দুই হাঁটু দিয়ে চেপে ধরলেন, জড়িয়ে ধরলেন তার কোমর, তারপর চিৎ হ'য়ে শুয়ে পড়লেন তক্তপোশে। আর তখনই তিনি টের পেলেন তার পোশাকের তলায় মেয়েটি একেবারে নগ্ন, কারণ তার শরীর থেকে বনের কোনো জন্তুর মতো অন্ধকার ঝাঁজ বেরিয়ে আসছে—তবে তার হৃৎপিণ্ড কেঁপে উঠছে ভয়ে, আর গায়ের চামড়া এক হিমজমাট ঘামে ঘাবড়ে গিয়েছে।

'কেউ আমাদের ভালোবাসে না,' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সেনাদোর।

লরা ফারিনা কী যেন বলবার চেষ্টা করলে, কিন্তু শুধু শ্বাস নেবার মতোই হাওয়া পেলে সে সেখানে। তাকে একটু সাহায্য করবার জন্যে তাকে তিনি তাঁর পাশে শোয়ালেন, নিভিয়ে দিলেন আলো, আর ঘরটা গোলাপের ছায়ায় আচ্ছন্ন হ'য়ে গেলো। খুব ধীরে-ধীরে তাকে সোহাগ করলেন সেনাদোর, খুঁজলেন তাকে তাঁর আদর ভরা হাত দিয়ে, প্রায় যেন তাকে না-ছুঁয়েই, কিন্তু যেখানে তিনি তাকে খুঁজে পাবেন ব'লে ভেবেছিলেন, সেখানে লোহায়-তৈরি কী-একটা তাঁর সন্ধানী হাতকে আটকে দিলে।

‘ওখানে তোমার ওটা কী ?’

‘কুলুপ,’ সে বললে, ‘একটা তালা।’

‘এ আবার কোন জাহান্নাম !’ ক্ষিপ্ত সেনাদোর ব’লে উঠলেন, আর যা তিনি খুব ভালো ক’রেই বুঝতে পেরেছেন, সেই বিষয়টাই জিগেশ করলেন। ‘চাবি কই’ ?

লরা ফারিনা একটা স্বস্তির শ্বাস ছাড়লে।

‘চাবিটা বাবার কাছে,’ সে উত্তর দিলে। ‘বাবা বললেন আপনার কোনো লোক পাঠিয়ে তাঁর কাছ থেকে চাবিটা নিয়ে আসতে, আর সেই সঙ্গে একটা লিখিত প্রতিশ্রুতি পাঠাতে যে আপনি তার ঝামেলাগুলো মিটিয়ে দেবেন।’

টান-টান হ’য়ে গেলেন সেনাদোর। ‘ফরাশি বেজন্মা, ব্যাঙের বাচ্চা !’ ঘৃণায় আর রাগে বিড়বিড় করলেন তিনি। তারপর তিনি টান-টান ভাবটা কাটাবার জন্যে চোখ বুজলেন আর অন্ধকারে দেখা পেলেন নিজেরই। মনে রেখো, আর তিনি মনে ক’রে নিলেন, সে তুমিই হও বা অন্য-কেউই হোক, খুব বেশিদিন কাটবে না—তুমি ম’রে যাবে, আর বেশিদিন কাটার আগে তোমার নামটার অব্দি কোনো চিহ্ন থাকবে না।

শিহরনটা কেটে যাবার জন্যে তিনি সবুর করলেন।

‘আচ্ছা,’ তিনি তখন জিগেশ করলেন, ‘আমায় তুমি একটা কথা বলো। আমার সম্বন্ধে তুমি কী শুনেছো ?’

‘আপনি কি সত্যি-সত্যি জানতে চান ? ভগবানের নামে হলফ ?’

‘ভগবানের নামে হলফ—সত্যি কথা বলবে।’

‘বেশ, বলছি,’ লরা ফারিনা সাহস ক’রে এগুলো, ‘ওরা বলে, আপনি অন্য সবার চেয়েও অধম, কারণ আপনি আলাদা ধরনের মানুষ।’

সেনাদোর চ’টে গেলেন না। অনেকক্ষণ, চোখ বুজে, তিনি চুপ ক’রে রইলেন।

যখন তিনি আবার চোখ খুললেন, মনে হ’লো তিনি যেন তাঁর সব চাইতে গোপন প্রবৃত্তিগুলো থেকে ফিরে এসেছেন।

‘ওঃ, সে আর-কোন জাহান্নামের চাইতে বেশি হবে ?’ তক্ষুনি তিনি মনস্থির ক’রে নিলেন, ‘তোমার ঐ কুত্তির বাচ্চা বাপটাকে বোলো আমি তার ঝামেলাগুলো মিটিয়ে দেবো।’

‘আপনি যদি চান তো আমি নিজেই গিয়ে চাবিটা নিয়ে আসতে পারি,’ লরা ফারিনা বললে।

সেনাদোর তাকে আটকালেন।

'চাবি গোল্লায় যাক,' তিনি বললেন, 'তুমি আমার সঙ্গে একটু ঘুমোও। যখন তুমি অত একা তখন কেউ-একজন সঙ্গে থাকলেই ভালো।'

তখন লরা ফারিনা তার মাথা রাখলে তাঁর কাঁধে, তার চোখ দুটো আটকে আছে গোলাপের ওপর। সেনাদোর তার কোমর জড়িয়ে রইলেন, মুখ গুঁজলেন তার বনের-জন্তুর বগলে, আর নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিলেন আতঙ্কের কাছে। ছ-মাস এগারো দিন পরে, ঠিক ঐ ভঙ্গিতেই তিনি মারা যাবেন—লরা ফারিনাকে জড়িয়ে যে-কেচ্ছাটা রটবে তার জন্যে কাদায় লেপা আর পরিত্যক্ত, আর মারা যাবেন লরা ফারিনাকে ছাড়াই মরতে হচ্ছে ব'লে প্রচণ্ড আক্ষোভে কাঁদতে-কাঁদতে।

অলৌকিকের ফিরিওলা সাধু ব্লাকামান

প্রথম যে-রোববারটায় তাকে আমি দেখি আমার অমনি মনে হ'য়ে গিয়েছিলো এ যেন ষাঁড়ের লড়াইয়ের রিঙে কোনো-এক খচ্চর : সোনালি সুতো দিয়ে উলটো ফোঁড়ে শেলাই-করা তার শাদা গেলিস, তার প্রতিটি আঙুলে রঙিন পাথর বসানো আংটি, বিনুনির মতো পাকানো রেশমি সুতোগুলো থেকে ঝুলছে ঝুনঝুন ঘুন্টি, দাঁড়িয়ে আছে সান্তা মারিয়া দেল দারিয়েনের জাহাজঘাটায় একটা চৌকির ওপর, চৌকির চারপাশে ছড়ানো রাশি-রাশি বোয়মভর্তি টোটকা আর সান্ত্বনার জড়িবুটি যে-সব তার নিজেরই উদ্ভাবন, যা সে ফিরি ক'রে বেরিয়েছে ক্যারিবিয়নের শহরে-শহরে, বেদম চিল্লিয়েছে তার জখম গলায়, তবে একটাই তফাৎ ছিলো সে-বারে, সে ঐসব ইণ্ডিয়ান গ্যাঞ্জামের কিছুই বিক্রি করতে চাচ্ছিলো না, বরং বলছিলো তার কাছে সত্যিকার এক জ্যান্ত সাপ নিয়ে আসতে, যাতে সে সকলের চোখের সামনে হাতে-নাতেই দেখিয়ে দিতে পারে—হ্যাঁ-হ্যাঁ, নিজের গায়েই ছোবল খেয়ে—বিষ ঝাড়বার যে-প্রতিষেধক সে বার করেছে, একমাত্র মোক্ষম দাওয়াই, একমাত্র অব্যর্থ ওষুধ, সেনিওরা ও সেনিওরগণ, সাপ, মহানাগ, তারানতুলা, শতপদী পুচ্ছকণ্টককে তো বটেই, আরো যত-সব বিষাক্ত প্রাণী আছে, তাদেরও বিষ ঝেড়ে দেবার উপায়। তার এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞা দেখে একজন এতই বিমোহিত হ'য়ে পড়েছিলো যে সে কোত্থেকে একটা বোতলে ক'রে সবচেয়ে বজ্জাত একটা ঝোপরাজ সাপ (শ্বাসনালী বিষিয়ে তুলে মোক্ষম মারে যে-সাপ) নিয়ে এসে হাজির, আর অমনি এমনই সাগ্রহে সে বোতলের ছিপিটা খুললো যে আমরা সবাই ভেবেছিলাম সে বুঝি ওটাকে চিবিয়েই খেয়ে ফেলবে, কিন্তু যেই-না ঐ ঝোপরাজ টের পেলে যে সে আর আটকে নেই, লাফিয়ে বেরুলো বোতল থেকে আর ছোবলটা হানলো তার গর্দানে, আর সঙ্গে-সঙ্গে, তৎক্ষণাৎ, সে দাঁড়িয়ে রইলো হতবাক—বক্তৃতার জন্যে এক ফোঁটাও দম নেই, আর প্রতিষেধকটা গেলবার জন্যে টায়ে-টোয়ে একটুই মাত্র সময় ছিলো, তার জোব্বার জেব থেকে ওষুধগুলো গড়িয়ে পড়লো ভিড়ের মধ্যে, কেবল গড়াগড়ি খেলে সে মাটিতে, তার বিশাল বপু যেন ফোঁপরা হ'য়ে গেলো, যেন এটা একটা খোশা—ভেতরটায় কিচ্ছু নেই, তবু

দমফাটা হাসছিলো সে সারাক্ষণ, তার ঐ সোনার দাঁতগুলো কেলিয়ে। হল্লাটা এমন বেজায় জম্পেশ হ'লো যে উত্তরের যে-ক্রুজারটা সেই জাহাজঘাটায় শুভেচ্ছা-সফরে এসে কুড়ি বছর ধ'রে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়েছিলো, তারা তক্ষুনি ঘোষণা ক'রে দিলে সঙ্গরোধ যাতে ঐ সাপের বিষ জাহাজটায় গিয়ে উঠতে না-পারে, আর যারা তখন গির্জেয় ঈস্টারের আগের রোববারটায় ভজন গাইছিলো তারা ছুটে বেরিয়ে এলো তাদের জেরুসালেমের তালপাতা হাতে, কেননা কেউ-যে অমনভাবে টেঁশে যাচ্ছে তার ছটফটানির দৃশ্যটা দেখার লোভ কেউই সামলাতে পারেনি, সে এর মধ্যেই খাবি খেতে-খেতে ফুঁয়ে-ফুঁয়ে বার ক'রে দিচ্ছে মৃত্যুর হাওয়া, ফুলে-ফেঁপে আগের চাইতে দুনো নাদুশ হয়েছে সে, মুখ থেকে ছিটোচ্ছে পিত্তভরা ফেনা, আর তার প্রতিটি রোমকূপই যেন হাঁসফাঁস করছে, অথচ এখনও এতখানি কড়া জান নিয়ে দমকে-দমকে হেসেই চলেছে যে ঝুনঝুন ঘুন্টিগুলো তার সারা শরীরেই বেজে উঠছে। ফোলাটা তার পায়ে হাঁটু-অব্দি-ওঠা জুতোর ফিতের বাঁধন ঘ-শ ক'রে ছিঁড়ে ফেললো, ফেটে গেলো তার জামার জোড়গুলোর শেলাই, আংটিগুলোর চাপে তার আঙুলগুলো হ'য়ে উঠলো নীললোহিত, শরীরে ফুটে উঠলো নুনজলে জারানো হরিণের মাংসের রং, আর তার পশ্চাদ্দেশ থেকে একটা সশব্দ ইঙ্গিত এলো মৃত্যুর শেষ মুহূর্তের, সেটা এমনই যে সাপে ছোবলালে কী হয় তা যারা আগে দেখেছে তারা বুঝতে পারলে যে অক্কা পাবার আগেই সে প'চে যাচ্ছে, সে এমনই বেমক্কা ভেঙেচুরে যাবে যে শেষকালে তাদের তাকে বেলচা দিয়ে তুলতে হবে বস্তায়, তবে তারা এও ভাবলো যে তার এই কাঠের গুঁড়োর মতো দশাতেও—দ্যাখো কেমন—সে বেদম হেসেই চলেছে। এটা এতই উৎকটরকম অবিশ্বাস্য যে নৌবহরের সেপাইরা এসে দাঁড়ালে ডেকের ওপর, দূরায়নী লেন্‌স দিয়ে তার রঙিন ছবি তুলবে ব'লে; কিন্তু গির্জে থেকে যে-মেয়েরা বেরিয়ে এসেছিলো তারা এদের মৎলবটায় বাধ সাধলে মুমূর্ষুকে তক্ষুনি একটা কম্বলে ঢেকে ফেলে, আর পূত ও পবিত্র তালপাতাগুলো রাখলে তার ওপরে, কেউ-কেউ মোটেই চায়নি নৌসৈন্যেরা তাদের ম্লেচ্ছ যন্তরগুলো দিয়ে কলঙ্কিত করুক তার শরীর, অন্যরা একটু ভয়ই পাচ্ছিলো সেই পৌত্তলিকটির দিকে তাকাতে—হেসে-হেসেই যে খুন হ'য়ে যেতে তৈরি, আর আরো অন্যরা ভেবেছিলো এইভাবে অন্তত তার আত্মাটা বিষাক্ত হ'য়ে উঠবে না। সব্বাই যখন সে অক্কা পেয়েছে ব'লে ধ'রে নিয়েছে, তখন সে একহাতে তালপাতাগুলো সরিয়ে, তখনও তার কেমন হতভম্ব ঘোর, ঐ বিষম মুহূর্তটার জের তখনও তার পুরোপুরি কাটেনি, অথচ তবু সে

অন্য-কেউ হাত না-লাগালেও একাই চৌকিটাকে খাড়া ক'রে দিলে, কাঁকড়ার মতো তাতে সে বেয়ে উঠলো আবার, আর ফের সে ঐখানে, হেঁকে বলছে তার ঐ প্রতিষেধক আসলে আর-কিছুই না, স্রেফ বোতলভর্তি ভগবানের হাতই, আমরা তো সবাই দেখেছি নিজের চোখেই, তবে এর দাম মাত্র দুই কুয়ারতিয়ো, কারণ সে বেচে মুনাফা লোটবার জন্যে এটা বানায়নি বরং মানবজাতির মঙ্গলের জন্যেই সে বানিয়েছে, আর সে এই কথা বলবামাত্র, সেনিওরা ও সেনিওরগণ, আমি চাই না যে আপনারা হুড়োহুড়ি ক'রে ভিড় বাড়িয়ে গ্যাঞ্জাম করুন, কারণ এখানে যত ওষুধ আছে তাতে সকলেরই কুলিয়ে যাবে।

তারা যে ভিড় এবং গ্যাঞ্জাম দুটোই করলে, সে তো বলাই বাহুল্য, আর ক'রে ভালোই করেছিলো, কারণ শেষটায় কিন্তু ঐ গরলনাশায় মোটেই সকলের কুলোয়-নি। এমনকী ক্রুজারের ঐ সেনাধ্যক্ষ, অ্যাডমিরাল স্বয়ং, একটা আস্ত বোতল কিনে নিলেন, তার আগে অবশ্য সে তাঁকে বিশ্বাস করিয়েছে যে এতে নৈরাজ্যবাদীদের বিষাক্ত বুলেটেও ফল পাওয়া যাবে, আর নৌসেনারা শুধু চৌকির-ওপর-দাঁড়ানো তার রঙিন ছবি তুলেই পালিয়ে যায়নি,—সে যখন মরেছিলো সে ছবি তো তারা কেউ নিতেই পারেনি—তবে তাকে দিয়ে তারা ছবিগুলোয় এতই স্বাক্ষর করালে যে আর হাতটাই খিল ধ'রে গিয়ে কেমন বেঁকেচুরে গেলো। ওদিকে রাত্তির হ'য়ে আসছে, আর শুধু সবচেয়ে-বোমকে-যাওয়া আমরাই আছি জাহাজঘাটায়, যখন তার চোখ খুঁজে বেড়ালে যেন কাউকে, হয়তো কোনো গাড়লকে, যে এতই হাবাগোবা যে তাকে সে তুকতাকের বোতলগুলো সাজিয়ে রাখতে হাত লাগাবে, আর স্বভাবতই সে আমাকে দেখে ফেললে। এ যেন ভবিতব্যেরই দৃষ্টি, নিছক আমার নয়—তারও, কারণ সে ছিলো তো শতাব্দীরও আগে, আর আমাদের দুজনেরই তা মনে ছিলো, যেন তা ঘটেছে গত রোববারে। হয়েছিলো কী, আমরা যখন তার ঐ সার্কাসের টোটকা ও জড়িবুটি নীললোহিত ফিতে লাগানো তোরঙ্গে ভরছি—সেটাকে মোটেই কোনো হাতুড়ের নয়, বরং কোনো পণ্ডিতের সিন্দুকের মতোই দেখাচ্ছিলো—তখন সে নিশ্চয়ই আমার মধ্যে কোনো জ্যোতির স্ফুরণ দেখে ফেলেছিলো—সে তো আর আমাকে আগে কখনও দ্যাখেনি—কারণ সে আমায় কেমন-একটা বিদঘুটে ঘ্যানঘেনে গলায় জিগেশ করলে তুমি কে বট হে, আর আমি উত্তর দিলাম আমি মা-বাপ দু-দিক থেকেই অনাথ, যদিও আমার বাবা অবশ্য তখনও মারা যাননি। সে-কথা শুনে সে এত জোরে এমন হো-হো ক'রে হেসে উঠলো, তেমন হো-হো সে তার শরীরে বিষ ঢোকবার পরেও হাসেনি; তারপর সে আমায় জিগেশ করলে কী

করো হে তুমি, জীবিকা কী, আর আমি বললাম নিছক টিঁকে-থাকা ছাড়া আমি আর-কিছুই করি না, কেননা আর-কিছু করতে গেলেই এত ঝামেলা বাধে যে সে-সব করার কোনোই মানে হয় না, আর হাসির দমকে-দমকে তখনও চোখের জল ফেলতে-ফেলতে সে আমায় জিগেশ করলে পৃথিবীতে তুমি কোন বিজ্ঞানটা সবচেয়ে বেশি ক'রে শিখতে চাও, আর একমাত্র তখনই আমি কোনো গড়িমসি না-ক'রে জবাব দিয়েছিলাম, আমি জ্যোতিষী হ'তে চাই, বলতে চাই লোকের ভবিষ্যৎ, আর সে-কথা শুনে সে আর হাসেনি, তবে আমায় বলেছিলো—যেন সশব্দেই চিন্তা করছে—যে সেজন্যে আমার তবে বেশি-কিছু চাই না, কারণ আমি নাকি এর মধ্যেই এমন জিনিশ শিখে গিয়েছি যা শেখা সবচেয়ে কঠিন, অর্থাৎ আমার আছে হাবা-গোবা মুখ। সেই একই রাত্তিরে সে আমার বাবার সঙ্গে কথা বললে, আর একটা রেয়াল আর দুটি কুয়ারতিইয়ে, আর ব্যভিচার ব'লে দিতে এমন-এক প্যাকেট তাশের বিনিময়ে সে আমায় সারা জীবনের জন্যে কিনে নিলে।

এইরকমই ছিলো ব্লাকামান, অর্থাৎ যে-ব্লাকামান অসৎ, অসাধু, ফেরেব্বাজ—কেননা আমিই হচ্ছি সাধু ব্লাকামান। সে ইচ্ছে করলে কোনো জ্যোতির্বিজ্ঞানীকেও বুঝিয়ে দিতে পারতো যে ফেব্রুয়ারি মাসটা আসলে অদৃশ্য এক হাতির পাল ছাড়া আর-কিছু নয়, তবে সৌভাগ্য যখন তাকে পেছন দেখালে সে হ'য়ে উঠলো আদ্যোপান্ত এক হৃদয়গভীর জানোয়ার। তার রমরমার দিনে সে বড়োলাটদের মৃতদেহে মলম মাখাতো, আর লোকে বলে সে তাঁদের মুখগুলোকে এমনই রাশভারি কর্তৃত্বের ছাপ দিতো যে মৃত্যুর পরও অনেক বছর ধ'রেই তাঁরা ভালোভাবে শাসনকাজ চালিয়ে যেতেন—বেঁচে থেকে যেমন শাসন করতেন তার চাইতেও নাকি ভালো, আর তখন কেউই তাঁদের গোর দিতে চাইতো না—অন্তত ততক্ষণ নয় যতক্ষণ-না সে তাঁদের মরা মুখগুলো ফিরিয়ে দিচ্ছে; কিন্তু তার মানসম্মান ইজ্জৎপ্রতিপত্তি সবই ধুলোয় লুটোলো যখন সে এমন-এক শতরঞ্জ খেলা উদ্ভাবন ক'রে বসলো যার কোনোই শেষ নেই, আর সে-খেলা শেষটায় এক পারিবারিক যাজককে পাগল ক'রে তুললে, আর দু-দুটো সুবিখ্যাত আত্মহত্যার কারণ হ'লো, ফলে তার পতন শুরু হ'য়ে গেলো, স্বপ্নের মানে কী বলবার বদলে এখন তাকে গিয়ে লোকের জন্মদিনে সম্মোহন বা বশীকরণ করতে হয়, কেবল ইঙ্গিতেই মাঢ়ির দাঁত উপড়ে ফেলার বদলে সে হ'য়ে উঠলো হাটবাজারের হাতুড়ে: সেইজন্যেই, আমাদের যখন দেখা হ'লো, লোকে তখনই তার দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছে, এমনকী বোম্বেটেরা অব্দি। আমাদের এই ভোজবাজির মঞ্চটা নিয়ে আমরা ভেসে বেড়াতে লাগলাম,

আর জীবন হ'য়ে উঠলো নিত্য অনিশ্চয়, বিশেষত আমরা যেহেতু চম্পটবটিকা—ঐ যে মলদ্বারে গোঁজবার মতো শাঙ্কাবাকার ভেষজ—বিক্রি করতে চাচ্ছিলাম যেটা ব্যবহার করলে চোরাচালানকারীরা স্বচ্ছ হ'য়ে ওঠে, কিংবা বেচতে চাচ্ছিলাম গুপ্ত বটিকা, বাপ্তিস্ম হয়েছে এমন স্ত্রীরা যা তাদের ওলন্দাজ স্বামীদের জন্যে রান্না-করা সুরুয়ায় দিতো যাতে তাদের মধ্যে ভগবানের ভয় জেগে ওঠে; আর স্বেচ্ছায়, স্বাধীনভাবে, যা-ই আপনারা কিনতে চান না কেন, সেনিওরা ও সেনিওরগণ, তা-ই কিনতে পারবেন, কারণ এ তো আর অনুশাসন বা অনুজ্ঞা নয়, নিছকই পরামর্শ, তাছাড়া সুখও শেষ অব্দি কোনো বাধ্যতামূলক ব্যাপার নয়। তৎসত্ত্বেও, তার রঙ্গ ও রগড়ে যতই আমরা হেসে খুন হই না কেন, সত্যি কথাটা এই-যে দু-বেলা খাবার জোটানোও আমাদের পক্ষে রীতিমতো কঠিন হ'য়ে প'ড়েছিলো, অবশেষে তার শেষ ভরসাটা ছিলো আমার ভাবীকথকের বৃত্তি। জাপানির ছদ্মবেশ পরিয়ে সে আমাকে একটা কফিনের মতো তোরঙ্গে আটকে রাখতো, তোরঙ্গটা থাকতো জাহাজের গলুইয়ের ডান দিকের শেকল দিয়ে বাঁধা, যাতে ঐ তোরঙ্গের মধ্য থেকেই আমি ব'লে দিতে পারি ভবিষ্যতে কী ঘটবে, আর এই ফাঁকে সে তন্নতন্ন ক'রে সাবাড় করতো ব্যাকরণপুথি যাতে আমার এই নূতন বিজ্ঞান বিষয়ে জগৎকে সে বিশ্বাস করাবার সেরা কথাগুলো পেয়ে যায়, আর এখানেই, সেনিওরা ও সেনিওরগণ, জেনে রাখুন আপনার ঐ বাচ্চাকে সারাক্ষণ জ্বালায় এজেকিয়েলের জোনাকিরা, আর ঐ-যে মুখে অবিশ্বাসের হাসি নিয়ে আপনারা যাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন, দেখি-তো আপনাদের এ-কথা জিগেশ করবার মুরোদ কবে হবে কিনা কখন আপনারা মরতে চলেছেন, কিন্তু আমি তো তোরঙ্গের মধ্যে এমনকী এটাও অনুমান করতে পারতাম না সেদিন সেটা কত তারিখ, তাই সে শেষকালে ঠিক করলে আমাকে দিয়ে ঐ ভাবীকথকের কাজটা হবে না, কারণ জোর তোমার ভাবীকথক গ্রন্থিকে জট পাকিয়ে দেয়, আর সৌভাগ্যের জন্যে আমার মাথায় ঝাপ্পড় মেরে, সে ঠিক করলে আমাকে সে আবার আমার বাবার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে টাকাটা ফেরৎ চাইবে। তবে সে-সময়ে সে দৈবাৎ জেনে ফেললে শোকদুঃখের বিদ্যুতের একটা ব্যাবহারিক প্রয়োগ, আর সে একটা শেলাইকল উদ্ভাবন করতে লেগে গেলো—শরীরের যেখানটায় ব্যথাবেদনা সেখানটায় রক্তশোধক কাচ লাগিয়ে তার সঙ্গে হাপরটা জুড়ে দিলেই নাকি কলটা চলবে। যেহেতু আমি রাত কাটাতাম তার বেধড়ক মারধোরে কেঁদে-ককিয়ে—সে আমায় পেটাতো এই জন্যেই যাতে দুর্ভাগ্য-কে ঝেড়ে ফেলা যায়, ভূত ভাগিয়ে দেয়া যায়—তাই তার আবিষ্কারটায় কোনো

কাজ হচ্ছে কি না সেটা পরখ ক'রে দেখবার জন্যে আমাকেই তাকে রাখতে হ'লো, আর তাই আমাদের ফেরৎ-আসাটা বিলম্বিত হ'য়ে গেলো. আর সেও ক্রমে-ক্রমে ফিরে পাচ্ছিলো তার রঙ্গ-রগড়ের মেজাজ, আর শেষটায় শেলাইকলটা এতই ভালো কাজ করলে যে সে যে কেবল নবীশ সন্ন্যেসিনীদের চাইতেও ভালো শেলাই করতে পারতো তা নয়, কাপড়ের ওপর সে এমনকী পাখি বা আকাশের তারা বুনে দিতে পারতো—ব্যথাটা ঠিক কোনখানে আর কতটা জোরালো ঠিক তারই সঙ্গে তাল রেখে। দুর্ভাগ্যটাকে জিতে গিয়েছি এই বিশ্বাস নিয়ে এ-সবই করছিলাম আমরা, এমন সময় আমাদের কাছে খবর এসে পৌঁছুলো যে ক্রুজারের নৌ-অধ্যক্ষ ঐ প্রতিষেধকটা দিয়ে পরীক্ষাটা ফের নাকি চালাতে গিয়েছিলেন ফিলাডেলফিয়ায়, আর তারপর নাকি তাঁর অধস্তন কর্মচারীদের সামনেই নৌ-অধ্যক্ষ একদলা মোরব্বায় বদলে গিয়েছেন।

অনেকদিন ধ'রে, তারপর, সে আর হাসেনি। আমরা চোঁ-চাঁ পালিয়ে গেলাম ইণ্ডিয়ানদের যত গিরিসংকট আর নয়ানজুলি দিয়ে, আর যতই আমরা পথ হারাই ততই স্পষ্ট হ'য়ে সঙিন খবরটা এসে পৌঁছোয় আমাদের কাছে : মার্কিন নৌবহর নাকি দেশ থেকে হলদি জর নির্মূল করবার ছলছুতোয় দেশটাকে আক্রমণ করেছে, আর যারাই বাটি-গেলাশ-কলশি বানায়—সে তারা অনেক কাল ধ'রেই ব্যাবসা চালাক বা ভবিষ্যতে কোনোদিন এই ব্যাবসা আবার চালাতে পারে—তাদের সবাইকার মুণ্ডু উড়িয়ে দিচ্ছে, কাউকে রেহাই দিচ্ছে না রাস্তায়, আর 'সাবধানের মার নেই' ভেবে শুধু যে নেটিভদের গলা কাটছে তা-ই নয়, মনটাকে অন্যখাতে বইয়ে দেবার জন্যে মুণ্ডু ওড়াচ্ছে চিনেদের, অভ্যাসবশেই কোতল করছে কালা আদমিদের, আর হিন্দুদের মারছে এই ব'লে যে তারা নাকি সাপের খেলা দেখায়, তারপর তারা উড়িয়ে দিলে যাবতীয় উদ্ভিদ ও প্রাণী, লোপাট ক'রে দিলে সব খনিজ সম্পদ—যতটা পারলো ততটাই—কারণ আমাদের ব্যাপার-স্যাপারে যারা তাদের বিশেষজ্ঞ তারা তাদের শিখিয়েছে যে নিছক গ্রিঙ্গোদের ধ্যানধারণায় জট পাকিয়ে দেবার জন্যেই নাকি ক্যারিবিয়নের লোকজন ভেলকির মতো, রাতারাতি, তাদের স্বভাব বা প্রকৃতি অনায়াসেই বদ্‌লে ফেলতে পারে। যতক্ষণ-না লা গুয়াহিরার নিত্য বাতাসের মধ্যে নিরাপদে অটুট গিয়ে পৌঁছুলাম, আমি বুঝতেই পারিনি ঐ খ্যাপা আক্রোশটা ঠিক কোত্থেকে এলো অথবা আমরাই বা ভয়ে এতটা কুঁকড়ে যাচ্ছি কেন, আর শুধু তখনই আমার কাছে সব কথা ফাঁস ক'রে দেবার সাহস পেলে সে, ঐ প্রতিষেধক নাকি রেউচিনিলতা আর তার্পিন তেলের মিশোল ছাড়া আর-কিছুই

না, আর সে নাকি এক বেকার ভবঘুরেকে দুই কুয়ারতিয়ো দিয়েছিলো সব বিষ ঝেড়ে ফেলে একটা ঝোপরাজকে ধ'রে আনতে। তখন আমরা গিয়ে উঠেছি ঔপনিবেশিক আশ্রমের একটা ধ্বংসস্তূপে, নিজেদের মধ্যে এই আশাতেই বিভ্রম জাগিয়েছিলাম যে কোনো-না-কোনো চোরাচালানি নিশ্চয়ই এখান দিয়ে যাবে, কারণ বিশ্বাস যদি কাউকে করা যায় তো এদেরকেই, একমাত্র এরাই পারাওঠানো সূর্যের তলায় ঐ নুনেভরা সমভূমিতে বেরিয়ে পড়ার তাকৎ রাখে। গোড়ায় আমরা খাচ্ছিলাম গোসাপ-পোড়া আর সেই ধ্বংসস্তূপের ফুলপাতা, আর যখন আমরা জুতোর ফিতের চামড়া খাবার চেষ্টা করেছিলাম তখনও আমাদের হাসা-হাসি করবার মতো ক্ষমতা ছিলো : শেষটায় আমরা চৌবাচ্চা থেকে জোলো-মাকড়শার জাল অব্দি খেয়েছিলাম, আর শুধু তখনই বুঝতে পেরেছিলাম জগৎটাকে আমরা কতটা হারিয়েছি। সে-সময় আমি ঠিক জানতাম না মৃত্যুর বিরুদ্ধে কোন-কোন পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়, তাই আমি নিছক শুয়ে প'ড়েই মৃত্যুর অপেক্ষা করছিলাম, ভাবছিলাম এইভাবে মৃত্যু হয়তো আমায় কম ব্যথা দেবে ; আর সে তখন কোন এক মেয়েকে একটানা প্রলাপ বকছে, মেয়েটি নাকি এমনই নরমকোমল ছিলো যে নিছক দীর্ঘশ্বাস ফেলেই সে দেয়ালের মধ্য দিয়ে চ'লে যেতে পারতো, কিন্তু তার সেই বানিয়ে-তোলা স্মৃতিটাও ছিলো বিরহ দিয়ে মৃত্যুকে ধাপ্পা দেবার একটা চাল। তবু, সেই মুহূর্তে, আমাদের যখন ম'রেই যাবার কথা, তাকে আমার ঠেকলো আগের চাইতেও আরো-অনেক জ্যান্ত, সে তাকিয়ে-তাকিয়ে সারা রাত ধ'রে আমার যন্ত্রণা দেখে যেতো, এমনই বিপুল ছিলো তার শক্তি যে আমি এখনও ভেবে উঠতে পারিনি এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে শিস দিয়ে যা ব'য়ে যেতো তা কি হাওয়া না কি তার ভাবনারা, আর ভোর হবার আগে একবার সে আগেকার মতোই দৃঢ় স্বরে বললে যে এখন সে সত্যি কথাটা জানে, আমিই আসলে আবার তার ভাগ্যকে দুমড়ে-মুচড়ে পাক খাইয়ে দিয়েছি, কাজেই তোমার পাৎলুন প্রস্তুত করো বাপু, কারণ যেভাবে তুমি আমার ভাগ্যটায় জট পাকিয়ে দিয়েছো, ঠিক তার উলটো মোচড়ে সেটার পাক খুলে তোমায় সরলসোজা ক'রে দিতে হবে।

ঠিক তখনই আমি তার জন্যে আমার মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ যে-ভাবভালোবাসা ছিলো সব আমি হারিয়ে বসলাম। শেষ যে-ছেঁড়া কাপড়-চোপড় আমি প'রেছিলাম সে সেগুলো খুলে নিলে, আমাকে গড়িয়ে পাক খাইয়ে জড়িয়ে দিলে কতগুলো কাঁটাতারে, ঘাগুলোর মধ্যে ঘ'ষে দিলে পাথুরে নুন, আমাকে চুবিয়ে রাখলে লোনা জলে—আমার নিজের পেচ্ছাবেই, আমাকে ঝুলিয়ে রাখলে মুণ্ডু-তলায়-পা-ওপরে

রোদ্দুর যাতে আমায় চাবকাতে পারে, তার ওপর সারাক্ষণ চেঁচিয়ে বলতে লাগলো অতখানি শারীরিক নিগ্রহও নাকি তার পশ্চাদ্ধাবনকারীদের শান্ত করতে পারছে না। শেষটায় সে আমাকে ছুঁড়ে ফেললো অনুতাপীদের অন্ধকূপে যাতে নিজের দুর্দশার মধ্যেই আমি পচি, সেই অন্ধকূপে এককালে আশ্রমিকেরা বিধর্মীদের শোধন করতো, আর কোনো হরবোলার বেইমানি নিয়ে—এখনও তার সেই ক্ষমতা যথেষ্টই ছিলো—সে নকল ক'রে ডেকে শোনাতে লাগলো সুখাদ্য প্রাণীদের সুবচন, পাকা বীটগাজরের শোর, টাটকা জলঝর্নার ধ্বনি যাতে আমাকে সে এই কুহক দিয়ে পীড়ন করতে পারে যে স্বর্গসুখের ঠিক মধ্যটায় আমি মরতে চলেছি খাদ্যাভাবে, অনাহারে। চোরা-চালানকারীরা শেষকালে যখন তাকে রসদ জোগালে, সে সেই অন্ধকূপে এসে আমাকে কী যেন খেতে দিলে—যাতে আমি একেবারে ম'রে না-যাই, কিন্তু এই বদান্যতার জন্যে আমায় তাকে বেদম মাশুল দিতে হ'লো, চিমটে দিয়ে সে টেনে-টেনে তুললো আমার নোখ, দাঁত ভ'রে দিলে শান পাথরে, আর সেই দশায় আমার একমাত্র সান্ত্বনা ছিলো এটাই যে জীবন একদিন আমাকেও সময় দেবে সুযোগ দেবে যাতে এই জঘন্য কেলেঙ্কারির শোধ তুলতে পারি আমি—এর চেয়েও অধম শহিদত্ব দিয়ে সবকিছুর নিশেবনিকেশ করতে পারি। আমি যে এখনও আমার নিজের শটন-পচনের মড়কটা ঠেকাতে পারছি তাতেই আমি তাজ্জব হ'য়ে গেলাম, আর সে কেবলই ছুঁড়ে-ছুঁড়ে দিতে লাগলো তার খাবারের ভুক্তাবশেষ ও উচ্ছিষ্ট, কোণায়-ঘামচিতে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে দিলে পচা গিরগিটি আর মরা বাজপাখি যাতে এই অন্ধকূপের বিষহাওয়া শেষটায় আমায় গরলে ভরিয়ে দেয়। এভাবে যে কতদিন কেটেছিলো তার কোনো ধারণাই আমার নেই, তারপর একদিন সে একটা মরা খরগোশ এনে আমায় দেখাতে চাইলো যে আমাকে সেটা খেতে দেবার বদলে সেটাকে বরং ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারলেই তার পছন্দ হবে ; কিন্তু আমার ধৈর্য শুধু অদ্দুরই গিয়েছিলো, আমার মধ্যে শুধু যা বাকি ছিলো তা হ'লো বিদ্বেষজালা, কাজেই খরগোশটা পাকড়ে ধ'রে আমি দেয়ালে ছুঁড়ে মারলাম এই বিভ্রমে যে এ যেন খরগোশ নয়, বরং সে-ই স্বয়ং ফেটে পড়বে এখন, আর তারপরেই তা ঘ'টে গেলো, যেন কোনো স্বপ্নের মধ্যে। খরগোশটা যে শুধু আতঙ্কের একটা ঝালাপালা-করা আর্তনাদ ক রেই বেঁচে উঠলো তা নয়, হাওয়ায় লাফঝাঁপ খেতে-খেতে সে সোজা আমার হাতে এসে পড়লো।

এইভাবেই শুরু হয়েছিলো আমার দুর্দান্ত, পরাক্রান্ত, জীবন। সেই থেকে আমি সারা জগৎটা চ'ষে বেড়িয়েছি : দু-পেসো নিয়ে ম্যালেরিয়ারোগীদের শরীর থেকে জ্বর ভাগিয়ে দিয়েছি, সাড়ে-চার পেসোয় দৃষ্টি দিয়েছি অন্ধদের, আঠারো

পেসোয় শোথরোগীদের শরীর থেকে নিংড়ে বার ক'রে দিয়েছি জল, কুড়ি পেসোয় আস্ত ও সুঠাম ক'রে দিয়েছি পঙ্গু ও বিকলাঙ্গদের—যদি অবশ্য তারা জন্ম থেকেই পঙ্গু বা বিকলাঙ্গ হয়, আর বাইশ পেসো নিয়েছি যদি তারা নুলো ও ঠুটো হ'য়ে থাকে কোনো দুর্ঘটনায় বা কোনো দাঙ্গাহ্যাঙামায়, পঁচিশ নিয়েছি যদি তাদের সে-হাল হ'য়ে থাকে যুদ্ধে, ভূমিকম্পে বা পদাতিক বাহিনীর হানায়, অথবা অন্য-যে-কোনোরকম জনদুর্ভোগে, বিশেষ ব্যবস্থা ক'রে পাইকিরি হারে সেই সঙ্গে যত্ন করেছি সাধারণ রোগীদের, পাগল সারিয়েছি সে কী নিয়ে পাগল এটা শুনে, ছোটোদের জন্যে আদ্ধেক দাম, আর হাবাগোবাদের সারিয়েছি নিছক কৃতজ্ঞতাবশেই, আর কার এত সাহস হবে বলুক শুনি যে আমি দান-হিত করি না, সেনিওরা ও সেনিওরগণ, আর এখন, হ্যাঁ, সেনিওর, বিংশতি নৌবহরের অধ্যক্ষ মহোদয়, বলুন আপনার স্যাঙাৎদের সব অবরোধ তুলে নিতে, এ-পথ দিয়ে যেতে দিন দীনদুঃখী দুর্গতদের, কুষ্ঠরোগীরা বাম দিক দিয়ে, মৃগীরোগীরা ডান দিক দিয়ে, নুলোঠুটোরা যাবে সেখান দিয়ে যেখানে তারা কারু পথ আটকাবে না, আর পেছনে থাকবে সে-সব মক্কেল যাদের মামলাটা অত জরুরি নয়, শুধু অনুগ্রহ ক'রে আমার চারপাশে ভিড় জমাবেন না, কারণ তাহ'লে যদি অসুখবিসুখগুলো মিলেজুলে গিয়ে জট পাকিয়ে—আমি কিন্তু দায়ী থাকবো না, আর যে-রোগ নেই সেই রোগ আর লোকদের সারাতে হবে না, আর বাজান, বাজান, বাজিয়ে চলুন গান যতক্ষণ-না টগবগ ফুটে ওঠে বোতল, আর যত পারেন ছুঁড়ুন হাউই-পটকা-আতশবাজি যতক্ষণ-না দেবদূতেরা পুড়ে যায়, আর ব'য়ে যাক মদিরা ও সুরা যতক্ষণ-না ভাবনাচিন্তা ম'রে যায়, আর নিয়ে আসুন ডবকা ছুঁড়ি আর দড়ির বাজি দেখানেওলাদের, নিয়ে আসুন কশাই আর ছবিওলা, সব আমারই খরচে, সেনিওরা ও সেনিওরগণ, কারণ এখানেই ট্যাড়া প'ড়ে গেলো ব্লাকামানদের বদনামে আর শুরু হ'লো জগৎজোড়া হুলুস্থুল। যদি কখনও আমার বিচারবুদ্ধি ভির্মি খায় আর কেউ-কেউ আগের চাইতেও বিগড়ে গিয়ে আমার ওপরেই ঝাঁপিয়ে পড়ে তাই আমি ঘুম পাড়িয়ে দিই সেনাদোরদের সব কূৎকৌশলকে। একমাত্র যা আমি করি না তা হ'লো, আমি মরা মানুষ বাঁচাই না, কারণ যেই তারা চোখ খোলে অমনি খুনেডাকাতেরা চ'টে-ম'টে অস্থির হ'য়ে ওঠে—তাদের ঐ দশাকে বিগড়ে দেবার জন্যে, যা-ই করুন-না কেন যারা আত্মহত্যা করে না তারা সবাই ফের ম'রে যায় মোহভঙ্গের ফলে। আমার শিল্পের বৈধতা সন্ধানের জন্যে গোড়ার দিকে একদল জ্ঞানীগুণী আমার পেছন নিয়েছিলো, পরে যখন নিঃসংশয় হ'লো তারা আমায় ভয় দেখালে আমাকে নাকি সিমোন মাগুস-এর মতো নরকবাস করতে

হবে, আর আমার জন্তে তারা অনুমোদন ক'রে দিলে অনুতাপীর জীবন—যাতে পরে আমি সান্তো হ'য়ে যেতে পারি, কিন্তু আমি তাদের উত্তর দিলাম, উঁহু, না, তাদের কর্তৃত্ব সম্বন্ধে কোনো কটাক্ষ না-ক'রেই বললাম যে আমি ঠিকভাবেই আমার কাজকারবার শুরু করেছি। সত্য কথাটা এই-যে, বলুন তো মরবার পরে সান্তো-টান্তো হ'য়ে আমার আর কোন ফায়দা হবে, আমি তো আসলে একজন শিল্পী, এবং আমি শুধু চাই বেঁচে থাকতে যাতে আমি নিতান্তই গাধাদের স্তরে সারাক্ষণ চলতে পারি ছয়-সিলিণ্ডারের সফরি গাড়িতে, গাড়িটা আমি নৌবহরের কনসালের কাছ থেকে কিনে নিয়েছি, এমনকী তার এই ত্রিনিদাদীয় শোফেয়ার সমেত যে এককালে নিউ-অর্লিন্সের বোম্বেটে অপেরায় উদাত্ত পুরুষালি স্বরে গান করতো, গায়ে আমার আসলি রেশমি জামা, দু-রঙা সব বোতাম, আমার পোখরাজ দাঁত, আমার চ্যাপটা শোলার টুপি, প্রাচ্যদেশগুলোর সব আরক ও আতর, কোনো অ্যালার্ম ঘড়ি ছাড়াই ঘুম, সৌন্দর্যশ্রীদের সঙ্গে হরবখৎ নাচ, আর আমার আভিধানিক অলংকৃত বচনে তাদের মধ্যে ঘোর আর ধাঁধা জাগিয়ে দেয়া, এবং যদি কোনো ভস্ম বুধবারে আমার সব ক্ষমতা শুকিয়ে ঝ'রে যায় তবু আমার প্রাহায় কোনো ধড়ফড় ফরফর নেই, কারণ আমি জীবন যাপন করি পরহিতব্রতে সান্ত্বনা ও সাহায্য বিলিয়ে, কোনো মন্ত্রীর মতোই বলা যায় এ-জীবন, আর তা বজায় রাখবার জন্তে আমার শুধু যা চাই তা এই গাডল বদন, এই গবেট মুখ, এবং আমার যথেষ্টই আছে সব, এখান থেকে এমনকী সূর্যাস্ত পেরিয়ে সার-সার যে-দোকানপাট চ'লে গিয়েছে তার মালিক আমিই, সেই একই পর্যটকেরা—যারা এককালে নৌবহরের অধ্যক্ষ মারফৎ আমাদের দোহন ক'রে নিতো—এখন তারা আমার নাম স্বাক্ষর-করা ছবি কিনতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, পঞ্জিকাগুলো এখন আমার লেখা সুভাষিত আর প্রণয়গীতিতে ভরা, তারা কেনে এমন পদক যাতে আমার শ্রীমুখের ছবি—পাশ থেকে তোলা, কেনে আমার জামাকাপড়ের ফালি টুকরো-টাকরা, আর এইসবই সমস্তদিন সমস্ত রাত নষ্ট করবার মতো ঝকমকে মড়ক ছাড়াই, মর্মরপাথরে খোদাই বীর ঘোড়সোয়ার—সেও আমি, আমাদের দেশের সমস্ত জনকের মতোই সোয়ালোদের বিষ্ঠায় ভরপুর।

এটাই ভারি দুঃখের যে অসাধু ব্লাকামান এই গল্পটা ফিরে বলতে পারে না, লোকে তাহ'লে দেখতে পেতো এর মধ্যে বানানো কিছুই নেই। শেষবার তাকে যখন কেউ জগতে দেখেছিলো সে ততক্ষণে তার আগেকার মহিমার দ্বি-শির বোতাম শুদ্ধ হারিয়ে বসেছে, তার সত্তা তখন ছড়ানো এলোমেলো টুকরোর স্তূপ, হাড়গোড়গুলো মরুভূমির কঠোর কষে জেরবার, তবে এটা ঠিক তখনও তার যথেষ্ট ঝুনঝুন

ঘুন্টি ছিলো, সান্তা মারিয়া দেল দারিয়েনের জাহাজঘাটায় রোববার-রোববার এসে সে উদয় হ'তো, সঙ্গে তার কফিনের মতো তোরঙ্গটা নিত্যসঙ্গী, তফাৎটা শুধু এই যে এখন আর সে কোনো মোক্ষম প্রতিষেধক বিক্রি করবার চেষ্টা করে না, বরং আবেগে-চিরে-যাওয়া গলায় অনুনয় করে নৌবহর যেন জনগণের চিত্ত-বিনোদনের জন্যে তাকে গুলি ক'রে মারে, যাতে সে নিজের শরীরেই পরখ ক'রে দেখাতে পারে এই অতিপ্রাকৃত প্রাণীর পুনর্জীবন-প্রদায়িনী যাবতীয় শক্তি, সেনিওরা ও সেনিওর-গণ, প্রতারক ও প্রবঞ্চক হিশেবে আমি আগে যে-সব ফেরেব্বাজি করেছি তাতে আপনাদের হকের চেয়েও বেশি অধিকার আছে আমাকে বিশ্বাস না-করার, কিন্তু আমি আমার মায়ের হাড়গোড়ের নামে হলফ ক'রে বলছি আজকে আমি আপনাদের যে-প্রমাণ দেবো তা কিন্তু অন্যজগতের প্রমাণ ভিন্ন আর কিছু নয়, এটাই অতীব দীন সত্য, কাঙালের শেষ কথা, আর যদি-বা আপনাদের এখনও কোনো দ্বিধা বা সন্দেহ থেকে থাকে, খেয়াল ক'রে দেখুন আমি কিন্তু আর হাসছি না—আগে যে-রকম দাঁত কেলাতাম সেইরকম আর করছি না, বরং দেখুন কীভাবে কোনোমতে আমি আমার কান্না চেপে রাখছি। খুবই বিশ্বাসযোগ্য হয়েছিলো সে নিশ্চয়ই, জামার বোতাম খোলা, চোখ ভেসে যাচ্ছে জলে, আর নিজের বুকের ওপর যেখানে তার হৃৎপিণ্ড থাকার কথা সে-কথা অনবরত খচ্চরের লাথির মতো চাপড়াচ্ছিলো, এটাই বোঝাতে গুলি মারবার সেরা চাঁদমারি এটাই, অথচ তবু নৌবহর সাহস পায়নি গুলি করতে, ভয় যে রোববারের এই ভিড় হয়তো তাতে খুঁজে পাবে তাদের মানহানি, হয়তো নিদারুণ অপমানিত বোধ করবে। কেউ-একজন—সে সম্ভবত অতীতের রাকমানীয় ভোজবাজিগুলো পুরো ভুলে যায়নি—কেউ জানে না সে কেমন ক'রে কোথায় গিয়ে তার জন্যে একটা কৌটোয় ক'রে নিয়ে এলো যথেষ্ট পরিমাণে বিষশেকড় আর সেই শেকড় ওপরে তুলে ফেলতে ক্যারিবিয়নের যত আমিষখোর দাঁড়কাক, আর সেটা সে প্রবল কামনায় খুলে ফেললো, যেন সে সত্যিই ওটা খেয়ে ফেলবে, এবং হ্যাঁ, সত্যিই, সে তা খেয়েও ফেললো, সেনিওরা ও সেনিওরগণ, আপনারা কিন্তু অনুগ্রহ ক'রে আবেগ তাড়িত হবেন না অথবা আমার আত্মার শান্তির জন্যেও প্রার্থনা করবেন না, কারণ এই মৃত্যু পরজগতের সঙ্গে সাময়িক একটি সাক্ষাৎকার ছাড়া আর-কিছুই নয়। সে-বারে সে এতটাই সততা দেখিয়ে-ছিলো যে সে কোনো অপেরা পালার মরণঘড়ঘড়ে ভেঙে পড়েনি, এবং চৌকিটা থেকে নেমে এসেছিলো একটা কাঁকড়ার মতো, কিছুক্ষণ ইতস্তত ক'রে শেষটায় শুয়ে-পড়ার জন্যে সবচেয়ে যোগ্য জায়গাটা বেছে নিলে মাটিতে, আর সেখান থেকে

সে তাকালে আমার দিকে যেমন ক'রে কোনো অসহায় শিশু তার মায়ের দিকে তাকায়, আর তারপর সে ত্যাগ করলে তার শেষ নিশ্বাস—নিজেরই বাহুবন্ধনে আবদ্ধ, চিরন্তনের ধনুষ্টঙ্কারে দুমড়ে যাবার সময়ও সে তার পৌরুষভরা অশ্রু ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা করছিলো। একমাত্র সে-বারই বলা বাহুল্য, আমার বিজ্ঞান আমার কোনোই কাজে এলো না—সম্পূর্ণ বিফল হ'লো। আমি তাকে রাখলাম অলুক্ষুণে মাপের সেই কফিন-তোরঙ্গে, তার মধ্যে তাকে শুইয়ে রাখার মতো যথেষ্ট জায়গা ছিলো। তার অন্ত্যেষ্টির খ্রিষ্টযাগের গান গাওয়ার ব্যবস্থা করলাম আমি, সেজন্যে আমায় চুয়ান্ন পেসো এস্পানি স্বর্ণমুদ্রা দিতে হয়েছিলো, কারণ গায়করা সেজে এসেছিলো সোনার জরিতে, আর সেখানে উপস্থিত ছিলেন তিন-তিনজন বিশপ। তার জন্যে আমি একটা সমাধিসৌধও নির্মাণ করলাম, কোনো সম্রাটের সমাধিসৌধ যেমন হয় তেমন, সমুদ্রের সেরা আবহাওয়া যেখানে সেখানে, একটা টিলার ওপর, নির্মাণ করলাম একটা চ্যাপেল—শুধু তারই জন্যে, আর এক লোহার ফলক বসালাম যাতে বড়ো-বড়ো গথিক হরফে লেখা রইলো : এখানে শুয়ে আছে মৃত ব্লাকামান, নিন্দুকেরা তাকে ডাকতো অসাধু, বদ, নৌবহরের প্রবঞ্চক আর বিজ্ঞানের বলি, আর যখন তার যাবতীয় সদ্‌গুণের জন্যে এ-সব যথোচিত সম্মান ব'লে বিবেচনা করলাম, তখনই আমি তার জঘন্য ব্যবহারের জন্যে শোধ নিতে শুরু করলাম, তখনই আমি তাকে ঐ সাঁজোয়া সমাধির ভেতরে পুনর্জীবন দিলাম, আর তাকে ঐ কবরের মধ্যেই রেখে দিলাম যাতে বিভীষিকা ও আতঙ্কে সে সারাক্ষণ ছটফট করে, গড়াগড়ি যায়। সে অনেকদিন আগেকার কথা, আগুনে পিঁপড়েরা সান্তা মারিয়া দেল দারিয়েনকে গিলে ফেলবারও অনেক আগে ঘটেছিলো এ-সব, কিন্তু সমাধিসৌধটা অটুট আছে এখনও, টিলার ওপর, অ্যাটলান্টিকের হাওয়ায় যে ড্র্যাগনেরা ওখানে ঘুমোতে ওঠে তাদের ছায়ায়, আর যতবারই আমাকে এখান দিয়ে যেতে হয় আমি তার জন্যে গাড়ি বোঝাই ক'রে গোলাপ নিয়ে আসি, আর তার সদ্‌গুণের কথা ভেবে আমার বুকটা ব্যথা করে, কিন্তু তখন আমি কান পাতি ফলকটার গায়ে, শুনতে পাই ভাঙাচোরা কফিন-তোরঙ্গটার ভগ্নস্তূপে সে হাউ-হাউ ক'রে কাঁদছে, আর দৈবাৎ যদি সে আবার ম'রে যায় নাছোড়ের মতো আমি তাকে আবার ফিরিয়ে আনি জীবনে, কারণ এই শাস্তির সৌন্দর্যটা এখানেই যে সে তার কবরের মধ্যে বেঁচেই থাকবে, আমি যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন সেও বেঁচে থাকবে, আর তার মানে হ'লো অনন্তকাল।

১৯৬৮

ভুতুড়ে জাহাজের শেষ পাড়ি

এবার ওরা টের পাবে আমি কে, তার জোরালো নতুন পুরুষগলায় বললে সে, যেদিন সে প্রথম দেখেছিলো সেই আলোহীন শব্দহীন বিশাল সমুদ্রগামী জাহাজটি তার অনেকদিন পরে, একরাতে গাঁয়ের পাশ দিয়ে গিয়েছিলো সেই অতিকায় জাহাজ, আস্ত গ্রামটার চেয়েও দীর্ঘ, গির্জের গম্বুজটার চেয়েও উঁচু, আর—পালখাটানো—পাশ দিয়ে চ'লে গিয়েছিলো অন্ধকারে ঔপনিবেশিক নগরীটির উদ্দেশে, জলদস্যুদের হামলা থেকে বাঁচবার জন্যে যেখানে বানানো হয়েছে দুর্গপ্রাকার, পুরোনো ক্রীতদাস বন্দর আর পাকখাওয়া সন্ধানী আলো আছে যার, যার বিষণ্ণ রশ্মি প্রতি পনেরো সেকেণ্ড পর-পর গ্রামটার রূপবদল করিয়ে দেয় জলজ্বলে বাড়িঘর আর আগ্নেয়-শিলার মরুউষর রাস্তায় ভরা কোনো চান্দ্রাশিবিরে, আর যদিও সে তখন নেহাৎ বালক ছিলো, ছিলো না এই পুরুষালি গমগমে গলা, হাওয়ার নৈশ বীণাগুলোকে শোনাবার জন্যে তবু মায়ের অনুমতি পেয়েছিলো অনেক রাত অব্দি বেলাভূমিতে থাকবার, এখনও সে মনে করতে পারে, জাহাজটা দেখবার অনেক বছর পরে, যেন সে এখনও দেখতে পাচ্ছে কেমন ক'রে জাহাজটা মিলিয়ে যায় যখন বাতিঘরের আলো ঠিকরে পড়ে তার পাশে আর কেমন ক'রে সে আবার দেখা দেয় যখন আলো চ'লে গিয়েছে পাশ দিয়ে, আর এই দেখে-দেখে মনে হচ্ছিলো এ যেন কোনো সবিরাম জাহাজ থেমে-থেমে চলেছে পাল খাটিয়ে, এই দেখা দেয়, এই মিলিয়ে যায়, চলেছে উপসাগরের মুখটার দিকে, যেন ঘুমের ঘোরে পথ-হাঁটার মতো হাৎড়ে-হাৎড়ে চলেছে, কারণ বয়াগুলো চিহ্নিত ক'রেই রেখেছিলো বন্দরের খাড়ি, কিন্তু কিছু-একটা বুঝি বিগড়ে যায় দিগ্‌দর্শিকার কাঁটায়, কেননা সে এগিয়েছে সেই মগ্ন চড়াগুলো সেই প্রচ্ছন্ন বিপদের দিকে, গিয়ে আছাড় খেয়েছে তার ওপর, ভেঙে চুরমার, ডুবে গিয়েছে কোনো শব্দ না-ক'রেই, যদিও কোনো ডুবোপাহাড়ের সঙ্গে কোনো জাহাজের যদি এমন সংঘর্ষ হয় তবে উচিত হ'তো ধাতুর প্রকাণ্ড ঝনঝন আর এনজিনের তুমুল বিস্ফোরণ, আতঙ্কে যে-নিনাদ জমাট ..খিয়ে দিতো প্রাগৈতিহাসিক জঙ্গলের সবচেয়ে গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন ড্র্যাগনকেও, গ্রামের শেষ রাস্তাগুলো থেকে যে-জঙ্গলের শুরু আর যে-জঙ্গলের শেষ একেবারে জগতের

পরপারে, আর তাই সে নিজেই ভেবেছিলো এটা বোধহয় কোনো স্বপ্ন, বিশেষত পরদিন, যখন সে দেখতে পেয়েছিলো উপসাগরের উজ্জ্বল মেছোঘোর, বন্দরের ওপরে টিলার গায়ে নিগ্রোদের ঝুপড়িগুলোর রংবেরঙের বিশৃঙ্খলা, গিয়ানার চোরাচালানকারীদের দ্বিমাস্তল পোতে তোলা হচ্ছে নির্দোষ-সব কাকাতুয়া যাদের পাকস্থলিগুলো ভর্তি হিরে-জহরতে, সে ভেবেছিলো, তারা গুনতে-গুনতেই নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আর স্বপ্নে দেখেছিলাম সেই বিশাল জাহাজটা, নিশ্চয়ই তা-ই, আর এ-কথা সে এতটাই বিশ্বাস ক'রে বসেছিলো যে কাউকেই সে-সম্বন্ধে কিছু বলেনি, আর পরের মার্চের সেই একই রাতে তাকে আবার দেখবার আগে এই দেখাটাও তার মনে পড়েনি, সে তখন শিশুমারের ঝিলিক দেখবে ব'লে তাকিয়ে-ছিলো সমুদ্রের দিকে, আর তার বদলে যা দেখেছিলো তা এই কুহকতরীটিকেই, এই বিভ্রম জাগানো জাহাজটিকেই, এই আছে এই নেই, বিমর্ষ, সবিরাম, প্রথমবারের মতো সেই একই ভ্রান্ত লক্ষ্যের দিকে সটান চলেছে, তফাৎ শুধু এটাই যে সে-রাতে সে জেগে আছে ব'লে এতটাই নিশ্চিত ছিলো যে সে ছুটে গিয়েছিলো তার মাকে বলবে ব'লে আর তিনি তিন-তিনটে সপ্তাহ কাটালেন হতাশায় ফুঁপিয়ে, কারণ তোর মগজটাই প'চে যাচ্ছে, সবকিছু উলটোপালটা করলে যা হয়, তোর দিন-রাত যেন ডিগবাজি খেয়েছে, দিনে ঘুমোস আর রাতে বেরিয়ে যাস অপরাধীদের মতো, আর যেহেতু মা-র তখন শহরে যাবার কথা, আরামে-বসা-যায় এমন কোনো-কিছুর খোঁজে, যাতে তাঁর ওপর ব'সে তিনি তাঁর মৃত স্বামীর কথা ভেবে যেতে পারেন, কারণ এগারো বছরের বৈধব্যের পর এতদিনে তাঁর কেদারার দোলকাঠামো ভেঙে গিয়েছে, সে তাই এই উপলক্ষের সুযোগটা নিলে, মাঝিদের বললে মেছোঘেরির পাশটায় চ'লে যেতে যাতে তাঁর ছেলে স্বচক্ষে দেখতে পারে আসলে সে সত্যি-সত্যি কী দেখেছিলো জলের আয়নায়, স্পঞ্জদের বসন্তে মান্তা রশ্মিদের প্রণয়লীলা, গোলাপি স্ন্যাপার আর নীল কাক ঝাঁপিয়ে পড়ছে এই জলের মধ্যেই আরো-নরম জলের অন্যসব কুয়োয়, আর এমনকী কোনো ঔপনিবেশিক নৌকাডুবিতে যারা জলে ডুবে মারা গেছে তাদের ভবঘুরে চুল ভেসে যাচ্ছে জলে, কোনো সদ্য-ডোবা জাহাজ কিংবা তার মতো কিছুরই কোনো পাত্তা নেই, অথচ তার মাথাটা এমনি শুওর-মার্কা যে তার মা শেষ অব্দি কথা দিলেন পরের মার্চে তার সঙ্গে গিয়েই নজর রাখবেন, সত্যি, কথা দিচ্ছি, নিশ্চয়ই যাবো, যাবোই, এটা তো জানতেন না তাঁর অদূর ভবিষ্যতে একমাত্র যেটা নিশ্চয়ই ঘটবে সেটা সার ফ্রান্সিস ড্রেকের আমলের একটা আরামকেদারা, যেটা তিনি তুরানির দোকান থেকে নিলেমে কিনেছেন, যার

ওপরে সেই রাত্তিরেই মা বসবেন বিশ্রাম করতে, ঘন-ঘন শ্বাস ফেলবেন কষ্টের, ওঃ, বেচারা আমার, ওলোফের্নোস, যদি তুমি শুধু দেখতে পেতে এই মখমলমোড়া কিংখাবেগড়া বানীর সম্পূটে ব'সে-ব'সে তোমার কথা ভাবতে কী-যে ভালো লাগে, কিন্তু যতই তিনি তাঁর মৃত স্বামীর স্মৃতি ফিরিয়ে আনেন ততই তাঁর রক্ত তাঁর হৃৎপিণ্ডে বুড়বুড়ি তোলে আর চকোলেট হ'য়ে যায়, যেন ব'সে-থাকার বদলে তিনি আসলে ছুটছেন, ভিজে একশা হিমশিহরনে আর জ্বরে, আর তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাস যেন দলা-দলা মাটিতে ভরা, আর শেষটায় ছেলে ফিরে এলো ভোরবেলায় আর দেখলো মা ম'রে প'ড়ে আছে আরামকেদারায়, কিন্তু আদ্ধেক এর মধ্যেই প'চে গেছে, সাপে ছোবলালে যেমন হয়, ঠিক একই জিনিশ ঘটেছিলো পরে আরো চারজন স্ত্রীলোকের আর তারপরেই খুনে কেদারাকে ছুঁড়ে ফেলা হয় সমুদ্রে, অনেক দূরে, কারণ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে এটাকে এতই ব্যবহার করা হয়েছে যে তার আরাম বা শান্তি দেবার সব ক্ষমতা লোপ পেয়ে গিয়েছিলো, আর তাই তাকে অভ্যস্ত হ'য়ে উঠতে হয়েছিলো বাপ-মা-মরা কোনো অনাথের দুঃস্থ কর্মসূচিতে, সবাই যাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলতো এ হচ্ছে ঐ বিধবাটির ছেলে যে গ্রামে নিয়ে এসে-ছিলো দুর্ভাগ্যের ঐ সিংহাসন, লোকের দয়াদাক্ষিণ্যে তত নয়, সে খেয়ে বাঁচতো নৌকোগুলি থেকে চুরি ক'রে হাতানো মাছ খেয়ে, আর ক্রমে তার কণ্ঠস্বর হ'য়ে উঠলো ভরাট গর্জন, আরেকটা মার্চের রাত্তির না-আসা অব্দি পুরোনো দৃশ্যগুলো তার মনেই পড়েনি, কিন্তু সে-রাতে দৈবাৎ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ছিলো সে, আর আচমকা, ধন্যি প্রভু, ঐ তো ওটা ওখানে, অ্যাসবেসটসে তৈরি সেই বিশাল তিমি, বেহেমথ পশু, যন্ত্রদানব, এসো-গো, দেখে যাও, কুকুরের ঘেউ-ঘেউ আর মেয়েদের আতঙ্কের এমন-একটা তুলকালাম শোরগোল তুললো সে যে সবচেয়ে বুড়ো থুর-থুরেদেরও মনে প'ড়ে গেলো তাদের বাপপিতামহদের আতঙ্ক আর ঢুকে পড়লো খাটের তলায়, ভাবলো যে উইলিয়াম ড্যাম্‌পিয়ের বুঝি আবার এসে হাজির, কিন্তু যারা ছুটে বেরিয়ে এসেছিলো রাস্তায় সেই-তারা কিন্তু সেই অসম্ভব যন্ত্রটিকে দেখ-বার কোনো চেষ্টাই করেনি, সেই মুহূর্তে সেটা অবশ্য আবার হাবিয়ে গিয়েছিলো পুবদিকে, আর উত্তুঙ্গ উঠেছিলো তার সাম্বাৎসরিক সর্বনাশের প্রাক্কালে, কিন্তু তারা তাকে মেরে-ধ'রে এমন দোমড়ানো-কুঁচকোনো ক'রে ফেলে রেখে চ'লে গিয়েছিলো যে তখনই সে নিজেকে বলেছিলো, রাগে তার কষ বেয়ে ফেনা বেরুচ্ছে, এবার এরা টের পাবে আমি কে, তবে সে হুঁশিয়ার ছেলে, কারু কাছেই সে তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা খুলে বলেনি, বরং সারাটা বছর সে কাটালো এই একই

ভাবনা মাথায়, এবার এরা দেখতে পাবে আমি কে, অপেক্ষা ক'রে রইলো আবারও সেই ছায়া-জাহাজের আবির্ভাবের সন্ধ্যাটার জন্যে, সে যা করতে চায় তার জন্যে এই অপেক্ষাটা জরুরি, অর্থাৎ সেই সন্ধেয় সে একটা নৌকো চুরি ক'রে উপসাগর পেরিয়ে যাবে, সন্ধেবেলাটা কাটাবে ক্রীতদাস বন্দরের খাড়িগুলোর একটায় তার দুর্দান্ত মুহূর্তটার জন্যে, সেই যে-খাড়িগুলো ক্যারিবিয়নের সব মানুষের পেচ্ছাবে ভরা, তবে সে তার অভিযানে এমনই নিবিষ্ট হ'য়েছিলো যে সে এমনকী সবসময়ে যা করে তার মতো আস্ত-আস্ত হাতির দাঁত কেটে বানানো আইভার মান্দারিন মূর্তিতে ভরা হিন্দু দোকানগুলোর সামনেও থামেনি কিংবা রগড়-তামাশা করেনি বিকলাঙ্গ পায়ে গতিময় জুতো-পরানো ওলন্দাজ নিগ্রোদের নিয়ে, কিংবা সে অন্য-বারের মতো ভয়ও পায়নি খয়রি রঙের মলয়ালিদের দেখে যারা নাকি সারা পৃথিবী ঘুরে বেরিয়েছে হর্ষোৎফুল্ল সেই ভাঁটখানাটির অসার ও অলীক কল্পনায় যেখানে নাকি বিক্রি হয় ব্রাজিলের মেয়েদের রাং-এর কাবাব, কারণ রাত্তির নামার আগে আশপাশের কোনোকিছুর সম্বন্ধেই তার কোনো চেৎভেদ ছিলো না, আর রাত নেমে এলো হঠাৎ তারাদের সব ভার নিয়ে আর জঙ্গল নিশ্বেসে ছড়িয়ে দিলে গার্ডেনিয়া আর পঁচে-যাওয়া বহুরূপীদের মধুর ঝিম সৌরভ, আর সে ছিলো ঐ-তো ওখানে, দাঁড় বাইছিলো তার চোরাই নৌকোয়, সেটা নিয়ে যাচ্ছিলো উপ-সাগরের মুখের দিকে, শুল্ক দফতরের পাহারার দৃষ্টিকে সজাগ না-ক'রে দেবার জন্যে লণ্ঠন নেভানো, বাতিঘরের আলোর সবুজ ডানার ঝাপটায় প্রতি পনেরো সেকেণ্ড পর-পর সে না-মানুষ হ'য়ে উঠছে তারপরেই অন্ধকার তাকে ফের মানুষ ক'রে দিয়ে যাচ্ছে, বন্দরের খাড়িটা চেনাবার জন্যে বয়াগুলোর পাশে এসে পড়ছে দেখে শুধু-যে তার চাপে ভরা দীপ্তি আরো তীব্র ও প্রখর হয়ে উঠছে তা নয়, বরং জলের নিশ্বাস ক্রমশ যে করুণ হ'য়ে উঠছে সেইজন্যেই, সে ঐভাবে বৈঠা চালিয়ে গেলো, নিজের মধ্যে এমন জড়ানো-গোটানো যে সে জানতেই পারেনি ঠিক কোনখান থেকে এলো ভয়াবহ হাঙরের নিশ্বাস কিংবা কেনই যে রাত এমন নিবিড় ও ঘন হ'য়ে উঠলো, যেন অতর্কিতে নিভে গিয়েছে সব তারা, আর এইজন্যেই যে-জাহাজটা ছিলো ওখানে, তার যাবতীয় অভাবনীয় মহাকায় নিয়ে, প্রকাণ্ড, বাপ রে, জগতের যে-কোনো অতিকায় জিনিশের চাইতেও আরো-বড়ো, জলে-ডাঙায় যাবতীয় মিশকালো জিনিশের চাইতেও আরো-কালো, নৌকোর এত কাছে দিয়ে যাচ্ছে সেই তিনশো হাজার টনের সেই হাঙরগন্ধ যে সে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে ইস্পাতি খাড়াইয়ের কিনার, অগুনতি ঘুলঘুলির মধ্যে একটাতেও আলো জ্বলছে না,

কোনো দীর্ঘশ্বাস পড়ছে না এনজিন থেকে, কোনো জনপ্রাণী নেই, নিজের স্তব্ধতার বৃত্তে সে ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছে নিজেরই মরা বাতাস, তার নিজেরই থমকে-পড়া সময়, তার পলাতক সিন্ধুজল যার মধ্যে জলে-ডোবা মানুষদের একটা আস্ত জগৎই যেন ভাসছে, আর আচমকা এই সবই উধাও হ'য়ে গেলো বাতিঘরের আলোর ঝলকে আর মুহূর্তের জন্যে চারপাশ আবার হ'য়ে উঠলো স্বচ্ছ ক্যারিবিয়ন, মার্চের রাত্তির, পেলিকানদের প্রাত্যহিকতা, কাজেই সে একাই থেকে গেলো বয়াগুলোর মধ্যে, বুঝতেই পারছে না কী করবে, নিজেকে জিগেশ করছে কী করা উচিত, আঁৎকেই গেছে, সে কি জেগে-জেগেই স্বপ্ন দেখছে নাকি, শুধু যে এখন তা নয়—অন্যান্য বারেও সে কি স্বপ্নই দেখেছে, কিন্তু নিজেকে এ-কথা শুধিয়েছে কি শুধোয়নি বয়াগুলোর মধ্য থেকে রহস্যের দম ঝেটিয়ে তাড়ালো কেউ, প্রথম বয়া থেকে শেষ অব্দি, যখন বাতিঘরের আলো আবার পাশ দিয়ে চ'লে গেলো আবার দেখা দিলে জাহাজ, এখন তার দিগ্‌দর্শিকা বিকল, হয়তো জানেই না মহাসমুদ্রের ঠিক কোনখানে এই সাগর, অদৃশ্য খাড়িটার জন্যে যেন আকুল হাৎড়াচ্ছে কিন্তু আসলে সোজা এগিয়ে চলেছে প্রচ্ছন্ন ডুবোপাহাড়ের দিকে, শেষটায় সে যেন একটা সবছাপানো প্রকাশিত আলো পেলে, দিব্যদৃষ্টি, বুঝলো যে বয়াগুলোই নিশ্চয়ই এই রহস্যের শেষ চাবিকাঠি, আর সে নৌকোয় জেলে নিলে তার লণ্ঠন, খুদে একরত্তি একটা লাল আলো, প্রহরীমিনারের বিপদ জানান দেবার কোনো যুক্তিই যার নেই কিন্তু যেটা সারেঙের কাছে হবে দিশারী সূর্যের মতো, কারণ, তারই সৌজন্যে, জাহাজটা তার গতিপথের ভুলটা শোধরালে, আর খাড়ির প্রধান তোরণটা দিয়ে ঢুকে পড়লো, জাহাজ-চালানোর কৃৎকৌশলের ভাগ্যে-ঘটা পুনরুত্থানে, আর তখনই একসঙ্গে জ্ব'লে উঠলো তার সব আলো, ঝগঝগ শুরু ক'রে দিলে বয়লার, তারারা আটকে রইলো যে যার জায়গায়, আর প্রাণীদের মৃতদেহগুলো চ'লে গেলো জলের অতলে, রশুই ঘরে উঠলো রেকাবি-বারকোশোর ঝনঝন আর রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলো লরেল ঝোলের সুঘ্রাণ, কেউ ইচ্ছে করলেই শুনতে পেতো খোলা চাঁদের তলায় ডেকে অর্কেস্ট্রা বেজে উঠেছে আর রাজকীয় ঘরগুলোর ছায়ায় দপদপ ক'রে উঠছে প্রেমিক-প্রেমিকার ধমনী, তবু সে নিজের মধ্যে ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছিলো একটাই ভুক্তাবশিষ্ট রোষ যে সে নিজেকে আবেগে তাড়িত হ'তেই দেবে না কিংবা ভয় পাবে না এই আশ্চর্য অলৌকিককে, তবে নিজেকে সে বললে আগের চাইতে আরো-দৃঢ়ভাবে, এবার ওরা টের পাবে আমি কে, ডরপোক, ভিতুর ডিম, এবার ওরা দেখবে, আর অতিকায় যন্ত্রদানবটি যাতে তার ঘাড়ে এসে না-পড়ে সেইজন্যে

পাশে স'রে যাবার বদলে সে তার সামনে দিয়েই দাঁড় বাইতে লাগলো, কারণ এবার কাপুরুষগুলো সত্যি টের পাবে আমি কে, আর সে লণ্ঠন দেখিয়ে জাহাজকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো, তারপর সে নিশ্চিত হ'লো জাহাজের বাধ্যতার, সে-যে আবারও একবার জাহাজঘাটা থেকে সরিয়ে নিয়ে এসেছে জাহাজের গতিপথ, তাকে বার ক'রে নিয়ে এসেছে অদৃশ্য খাল থেকে, আর তার লাগাম ধ'রে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ঘুমন্ত গ্রামের আলোগুলোর দিকে যেন সে কোনো সিন্ধুঘোটক, জ্যান্ত এক জাহাজ, বাতিঘরের মশালের আলো এখন যাকে আর ভয় পাওয়ায় না, এখন আর তাকে অদৃশ্য ক'রে দেয় না সে-আলো বরং তাকে অ্যালুমিনিয়াম ক'রে তোলে প্রতি পনেরো সেকেণ্ড পর-পর, আর গির্জের ওপরকার ক্রুশগুলো, বাড়িঘরগুলোর দুঃস্থ দীন দশা, বিভ্রম যেন চেতিয়ে দাঁড়িয়েছে, আর তবু মহাসমুদ্রের জাহাজ পেছন-পেছন এসেছে তার, ভেতরে-ভেতরে অনুসরণ ক'রে এসেছে তারই গোপন অভিপ্রায়, তার হৃৎপিণ্ডের দিকে পাশ ফিরে ঘুমিয়ে আছে কাপ্তেন, তাদের রান্না-বান্নার ভাঁড়ার ঘরের তুষারে ঘুমিয়ে আছে লড়িয়ে যত ষণ্ডা, রোগশয্যায় শুধু এক-মাত্র এক রোগী, তার চৌবাচ্চাগুলোর অনাথ জল, মুক্তিবিহীন সারেঙ যে নিশ্চয়ই জাহাজঘাটা হিশেবে ভুল করেছে শৈলশিরাকে, কারণ সেই মুহূর্তে ভোঁ উঠলো তীব্র প্রখর প্রকাণ্ড, একবার, আর তার ওপর অনর্গল ঝ'রে-পড়া বাষ্পে সে ভিজে চুপচুপে হ'য়ে গেলো একেবারে, আবারও, আর অন্য-যার নৌকো সে চুরি করেছে সেই নৌকো বুঝি এবার কাৎ হ'য়ে পড়ে, আর আবার, কিন্তু ততক্ষণে বড্ড দেরি হ'য়ে গেছে, কারণ ঐ তো বেলাভূমির কড়িঝিনুক, রাস্তাঘাটের খোয়াপাথর, অবিশ্বাসীদের যত ঘর-দুয়ার, সারা গাঁ আলো হ'য়ে উঠেছে ভয়াবহ ঐ জাহাজের ভীষণ আলোয়, আর সে যেন শেষ মুহূর্তটাই শুধু পেলে মহাপ্লাবনের ঠিক আগটায়, পাশে স'রে যাবার জন্যে, এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে সে চীৎকার ক'রে উঠেছে, এই-যে দ্যাখো, ভিতুর দল, ভরপোক, ইস্পাতের মস্ত খোপটা মাটি চুরমার ক'রে দেবার ঠিক এক মুহূর্ত আগে যে-কেউ শুনতে পেতো নব্বুই হাজার পাঁচশো শ্যাম্পেন গেলাশের ভেঙে-পড়ার পরিচ্ছন্ন ঝনঝন, একটার পর আরেকটা গলুই থেকে হাল পর্যন্ত, তারপর ছিটকে বেরিয়ে এলো আলো, এখন সে আর মার্চের কোনো ভোর নয়, বরং কোনো ঝকঝকে বুধবারের দুপুর, আর অবিশ্বাসীরা এখন কেমন আতঙ্কে হা ক'রে বিস্ফারিত চোখে দেখছে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রকাণ্ড জাহাজকে সেটা দেখবার তৃপ্তি ও সন্তোষ দিলে সে নিজেকে, আর গির্জের সামনে মাটিতে পোঁতা

অন্যটা, সবকিছুর চাইতে শাদা, গম্বুজের চেয়েও কুড়িগুণ উঁচু, সারা গ্রামটার চেয়ে প্রায় সাতানব্বুইগুণ দীর্ঘ, লোহার হরফে তার নাম খোদাই করা, *Halalcsillag,* আর তার পাশ দিয়ে ঝ'রে পড়ছে মৃত্যুসমুদ্রের যত প্রাচীন আর অলস জল, ফোঁটায়-ফোঁটায়, ফোঁটার পর ফোঁটায়।

হারানো সময়ের সমুদ্র

জানুয়ারি মাসের শেষ দিকে সমুদ্র কেমন রুক্ষ ফুঁসে উঠলো, শহরের গায়ে খালাশ ক'রে দিতে শুরু করলো তার বিপুল আবর্জনা, আর কয়েক সপ্তাহ বাদেই সব-কিছুতেই সংক্রমিত হ'য়ে গেলো তার অসহনীয় মেজাজ। সেই সময় থেকেই পৃথিবী আর বাসযোগ্য রইলো না, অন্তত পরের ডিসেম্বর অব্দি তো নয়ই, কাজেই আটটার পরে কেউই আর জেগে থাকে না। কিন্তু যে-বছর মিস্টার হার্বার্ট এসে হাজির হলেন সমুদ্রের কোনো বদলই হ'লো না, এমনকী ফেব্রুয়ারিতেও নয়। উলটো দিকে, বরং, সমুদ্র হ'য়ে উঠলো আরো-মসৃণ আরো-ফসফরজ্বলা আর মার্চ মাসের প্রথম রাতগুলোয় সে ছড়িয়ে দিলো রাশি-রাশি গোলাপের গন্ধ।

গন্ধটা পেলে তোবিয়াস। কাঁকড়াদের কেমন যেন কাছে টেনে নিয়ে আসে তার রক্ত, আদ্ধেক রাতটাই সে কাটালে তার বিছানা থেকে কাঁকড়াদের তাড়িয়ে, তারপর আবার হাওয়া জেগে উঠলো, আর সেও একটু ঘুমোতে পারলে। জেগে-জেগে শুয়ে-থাকার দীর্ঘ সময়টায় সে হাওয়ার সবরকম বদল চিনে ফেলতে শিখে ফেলেছে। কাজেই সে যখন গোলাপের গন্ধ পেলে, তাকে গিয়ে দরজাটাও খুলতে হ'লো না, সে জানে এই গন্ধ আসছে সমুদ্র থেকে।

সে ঘুম থেকে উঠলো দেরি ক'রে। ক্লোতিল্‌দে তখন উঠোনে আগুন ধরাচ্ছে। হাওয়াটা জুড়িয়ে যাচ্ছে সব, সমস্ত তারাই রয়েছে যে যার নিজের জায়গায়, কিন্তু সমুদ্রের আলোগুলোর জন্যেই তাদের কেউ যে এক-এক ক'রে দিগন্ত অব্দি গুনবে সেটা কঠিন ঠেকে। তার কফি খাবার পরও তোবিয়াসের মনে হ'লো সে যেন এখনও রাত্তিরটাকেই একটু-একটু চাখতে পারছে।

'কাল রাতে ভারি আশ্চর্য কাণ্ড হয়েছে,' তার মনে প'ড়ে গেলো।

ক্লোতিল্‌দে, বলাই বাহুল্য, গন্ধটা পায়নি। সে এমনই গভীর ঘুমে ড'লে পড়েছিলো যে তার এমনকী স্বপ্নগুলোও আর মনে পড়ছে না।

'গোলাপের গন্ধ পেলাম,' তোবিয়াস বললে, 'আর আমি ঠিক জানি গন্ধটা এসেছিলো সমুদ্র থেকে।'

'গোলাপের গন্ধ কেমন, তা-ই আমি জানি না,' বললে ক্লোতিল্‌দে।

সে হয়তো ঠিকই বলেছে। শহরটা উষর, কঠিন মাটি চিরে-চিরে গেছে শোরা, আর শুধু কচিৎই কেউ কোনো উপলক্ষে বাইরে থেকে ফুলের তোড়া আনে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলবে ব'লে, যেখানে তারা তাদের মৃতদের ভাসিয়ে দেয়।

'গুয়াকামাইয়ালের যে-লোকটা জলে ডুবে মরেছিলো, গন্ধটা ছিলো তারই মতো, হুবহু এক,' তোবিয়াস বললে।

'তা,' ক্লোতিল্‌দে বললে, মুখে মুচকি হাসি, 'গন্ধটা যদি ভালো হয় তাহ'লে এটা তুমি ধ'রেই নিতে পারো যে গন্ধটা সমুদ্র থেকে আসেনি।'

সমুদ্র এখানে, সত্যি, নিষ্ঠুর। কখনো-কখনো, জালগুলো যখন ভাসন্ত আবর্জনা ছাড়া আর-কিছুই আনে না, তখন যখন ভাঁটার টানে জল স'রে যায়, শহরের রাস্তাগুলো তখনও ভরা থাকে মরা মাছে। ডাইনামাইট শুধু পুরোনো জাহাজডুবির ভাঙা টুকরোগুলোই জলের ওপর নিয়ে আসে।

ক্লোতিল্‌দের মতোই, শহরে অল্প যে-কজন স্ত্রীলোক আছে, তিক্ততায় তারা শুধু টগবগ টগবগ ফুটছে। আর তারই মতো, ঐ তো আছে বুড়ো হাকোবের বৌ, সেদিন সকালে সে অন্যদিনের চাইতে আগেই উঠে পড়েছে; সে বাড়িঘর সব ঠিকঠাক গোছালে, তারপর বসলো ছোটোহাজরিতে, চোখের ভাবে মনে হয় যেন কোনো দুশমন দেখেছে।

'আমার শেষ ইচ্ছে,' সে বললে তার স্বামীকে, 'যেন জ্যান্ত কবরে যাই।'

কথাটা সে এমনভাবে বললে যেন সে আছে মৃত্যুশয্যায়, কিন্তু সে বসেছিলো খাবারঘরের টেবিলে, জানলাগুলোর মুখোমুখি, জানলাগুলো দিয়ে তখন মার্চের ঝকঝকে আলো ঝ'রে পড়ছে, ছড়িয়ে যাচ্ছে গোটা বাড়িতেই। স্ত্রীর মুখোমুখি ব'সে, তার শান্ত ক্ষুধাকে প্রশমিত করছিলো বুড়ো হাকোব—সে তার স্ত্রীকে এত ভালোবাসে, এতদিন ধ'রে ভালোবাসে যে সে এখন এমন-কোনো দুঃখকষ্টের কথা কল্পনাও করতে পারে না যেটা কোনো-না-কোনোভাবে তার স্ত্রীকে দিয়ে শুরু হয়নি।

'আমি এই আশ্বাস নিয়ে মরতে চাই যে আমি সত্যিকার মানুষের মতো মাটির তলায় শোবো,' তার স্ত্রী ব'লেই চললো। 'আর সে-বিষয়ে নিশ্চিত হবার একমাত্র উপায় হচ্ছে জনে-জনে গিয়ে বলা যে আমাকে যেন ভগবানের নাম ক'রে তারা জ্যান্তই কবর দেয়।'

'কাউকে তোমায় বলতে হবে না,' অতীব শান্তভাবেই বললে বুড়ো হাকোব। 'আমি নিজেই তোমায় কবর দেবো।'

'তাহ'লে চলো, যাই,' স্ত্রী বললে, 'কারণ অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি মারা যাবো।'

বুড়ো হাকোব তাকে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করলে। স্ত্রীর চোখ দুটি এখনও কচি। তবে তার হাড়গুলো জোড়ের কাছে কেমন জট পাকিয়ে গেছে, আর তাকে দেখে মনে প'ড়ে যায় চষা জমির কথা; তা, সে-কথা যদি ওঠে তো বলতেই হয় সবসময়েই তাকে এমন দেখাতো।

'আগের চেয়েও তুমি এখন বেশি সুঠাম আছো,' বুড়ো হাকোব তাকে বললে।

'কাল রাতে আমি গোলাপের গন্ধ পেয়েছি,' তার স্ত্রী ঘন একটা শ্বাস ছাড়লে।

'সেটা নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না,' বুড়ো হাকোব তাকে আশ্বস্ত করতে চাইলো। 'আমাদের মতো গরিব বেচারাদের জীবনে এ-রকম-কিছু সবসময়েই ঘটছে।'

'মোটেই তা নয়,' স্ত্রী বললে। 'সমুদ্র থেকে অনেক দূরে চ'লে গিয়ে আমি মরতে চাই। চিরকাল আমি প্রার্থনা করেছি আমি যেন অনেক আগে থেকেই টের পাই কখন আমি মরতে চলেছি। এই শহরে গোলাপের গন্ধ একমাত্র ঈশ্বরের নির্দেশই হ'তে পারে।'

বুড়ো হাকোব তখন শুধু এটাই তাকে বলতে পারলে যে সবকিছু গোছগাছ ক'রে নেবার জন্যে একটু সময় দিতে। যখন মরা উচিত লোকে তখন মরে না—সে এই কথা অনেককেই বলতে শুনেছে—বরং তারা ম'রে যায় যখন তারা মরতে চায় তখনই, আর সে তার স্ত্রীর পূর্বাশঙ্কায় ভারি উৎকণ্ঠিত হ'য়ে পড়লো। সে এমনকী এই কথাও ভাবলে, যখন সময় আসবে তখন সে সত্যি-সত্যি তার স্ত্রীকে জ্যান্ত কবর দিতে পারবে কি না।

যেখানে এককালে তার একটা দোকান ছিলো, ন-টার সময় সে তার ঝাঁপ খুললো। দরজার পাশেই সে রাখলে দুটো চৌকি আর একটা টেবিল, টেবিলের ওপরে রাখলে শতরঞ্জ ও চেকার খেলার চৌখুপি-কাটা একটা ছক, সারা সকালটা এখান দিয়ে যে-ই যায় তার সঙ্গেই সে চেকার খেলে কাটায়। নিজের বাড়িটা থেকে সে ভুতুড়ে পোড়ো শহরটার দিকে তাকালে: শহরের ভাঙা টুকরোগুলো এলোমেলো ছড়িয়ে আছে, এখনও আগেকার বাহারি রংচঙের ঝাপসা চিহ্ন দেখা যায়, শহরটাকে ঠুকরে খেয়েছে সূর্য আর রাস্তার শেষে সমুদ্রের একটা চাং।

দুপুরের খাবার আগে, সবসময় যেমন করে, সে দোন মাহিমো গোমেসের সঙ্গে চেকার খেলে কাটালে। যে-লোক দু-দুটো গৃহযুদ্ধ অক্ষত টিঁকে গিয়েছে, তৃতীয়টায় যে শুধু একটা চোখই খুইয়েছে, তার চেয়ে মানবিক কোনো প্রতিপক্ষের কথা বুড়ো

হাকোব ভাবতেই পারে না। প্রথম দানটা সে ইচ্ছে ক'রেই হেরে গিয়ে আরেকটি দান খেলবার জন্যে সে দোন মাহিমোকে আটকে রাখলে।

'আচ্ছা, দোন মাহিমো, আমাকে একটা কথা বলুন তো,' তাঁকে সে শুধোলে তখন। 'আপনি কি আপনার স্ত্রীকে জ্যান্ত কবর দিতে পারবেন ?'

'নিশ্চয়ই,' দোন মাহিমোর জবাব। 'যদি বলি যে আমার হাত তাতে একটুও কাঁপবে না, সে-কথা আপনি অনায়াসে বিশ্বাস করতে পারেন।'

বুড়ো হাকোব বিস্মিত একটা স্তব্ধতায় আছাড় খেলে। তারপর নিজের সেরা ঘুঁটিগুলোর সর্বনাশ ঘটিয়ে দিয়ে, সে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললে :

'তা যেমন দেখছি, পেত্রা বোধহয় মরতে বসেছে।'

দোন মাহিমোর মুখের অভিব্যক্তি মোটেই পালটালো না। 'সেক্ষেত্রে,' তিনি বললেন, 'তো তাকে জ্যান্ত কবর দেবার কোনো কথাই ওঠে না।' দুটো ঘুঁটি খতম ক'রে তিনি একটা রাজা বানালেন। তারপর করুণ ঘোলাজলে ভেজা চোখটা তিনি প্রতিপক্ষের ওপর লেপটে রাখলেন।

'কী হয়েছে তাঁর ?'

'কাল রাতে,' বুড়ো হাকোব ব্যাখ্যা ক'রে জানালে, 'ও গোলাপের গন্ধ পেয়েছে।'

'তাহ'লে আদ্ধেকটা শহরই মরতে বসেছে,' দোন মাহিমো গোমেস বললেন। 'আজ সকালে লোকে শুধু এই কথাই বলাবলি করছিলো।'

তাঁকে আহত না-ক'রে আবার হেরে-যাওয়া ভারি কঠিন লাগলো বুড়ো হাকোবের। টেবিল আর চৌকিগুলো তারপর সে ভেতরে নিয়ে এলো, ঝাঁপ ফেললো তার দোকানে, আর তারপর বেরিয়ে গেলো সত্যি-সত্যি কে, বা কারা, গন্ধটা পেয়েছে তার খোঁজে। শেষটায় দেখা গেলো শুধু তোবিয়াসই একমাত্র নিঃসংশয়। কাজেই বুড়ো হাকোব তাকে বললে যে একবার যেন সে তার বাড়িতে আসে, যেন দৈবাৎই এসে পড়েছে এমন ভঙ্গি ক'রেই যেন আসে, আর তার স্ত্রীকে এ-সম্বন্ধে সব কথা খুলে বলে।

তাকে যা বলা হ'লো, তোবিয়াস ঠিক তা-ই করলে। চারটে নাগাদ, তার রবিবাসরীয় পোশাকে সেজেগুজে, সে এসে হাজির হ'লো পাতিওতে—সারা বিকেলটা সেখানে বুড়ো হাকোবের স্ত্রী বিপত্নীকের সাজপোশাক রিফু করেছে, গুছিয়ে রেখেছে।

তোবিয়াস এমন নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছিলো যে বুড়ো হাকোবের স্ত্রী চমকেই উঠেছিলো।

'দোহাই!' সে আঁৎকে বললে, 'আমি ভেবেছিলাম বুঝি দূতপ্রধান গাব-রিয়েল।'

'হুম, দেখতেই তো পাচ্ছো তা নয়,' তোবিয়াস বললে, 'এ শুধু আমি, আর আমি তোমাকে একটা কথা বলতে এসেছি।'

বুড়ো হাকোবের স্ত্রী চশমাটা ঠিক ক'রে প'রে আবার তার কাজে লেগে গেলো।

বললে : 'কী বলবে, আমি জানি।'

'বাজি ধ'রে বলতে পারি, জানো না,' তোবিয়াস বললে।

'কাল রাতে তুমি গোলাপের গন্ধ পেয়েছো।'

'তুমি কী ক'রে জানলে?' হার মেনে গিয়ে শুধোলে তোবিয়াস।

'আমার এই বয়েসে,' হাকোবের স্ত্রী বললে, 'ভাবনার জন্যে কারু হাতে এত সময় থাকে যে ইচ্ছে করলে কেউ পুরোদস্তুর প্রবক্তা হ'য়ে যেতে পারে।'

দোকানের ভেতরে হালকা দেয়ালটার গায়ে কান লাগিয়ে ব'সে ছিলো বুড়ো হাকোব, এবার সে লজ্জায় উঠে দাঁড়ালে।

'বুঝলে, মেয়ে,' দেয়ালের মধ্যে দিয়ে সে চ্যাচালে, তারপর ঘুরে বেরিয়ে এলো পাতিওতে। 'তুমি যা ভাবছো তা কিন্তু সত্যি নয়।'

'এই ছেলেটা মিছে কথা কইছে,' কাজ থেকে মাথা না-তুলেই বললে তার স্ত্রী। 'কিছুরই গন্ধ পায়নি এ।'

'পেয়েছি, রাত এগারোটা নাগাদ,' তোবিয়াস বললে, 'আমি তখন কাঁকড়াগুলো খেদাচ্ছি।'

বুড়ো হাকোবের স্ত্রী একটা গলবন্ধে তালি লাগানো শেষ করলে।

জোর দিয়ে বললে, 'মিছে কথা। সব্বাই জানে তোমার মাথায় নানা ফন্দি-ফিকির ঘোরে।' দাঁত দিয়ে সুতোটা কেটে সে চশমার ওপর দিয়ে তোবিয়াসের দিকে তাকালে।

'এখানে এসে আমায় যদি অশ্রদ্ধাই দেখাবে, তাহ'লে চুলেই বা তেল দিয়েছো কেন, আর জুতোজোড়াই বা অত পালিশ করেছো কেন—এই কথাটাই আমি বুঝতে পারছি না।'

সেই সময় থেকেই তোবিয়াস সমুদ্রের ওপর কড়া নজর রাখতে শুরু করলে। সে উঠোনের পাশে পাতিওতে তার দোলখাটিয়া টাঙায়, সারা রাত ধ'রে অপেক্ষা ক'রে থাকে, লোকে যখন ঘুমোয় তখন জগতে যা-সব কাণ্ড হয়, তা দেখে অবাক

হয়। অনেক রাতেই সে শুনতে পেয়েছে কাঁকড়াদের মরীয়া বুকে হাঁটার শব্দ, বিশেষ ক'রে তারা যখন দাঁড়া দিয়ে খুঁটিগুলো আঁকড়ে বেয়ে উঠতে চেষ্টা করে— তারপর এতগুলো রাত এমনভাবে কেটে গেলো যে তারা ক্লান্ত হ'য়ে চেষ্টা করাই ছেড়ে দিলে। ক্লোতিল্‌দের ঘুমের ধরনটাও জেনে গেলো তোবিয়াস। সে আবিষ্কার করলে, যখন গরম আরো অসহ্য হ'য়ে ওঠে তার বাঁশির মতো নাকের ডাক কী-রকম উঁচু পর্দায় ওঠে, তারপর জুলাইয়ের ঝিম-ধরা গরমে কেমন অলস বিলম্বিত একটা সুর হ'য়ে ওঠে।

গোড়ায় তোবিয়াস সমুদ্রের ওপর নজর রেখেছিলো যারা সমুদ্রকে ভালো ক'রে চেনে তাদের মতোই—দিগন্তে একটাই বিন্দুর ওপর স্থির আটকে রাখতো চোখ। তাকে সে দেখলো রং বদলাতে। দেখলো সেটাকে তার আলো নিভিয়ে ফেনিল আর ঘোলাটে হ'য়ে উঠতে, দেখলো যখন ঝড়তুফান তার পেটটায় মোচড় দেয় আর কেমন ক'রে সে আবর্জনায় ভরা ঢেকুর তোলে। আস্তে-আস্তে সে শিখে গেলো যারা আরো ভালো ক'রে সমুদ্রের ওপর নজর রাখতে পারে তাদের ধরন: তারা মোটেও দৃক্‌পাতই করে না তার দিকে, অথচ এমনকী ঘুমের ঘোরেও কখনও তার কথাও ভুলেও যায় না।

বুড়ো হাকোবের স্ত্রী মারা গেলো আগস্টে। ঘুমের মধ্যেই মরলো সে, আর তারা অন্য-সকলের মতোই তাকেও ফুলবিহীন এক সমুদ্রে ভাসিয়ে দিলে। তোবিয়াস অপেক্ষা ক'রেই রইলো। অ্যাদ্দিন ধ'রে সে অপেক্ষা করছে যে অপেক্ষাটাই তার বাঁচন হ'য়ে উঠছে। এক রাত্তিরে সে যখন তার দোলখাটিয়ায় ঢুলছে, সে টের পেলে হাওয়ায় যেন কিছু-একটা বদল হ'য়ে গেছে। সবিরাম একটা গন্ধের ঢেউ, থেমে-থেমে, আসছে—সেই যে-বার বন্দরের মুখটায় একটা জাপানি জাহাজ ধাক্কা লাগিয়েছিলো পচা পেঁয়াজে-ভরা মালবওয়া এক জাহাজের সঙ্গে, বন্দরের ঠিক মুখটায়, তারই মতো একটা ঢেউ। তারপর ঘন হ'য়ে গেলো গন্ধটা, আর ভোর না-হওয়া অব্দি রইলো নিশ্চল। শুধু যখন তার মনে হ'লো সে বুঝি এখন এটাকে হাতে ক'রে তুলে নিয়ে গিয়ে দেখাতে পারবে, তোবিয়াস লাফিয়ে নামলে তার দোলখাটিয়া থেকে আর গিয়ে হাজির হ'লো ক্লোতিল্‌দের ঘরে। সে তাকে ঝাঁকুনি দিলে।

বললে, 'এসেছে। এসে গেছে।'

উঠতে গিয়ে ক্লোতিল্‌দেকে মাকড়শার জালের মতো গন্ধটাকে ঝেড়ে ফেলতে হ'লো। তারপর সে তার কুসুমগরম গুজনির ওপর ধপ ক'রে পড়লো চিৎপাত।

বললে, 'ভগবান একে শাপ দিন।'

তোবিয়াস লাফিয়ে গেলো দরজার দিকে, রাস্তার ঠিক মাঝখানে গিয়ে হল্লা জুড়ে দিলে। গায়ের জোরে সে চ্যাঁচালে, গভীর একটা দম নিয়ে আবার চেঁচিয়ে উঠলো, তারপর একটু চুপচাপ, সে আরো গভীরভাবে শ্বাস টেনে নিলে, সমুদ্রের ওপর এখনও আছে গন্ধটা! কিন্তু কেউ তার চ্যাঁচামেচিতে সাড়া দিলে না। তারপর সে বাড়ি-বাড়ি গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলো, যে-সব বাড়িতে লোক থাকে না, এমনকী সে-সব বাড়িতেও—তারপর তার হল্লাটা জট পাকিয়ে গেলো কুকুরের ডাকের সঙ্গে—আর সে সকলকে জাগিয়ে ফেললে।

তাদের অনেকেই গন্ধটা শুঁকে পেলে না। কিন্তু অন্যরা বিশেষ ক'রে বুড়োরা বেলাভূমিতে চ'লে গেলো গন্ধটা তারিয়ে-তারিয়ে চাখতে। আঁটো, সংহত, একটা সৌরভ, অতীতের আর-কোনো গন্ধের জন্যে সে একটুও ফাঁক রাখেনি। কেউ-কেউ, শুঁকে-শুঁকে এত ক্লান্ত ও অবসন্ন যে বাড়ি ফিরে গেলো। বেশির ভাগ লোকই তাদের রাতের ঘুমটা সারবার জন্যে বেলাভূমিতেই থেকে গেলো। ভোর নাগাদ গন্ধটা এমনই শুদ্ধ হ'য়ে উঠলো যে সে-গন্ধে শ্বাস নিতেও কেমন মন খারাপ হ'য়ে যাচ্ছিলো।

দিনের বেশির ভাগটাই তোবিয়াস ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলে। সিয়েস্তার সময় ক্লোতিল্‌দে তাকে পাকড়ালে, বিকেলটা তারা কাটালে বিছানায় হুল্লোড় ক'রে—উঠোনের দিকের দরজাটা অব্দি তারা বন্ধ করেনি। প্রথমে তারা প্রেম করলে কেন্নোদের মতো, তারপর যেমনভাবে করে খরগোশরা, শেষটায় কচ্ছপের মতো—যতক্ষণ-না বিষণ্ণ হ'য়ে উঠলো পৃথিবী, আর তারপরেই অন্ধকার এসে হাজির। হাওয়ায় এখনও ফুলের গন্ধ—গোলাপের গন্ধের রেশ। মাঝে-মাঝে গানবাজনার ঢেউ এসে পৌঁছুচ্ছে শোবার ঘরে।

'সুরটা আসছে কাতারিনোর আখড়া থেকে,' ক্লোতিল্‌দে বললে। 'কেউ নিশ্চয়ই এসেছে শহরে।'

এসেছে তিনজন পুরুষ আর একজন মেয়ে। কাতারিনো ভেবেছিলো পরে হয়তো আরো অনেকে এসে হাজির হবে, চেষ্টা করেছিলো তার গ্রামোফোনটা সারাতে। যেহেতু তার পক্ষে সেটা মেরামত করা সম্ভব হ'লো না, সে পাঞ্চো আপেরিসিদোরকে অনুরোধ করলে, পাঞ্চো আপেরিসিদোর নিজের যেহেতু কোনো-কালেই কিছু ছিলো না সে সবরকম কাজ কারবার করে ফুটফরমাশ খাটে, তাছাড়া যন্ত্রপাতিভরা একটা বাক্স তার আছে, আছে একজোড়া চালাকচতুর হাত।

কাতারিনোর আখড়াটা একটা কাঠের বাড়ি, আলাদা, দূরে-সরানো, সমুদ্রের

দিকে মুখ খোলা। বেঞ্চি আর ছোটো-ছোটো টেবিল সাজানো একটা মস্ত ঘর, পেছনে রয়েছে আরো গোটা কতক শোবার ঘর। পাঞ্চো আপেরিসিদোর কাজ দেখতে-দেখতে তিন পুরুষ আর এক মেয়ে চুপচাপ পানশালায় ব'সে পান ক'রে যাচ্ছিলো আর পালা ক'রে হাই তুলছিলো।

কয়েকবার চেষ্টার পর গ্রামোফোনটা ভালোই কাজ করলে। যখন তারা গানের সুর শুনতে পেলে, সুদূরাগত কিন্তু স্পষ্ট, লোকে কথাবার্তা থামিয়ে পরস্পরের দিকে তাকালে। একটুক্ষণ তারা ভেবেই পেলে না কী বলবে, কারণ তখনই তারা টের পেয়েছে শেষ যে-বার তারা কোনো গান শুনেছিলো তারপরে এখন তারা কতটা বুড়িয়ে গেছে।

নটার পরেও তোবিয়াস দেখতে পেলে সব্বাই জেগে আছে। তারা দরজার কাছে ব'সে-ব'সে কাতারিনোর পুরোনো রেকর্ডগুলো শুনছে, লোকে যেভাবে গ্রহণ দ্যাখে তেমনি-একটা ছেলেমানুষি নিয়তিবাদের ভঙ্গি তাদের মুখে-চোখে। প্রতিটি রেকর্ড তাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে কোনো মৃতের কথা, দীর্ঘ রোগভোগের পর খাবারের স্বাদ, কিংবা পরদিন তাদের যা করবার কথা ছিলো অনেককাল আগে, কিন্তু ভুলে গিয়েছিলো ব'লে সে-কাজ তারা করেনি।

গান থামলো এগারোটা নাগাদ। অনেকে শুতে চ'লে গেলো, ভাবলে বৃষ্টি পড়বে নিশ্চয়ই, কারণ সমুদ্রের ওপর একটা কালো মেঘ ঝুলছে। কিন্তু মেঘ নিচে নেমে এলো, জলের ওপর ভেসে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর টুপ ক'রে জলে ডুবে গেলো। ওপরে রইলো শুধু তারারাই। একটু পরে, শহর থেকে বেরিয়ে গেলো হাওয়া, ফিরে এলো গোলাপের গন্ধ নিয়ে।

'ঠিক যা আমি বলেছিলাম আপনাকে, হাকোব,' দোন মাহিমো গোমেস বিস্মিত স্বরে ব'লে উঠলেন। 'আবার ফিরে এসেছে। ঠিক জানি এখন থেকে রোজ রাতেই আমরা গন্ধটা পাবো।'

'ভগবান না-করুন,' বললে বুড়ো হাকোব। 'ঐ গন্ধই আমার জীবনে একমাত্র জিনিশ যা বড্ড দেরি ক'রে এলো আমার কাছে।'

ফাঁকা দোকানঘরে ব'সে-ব'সে তারা চেকার খেলছিলো, রেকর্ডগুলোর দিকে তেমন-একটা মন দেয়নি। তাদের স্মৃতিগুলো এতই প্রাচীন যে এ-সব রেকর্ড সেই তুলনায় তেমন পুরোনো নয় যে তাদের মনে সাড়া তুলবে।

'আমার দিক থেকে বলতে পারি, এর কিছুই আমি বিশ্বাস করি না,' দোন মাহিমো গোমেস বললেন। 'এত বছর ধ'রে ধুলো খাবার পর, কত-কত মেয়ে

যারা ফুলগাছ লাগাবে ব'লে একটুখানি জমি চাচ্ছিলো, এটা মোটেই আশ্চর্য নয় যে শেষটায় কেউ এ-রকম গন্ধ পাবে আর এমনকী এও ভেবে বসবে যে গন্ধটা বুঝি সত্যি।'

'কিন্তু আমরা তো নিজের নাকেই গন্ধটা পাচ্ছি,' বললে বুড়ো হাকোব।

'তাতে কিছু এসে-যায় না,' বললেন দোন মাহিমো গোমেস। 'যুদ্ধের সময়, বিপ্লব যখন হেরেই গিয়েছে, আমরা মনে-প্রাণে এমনভাবে একজন জেনারেলকে চাচ্ছিলাম যে আমরা দেখেছিলাম স্বয়ং ডিউক অভ মার্লবরো সশরীরে এসে হাজির। আমি নিজের চোখে মামব্রুককে দেখেছিলাম, হাকোব।'

তখন মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। যখন একা হ'লো বুড়ো হাকোব দোকানের ঝাঁপ বন্ধ ক'রে বাতিটা নিয়ে গেলো শোবার ঘরে। জানলা দিয়ে—সমুদ্রের ফসফরের আলোয় রেখায়িত—সে দেখতে পেলে দূরের উত্তুঙ্গ পাহাড়চূড়া যেখান থেকে তারা মৃতদেহগুলো জলে ছুঁড়ে ফ্যালে।

'পেত্রা,' নরম স্বরে সে ডাক দিলে।

পেত্রা তাকে শুনতে পায়নি। সেই মুহূর্তে, সে প্রায় জলের ওপর দিয়েই ঝকঝকে মধ্যদিনের সূর্যের তলায় বঙ্গোপসাগর দিয়ে ভেসে যাচ্ছিলো। সে তার মাথা তুলেছিলো জলের মধ্য দিয়ে তাকাবে ব'লে, যেন কোনো অলৌকিক কাচে তৈরি প্রদর্শনীবাক্স, মস্ত একটা সাগরগামী জাহাজের দিকে। কিন্তু তার স্বামীকে সে দেখতে পায়নি, যে তখন জগতের অন্য প্রান্তে ফের শুনতে শুরু করেছে কাতারিনোর গ্রামোফোন।

'শুধু ভাবো একবার,' বুড়ো হাকোব বললে। 'ছ-মাসও কাটেনি তারা ভেবেছিলো তোমার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে, অথচ যে-গন্ধটা তোমার মরণ ডেকে আনলো তার উদ্দেশে তারা কিনা একটা উৎসব শুরু ক'রে দিয়েছে।'

আলো নিভিয়ে দিয়ে সে বিছানায় উঠে বসলো। খুব আস্তে-আস্তে ফুঁপিয়ে কাঁদছে সে, বুড়োদের ফোঁপানোর মধ্যে যে-রকম ছিরিছাঁদহীন কেমন-একটা কাৎরানির ভাব থাকে, সেইরকম। তবে একটু পরেই সে ঘুমিয়ে পড়লো।

'পারলে এ-শহর ছেড়ে আমি চ'লে যেতাম,' ছটফট করতে-করতে সে ফোঁপায়। 'সোজা নরকেই চ'লে যেতাম, কিংবা অন্য-কোথাও, শুধু যদি কুললে কুড়িটা পেসো জোগাড় করতে পারতাম।'

সে-রাত্তির থেকে, কয়েক সপ্তাহ ধ'রে, গন্ধটা র'য়েই গেলো সমুদ্রে। গন্ধটা সেঁধিয়ে গেলো বাড়িঘরের কাঠ, খাবারদাবার, খাবার জলে : এই গন্ধের হাত থেকে

পালাবার কোনো উপায়ই ছিলো না। অনেকেই আঁৎকে গিয়ে দেখলে তাদের গুয়ের ভাপ থেকেও গন্ধটা উঠছে। যে-লোকগুলো আর মেয়েটি কাতারিনোর আখড়ায় এসেছিলো তারা এক শুক্রবারে চ'লে গেলো, কিন্তু শনিবারেই তারা ফিরে এলো সঙ্গে একটা ভিড় জমিয়ে। আরো-লোকজন এসে হাজির রোববারে। একেক জায়গায় একবার ঢুকছে একবার বেরুচ্ছে, পিঁপড়ের পালের মতো, কোথাও খেতে চায়, কোথাও চায় মাথা গোঁজার একটা আস্তানা, শেষটায় রাস্তা দিয়ে হাঁটাচলাই অসম্ভব হ'য়ে উঠলো।

আরো লোক এলো। শহরটা যখন ম'রে গিয়েছিলো, তখন যে-মেয়েরা কেটে পড়েছিলো, তারা ফিরে এলো কাতারিনোর আখড়ায়। অনেক পৃথুলা তারা এখন, পুরু প্রলেপ লাগিয়েছে প্রসাধনে, তারা নিয়ে এসেছে একেবারে হাল আমলের অনেক রেকর্ড, যেগুলো কাউকেই কোনোকিছুর কথাই মনে করালো না। শহরের আগেকার বাসিন্দাদেরও কেউ-কেউ ফিরে এলো। তারা কুখ্যাত ও ক্রোড়পতি হ'তে গিয়েছিলো অন্যকোথাও, ফিরেও এলো তাদের ধনদৌলতের কথা বলতে-বলতে, তবে যে-পোশাক প'রে গিয়েছিলো সেই পোশাকেই তারা ফিরে এলো। এলো গানবাজনার দল, বাজিকর, খেলা দেখানেওলারা, ভাগ্যচক্রের পাক, ভাবীকথক আর বন্দুকবাজ, ঘাড়ে-গর্দানে পোষা সাপের পাক লাগিয়ে কেউ-কেউ বিক্রি করছিলো চিরযৌবনের অমৃতসালসা। অনেক সপ্তাহ ধ'রেই পর-পর এলো তারা, এমনকী প্রথম বৃষ্টি পড়বার পর সমুদ্র যখন ফুঁসে উঠেছে আর গন্ধ উধাও—তখনও তারা এলো।

শেষের দলে এসেছিলো এক পাদ্রে। সবখানে সে ঘুর-ঘুর করলে, সে রুটি খায় পাৎলা কফিতে চুবিয়ে, আর একটু-একটু ক'রে সে—তার আগে যারা এসেছিলো তাদের সবকিছুর ওপর—জারি ক'রে দিলে নিষেধাজ্ঞা: ভাগ্যচক্র, নবগীতিকা, এবং তার সঙ্গে তাল রেখে যে-ভাবে নাচে লোকে তার ধরন, এমনকী বেলাভূমিতে গিয়ে শোবার নতুন অভ্যেসটা শুদ্ধ। একদিন সন্ধেয়, মেলচোরের বাড়িতে, সে সমুদ্রের গন্ধ নিয়ে কথামৃত শোনালে।

'শিশুগণ, তোমরা স্বর্গকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো,' সে বললে, 'কেননা ইহা স্বয়ং ঈশ্বরেরই সৌরভ।'

কেউ-একজন তাকে বাধা দিলে।

'তা আপনি কেমন ক'রে বলবেন, পাদ্রে? আপনি তো এখনও গন্ধটা শোঁকেনওনি।'

'ধর্মশাস্ত্র,' পাদ্রে বললে, 'এই সৌরভ বিষয়ে অতীব স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল। আমরা একটি নির্বাচিত গ্রামে আছি।'

তোবিয়াস মেলায় এমনভাবে যাওয়া-আসা করছে যেন সে ঘুমের ঘোরে চলাফেরা ক'রে বেড়াচ্ছে। একদিন সে ক্লোতিল্‌দেকে নিয়ে গেলো টাকা কাকে বলে দেখাতে। রুলেটের চাকা যখন ঘুরছে, তারা এলেবেলে ভান করলে যেন অনেক টাকা বাজি ধরেছে, তারপরে তারা অঙ্কগুলো সব যোগ ক'রে নিলে, আর নিজেদের মনে হ'লো বিরাট বড়োলোক—যে-টাকা তারা জুয়োয় জিততে পারতো, তার বলেই। কিন্তু একরাত্তিরে শুধু তারা নয় পুরো ভিড়টাই এক-জায়গায় এত টাকা দেখলে যে অত টাকা যে কোথাও থাকতে পারে তা-ই তারা কল্পনা করেনি।

সেই রাত্তিরেই এসেছিলেন মিস্টার হার্বার্ট। তিনি উদিত হলেন আচমকা, রাস্তার মাঝখানে একটা টেবিল পাতলেন, টেবিলের ওপর রাখলেন দুটি মস্ত তোরঙ্গ, যা থেকে তাড়া-তাড়া ব্যাঙ্কনোট উপচে পড়ছে। ওখানে যে অত টাকা ছিলো গোড়ায় তা কেউ খেয়ালও করেনি, এমন-যে কখনও সত্যি হ'তে পারে তা-ই তারা বিশ্বাস করেনি। কিন্তু যখন মিস্টার হার্বার্ট একটা ঘণ্টা বাজাতে শুরু করলেন, তখন লোককে তা বিশ্বাস করতেই হ'লো, তারা তাঁকে শুনতে গেলো।

'পৃথিবীর মধ্যে আমিই সবচেয়ে বড়োলোক,' মিস্টার হার্বার্ট বললেন। 'আমার এতই টাকা যে সে-টাকা রাখবার মতো জায়গাই পাচ্ছি না আমি। আর তা ছাড়া আমার দিলটাও এতই দরাজ যে আমার বুকে সে-টাকা রাখবার কোনো জায়গা নেই দেখে আমি ঠিক করেছি সারা জগতে ঘুরে-ঘুরে মানবজাতির যাবতীয় সমস্যার সমাধান করবো।'

মিস্টার হার্বার্ট লোকটা ঢ্যাঙা আর লালচে। তিনি কথা বলেন গাঁক-গাঁক ক'রে, তোড়ে, একবারও না-থেমে, সেইসঙ্গে তিনি নাড়েন ঈষদুষ্ণ নির্জীব একজোড়া হাত—দেখে মনে হয় এক্ষুনি যেন হাতের লোম কামানো হয়েছে। পনেরো মিনিট একনাগাড়ে কথা ব'লে তিনি জিরোলেন। তারপর তিনি ছোট্ট ঘণ্টাটি বাজিয়ে আবার কথা বলতে শুরু ক'রে দিলেন। তাঁর ভাষণের আদ্ধেক যখন হয়েছে, তখন ভিড়ের মধ্যে কেউ তার টুপি নেড়ে তাঁকে বাধা দিলে।

'শুনুন, মিস্টার, অত বুকনি না-ঝেড়ে টাকাটা বরং চটপট ছড়াতে শুরু ক'রে দিন।'

'অত তাড়া নয়,' মিস্টার হার্বার্ট জবাব দিলেন। 'কোনো যুক্তি-টুক্তির বালাই

না-রেখে শুধুমুদু টাকা ছড়ালেই কি হ'লো ? সে-যে শুধু বেআইনি কাজই হবে তা-ই নয়, তার কোনো মাথামুণ্ডু মানেই থাকবে না।'

যে-লোকটা তাঁকে বাধা দিয়েছিলো তাকিয়ে তাকে বার ক'রে এগিয়ে আসতে ইশারা করলেন মিস্টার হার্বার্ট। ভিড় স'রে গিয়ে তাকে পথ ক'রে দিলে।

'অন্যদিক থেকে,' মিস্টার হার্বার্ট ব'লে চললেন, 'আমাদের এই ব্যগ্র ও অধীর বন্ধু নিশ্চয়ই আমাদের একটা সুযোগ দেবেন যাতে সম্পদের সমবণ্টন কী ক'রে সম্ভব সেটা ব্যাখ্যা ক'রে বোঝানো যায়।' তিনি একটা হাত বাড়িয়ে তাকে তুলে নিলেন।

'কী নাম তোমার ?'

'পাত্রিসিও।'

'আচ্ছা, পাত্রিসিও,' মিস্টার হার্বার্ট বললেন, 'অন্য-সকলের মতোই তোমারও নিশ্চয়ই এমন-কোনো সমস্যা আছে তুমি অ্যাদ্দিনেও যার কোনো সুরাহা করতে পারোনি।'

পাত্রিসিও তার টুপিটা খুলে নিয়ে ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

'সেটা কী, শুনি ?'

'তো, আমার ফ্যাসাদ হ'লো এটাই,' পাত্রিসিও বললে, 'যে আমার কোনো টাকা নেই।'

'কত চাই তোমার ?'

'আটচল্লিশ পেসো।'

মিস্টার হার্বার্ট একটা বিজয়ীর নিনাদ করলেন। 'আটচল্লিশ পেসো,' তিনি আওড়ালেন ফের। হাততালি দিয়ে। ভিড়ও তাঁর সঙ্গে হাততালি দিলে।

'খুব ভালো কথা, পাত্রিসিও,' মিস্টার হার্বার্ট ব'লে চললেন। 'এবার আমাদের একটা কথা বলো দেখি : তুমি কী করতে পারো ?'

'অনেক কিছু।'

'একটা-কিছু ঠিক ক'রে নাও,' মিস্টার হার্বার্ট বললেন : 'এমনকিছু যা তুমি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পারো।'

'বেশ,' পাত্রিসিও বললে। 'আমি অনেক পাখি করতে পারি।'

দ্বিতীয় দফা হাততালি দিয়ে মিস্টার হার্বার্ট ভিড়ের দিকে ফিরলেন।

'তাহ'লে, এবার, লেডিস অ্যাণ্ড জেণ্টলম্যান, আমাদের দোস্ত পাত্রিসিও, যে আশ্চর্য নকল করতে পারে পাখির ডাক, আমাদের এবার আটচল্লিশ রকম

ভিন্ন-ভিন্ন পাখির ডাক নকল ক'রে শোনাবে—আর এইভাবে তার জীবনের কঠিন মুশকিলটার আসান হ'য়ে যাবে।'

ভিড়ের চমকে-যাওয়া স্তব্ধতায় পাত্রিসিও তখন তার পাখিদের নকল ক'রে শোনালে, কখনও শিস দিয়ে, কখনও গলা থেকে সব চেনা পাখিদের ডাক সে নকল করলে, তারপর শেষ করলে এমন-সব পাখির ডাক ডেকে কেউই যাদের শনাক্ত করতে পারলে না। যখন সে শেষ করলে, মিস্টার হার্বার্ট আরো একদফা হাততালির আহ্বান জানিয়ে, গুনে-গুনে আটচল্লিশটা পেসো দিলেন তাকে।

বললেন : 'আর এবার একজন-একজন ক'রে এসো। আগামী কাল এ-সময় অব্দি এখানে আমি থাকবো—সব মুশকিলই আসান ক'রে দেবো।'

বুড়ো হাকোব এই চাঞ্চল্য জানতে পারলে তার বাড়ির পাশ দিয়ে চলাফেরার সময় লোকের মন্তব্য থেকে। একেক টুকরো খবর পায় আর তার বুক ফুলে ওঠে—শেষটায় তার মনে হ'লো তার বুকটা বুঝি ফেটেই যাবে।

'এই গ্রিঙ্গোটি সম্বন্ধে আপনি কী ভাবছেন?' সে শুধোলে।

দোন মাহিমো গোমেস কাঁধ ঝাঁকালেন। 'নিশ্চয়ই কোনো দাতা-টাতা হবে।'

'ঈশ, আমি যদি একটা-কিছু করতে পারতাম,' বুড়ো হাকোব বললে। 'আমার ছোট্ট সমস্যাটার তবে এক্ষুনি সমাধান করতে পারতাম। খুব বেশি তো আর নয়—মাত্র কুড়ি পেসো।'

'আপনি তো চমৎকার চেকার খেলেন,' দোন মাহিমো গোমেস বললেন।

দেখে মনে হ'লো বুড়ো হাকোব বুঝি তার কথায় কোনোই কান দেয়নি, কিন্তু একা হবা মাত্র সে ছকটা আর শাদা-কালো ঘুঁটির বাক্সটা একটা খবর কাগজে জড়িয়ে মিস্টার হার্বার্টকে খেলায় চ্যালেঞ্জ করতে বেরিয়ে পড়লো। তার পালা আসার জন্যে সে মাঝরাত অব্দি অপেক্ষা ক'রে রইলো। শেষটায় মিস্টার হার্বার্ট তাদের দিয়ে তাঁর তোরঙ্গগুলো গুছিয়ে নিয়ে পরদিন সকাল অব্দি বিদায় জানালেন।

তিনি কিন্তু শুতে যাননি। যে-লোকগুলো তাঁর তোরঙ্গগুলো ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছিলো, আর যে-ভিড়টা তাঁর পেছন-পেছন সারাটা পথ তাদের সমস্যাগুলো নিয়ে আসছিলো, তাদের সবাইকে নিয়ে তিনি দেখা দিলেন কাতারিনোর আখড়ায়। একটু-একটু ক'রে তিনি সুরাহা ক'রেই চললেন সব সমস্যা, শেষটায় আখড়ার মধ্যে শুধু তারাই রইলো যে-সব লোকের সমস্যা আগেই মিটিয়ে দেয়া গেছে, আর রইলো কয়েকজন মেয়ে। আর ঘরের পেছনটায় একজন মেয়ে একা-একা ব'সে একটা কার্ডবোর্ডের বিজ্ঞাপন দিয়ে নিজেকে হাওয়া ক'রে যাচ্ছিলো।

'তোমার ব্যাপারটা কী?' মিস্টার হার্বার্ট তাকে লক্ষ্য ক'রে চ্যাঁচালেন। 'তোমার সমস্যাটা কী?'

মেয়েটি নিজেকে হাওয়া করা বন্ধ করলে।

'তোমার হুল্লোড়টার সঙ্গে আমাকে জড়াবার চেষ্টা কোরো না, মিস্টার গ্রিঙ্গো,' সে ঘরের ওপাশ থেকে চেঁচিয়ে বললে। 'আমার কোনো সমস্যা নেই—আমি হচ্ছি বেশ্যা আর এ-সব আমার বিচি থেকে আসে।'

মিস্টার হার্বার্ট তাঁর কাঁধ ঝাকালেন। অন্য-সব সমস্যার জন্যে অপেক্ষা করতে-করতে খোলা তোরঙ্গগুলোর পাশে ব'সে তিনি ঠাণ্ডা বিয়ার খেয়ে চললেন। একটু পরে, পাশের টেবিলে মেয়েদের যে-দলটা বসেছিলো তাদের মধ্য থেকে একটি মেয়ে উঠে এসে নিচু গলায় তাঁকে কী যেন বললে। তার একটা পাঁচশো পেসো বড়ো সমস্যা আছে।

'সেটা তুমি ভাগ করবে কী ভাবে?' মিস্টার হার্বার্ট তাকে জিগেশ করলেন।

'পাঁচ দিয়ে।'

'ভাবো একবার!' মিস্টার হার্বার্ট বললেন: 'সে তো একশোজন মরদ।'

'তাতে কিছু এসে-যায় না,' সে বললে। 'যদি সব টাকাটা তুলতে পারি তবে এরাই আমার জীবনের শেষ একশোজন মরদ হবে।'

মিস্টার হার্বার্ট তার ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন। মেয়েটিব কচি বয়েস, হাড়-গুলো যেন পলকা আর নরম, কিন্তু তার চোখে সরলসোজা একটা সিদ্ধান্তের ছাপ।

'ঠিক আছে,' মিস্টার হার্বার্ট বললেন। 'তুমি তোমার ঘরে যাও, আমি একজন একজন ক'রে পাঁচ পেসো দিয়ে তোমার ঘরে লোক পাঠাবো।'

রাস্তার দিকের দরজাটার কাছে গিয়ে তিনি তাঁর ছোট্ট ঘণ্টাটা বাজালেন।

সকালে, সাতটার সময়, তোবিয়াস দেখতে পেলে কাতারিনোর আখড়ার ঝাঁপ ওঠানো। সব আলো নেভানো। বিয়ারে ফুলে গিয়ে, আধো ঘুমের ঘোরে, মিস্টার হার্বার্ট মেয়েটির ঘরে লোকের ঢোকা নিয়ন্ত্রণ করছেন।

তোবিয়াসও ভেতরে গেলো। মেয়েটি তাকে চিনতে পারলে: তাকে তার ঘরে দেখে ভারি অবাক হ'য়ে গেলো।

'তুমিও?'

'ওরা আমাকে বললে ভেতরে আসতে,' তোবিয়াস বললে। 'ওরা আমাকে পাঁচটা পেসো দিয়ে বললে বেশি সময় যেন না-নিই।'

মেয়েটি ভেজা চাদরটা বিছানা থেকে তুলে নিয়ে তোবিয়াসকে বললে অন্য

ধারটা ধরতে। একেবারে কেম্বিস কাপড়ের মতো ভারি হ'য়ে আছে চাদরটা। তারা দুটো কিনার ধ'রে সেটাকে পাকিয়ে নিংড়ে অবশেষে সেটার স্বাভাবিক ওজন ফিরিয়ে নিয়ে এলো। তারা জাজিমটাকে উলটে দিলে, আর জাজিম ফুঁড়ে এ-পাশটাতেও ঘাম বেরিয়ে এলো। যতটা পারে ভালোভাবেই কাজগুলো সারলে তোবিয়াস। বেরিয়ে যাবার সময় সে বিছানার পাশে স্তূপ-ক'রে-রাখা নোটগুলোর ওপর পেসো পাঁচটা রাখলে।

'যত জনকে পারো পাঠিয়ে দিয়ো,' মিস্টার হার্বার্ট তাকে অনুরোধ করলেন। 'দেখি, দুপুরের আগেই ব্যাপারটার সুরাহা ক'রে চুকিয়ে ফেলা যায় কি না।'

মেয়েটি দরজাটা এক চিলতে ফাঁক ক'রে একটা ঠাণ্ডা বিয়ার চাইলো। তখনও কয়েকটি লোক অপেক্ষা ক'রে আছে।

'আর ক-জন বাকি?' মেয়েটি জিগেশ করলে।

মিস্টার হার্বার্ট উত্তর করলেন: 'তেষট্টি জন।'

বুড়ো হাকোব সারাটা দিন তাঁর অনুসরণ ক'রে বেড়ালে তার চেকার খেলার ছক নিয়ে। তার পালা এলো রাত্রি নামলে: সে তার জটিলতাটা সরাসরি টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখলে, আর মিস্টার হার্বার্ট চ্যালেঞ্জটা নিলেন। রাস্তার মাঝখানে বড়ো টেবিলটার ওপর তারা দুটো চৌকি আর একটা ছোটো টেবিল পাতলো। আর প্রথম চালটা দিলে বুড়ো হাকোব নিজে। এটাই তার শেষ খেলা যেটা সে গোড়া থেকে নিজে ছ'কে নিয়েছিলো। সে হেরে গেলো।

'চল্লিশ পেসো,' মিস্টার হার্বার্ট বললেন। 'আর আমি আপনাকে দু-দুটো চালের হ্যাণ্ডিকাপ দেবো।'

মিস্টার হার্বার্ট আবারও জিতলেন। তাঁর হাত যেন ঘুঁটিগুলোকে ছোঁয়ই না। চোখ বেঁধে খেললেন তিনি, মনে-মনে অনুমান ক'রে নিলেন প্রতিপক্ষের সব চাল, আর তবু জিতলেন। দেখে-দেখে ভিড় ক্লান্ত হ'য়ে পড়লো। বুড়ো হাকোব যখন হাল ছেড়ে দিলে, তখন সে একুনে পাঁচ হাজার সাতশো বিয়াল্লিশ পেসো ও তেইশ সেণ্ট ধার ক'রে ফেলেছে।

বুড়ো হাকোবের মুখের ভাবে কোনোই বদল হ'লো না। পকেটে তার যে একচিলতে কাগজ ছিলো তাতে সে টাকার অঙ্কটা টুকে নিলে। তারপর সে ভাঁজ করলে তার শতরঞ্জের ছক, ঘুঁটিগুলো রাখলে তাদের বাক্সে, সবকিছু মুড়ে নিলে খবরকাগজে।

'আমাকে নিয়ে যা করতে মন চায়, করুন,' সে বললে, 'তবে এই জিনিশগুলো

আমায় রাখতে দিন। আপনাকে কথা দিচ্ছি ঐ পুরো টাকাটা জোগাড়ের ধান্ধাতেই আমি আমার বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবো।'

মিস্টার হার্বার্ট তাঁর ঘড়ি দেখলেন।

'আমি ভীষণ দুঃখিত,' বললেন তিনি। 'কুড়ি মিনিটের মধ্যেই আপনার মেয়াদ ফুরিয়ে যাবে।' প্রতিপক্ষ যে সুরাহার কোনো পথ খুঁজে বার করতে পারেনি, সেটা নিশ্চিত বোঝবার জন্যে অপেক্ষা করলেন মিস্টার হার্বার্ট। 'বদলি হিশেবে দিতে পারেন, এমন আর-কিছু নেই আপনার?'

'আমার মান সম্মান। ইজ্জৎ।'

'আমি বলতে চাচ্ছি,' মিস্টার হার্বার্ট ব্যাখ্যা করলেন, 'আপনার কি এমন-কিছু আছে একটা রং-মাখা তুলি বোলাবামাত্র যার রং পালটে যায়?'

'আমার বাড়ি.' বুড়ো হাকোব এমনভাবে বললে যেন সে কোনো হেঁয়ালির জট ছাড়াচ্ছে। 'খুব-একটা দাম নেই তার, তবে তবু একটা বাড়ি তো।'

এইভাবেই মিস্টার হার্বার্ট বুড়ো হাকোবের বাড়িটার দখল নিয়ে নিলেন। অন্য যারা ধার শুধতে পারেনি তাদেরও বাড়ি-ঘর সম্পত্তির দখল নিয়ে নিলেন তিনি; তারপর এক সপ্তাহ ধ'রে গানবাজনা, রোশনি, আতশবাজি, বাজিকরদের খেলার আয়োজন করলেন তিনি, পুরো হুল্লোড়টার দায়িত্বে রইলেন নিজে স্বয়ং।

মনে রাখবার মতো একটা সপ্তাহ সেটা। মিস্টার হার্বার্ট শহরের অলৌকিক ভবিতব্যের কথা বললেন, এমনকী নকশা এঁকে বুঝিয়ে দিলেন ভবিষ্যতের শহরটা কেমন হবে, মস্ত-মস্ত সব কাচের দালানকোঠা, ওপরে নাচমঞ্চ। ভিড়কে সেটা তিনি দেখালেনও। তারা তাজ্জব হ'য়ে তাকিয়ে দেখলো সব, চেষ্টা করলো মিস্টার হার্বার্টের রং-বেরঙে ঝলমলে যে-পথচারীদের দেখা যাচ্ছে তাদের মধ্যে নিজেদের আবিষ্কার করতে, কিন্তু সেই পথচারীরা এমন শৌখিন সেজে আছে যে তারা নকশাটার মধ্যে নিজেদের আর শনাক্তই করতে পারলে না। তাঁকে এত কাজে লাগাতে তাদের ভারি কষ্টও হচ্ছিলো। যার তাড়ায় অক্টোবরে ফিরে কাঁদতে হবে, সেই তাড়াটা নিয়ে তারা হাসাহাসি করলে; এই আশার কুয়াশার মধ্যেই তারা বাঁচছিলো, এমন সময় মিস্টার হার্বার্ট তাঁর ছোট্ট ঘণ্টা বাজিয়ে ঘোষণা করলেন যে, ব্যাস, আসর খতম, হুল্লোড় এখন শেষ। শুধু তখনই তিনি খানিকটা বিশ্রাম পেলেন।

'যেভাবে আপনি জীবন কাটাচ্ছেন, তাতে সেই জীবনই আপনার মরণ ঘটাবে,' বুড়ো হাকোব বললে।

'আমার এতই টাকা যে আমার ম'রে যাবার কোনো কারণই নেই,' বললেন মিস্টার হার্বার্ট।

ধপ ক'রে নেতিয়ে পড়লেন তিনি বিছানায়। একনাগাড়ে ঘুমিয়েই চললেন দিনের পর দিন, সিংহের মতো নাক ডাকছে ; এইভাবে এতদিন কেটে গেলো যে লোকে শেষটায় তাঁর জন্যে অপেক্ষা করতে-করতে ক্লান্ত হ'য়ে পড়লো। মাটি খুঁড়ে-খুঁড়ে কাঁকড়াদের বার ক'রে খেতে হ'লো তাদের। কাতারিনোর নতুন রেকর্ড-গুলো অব্দি এত পুরোনো হ'য়ে গেলো যে চোখের জল না-ফেলে কেউ আর এখন তাদের শুনতে পারে না—ফলে তাকে তার আখড়ার ঝাঁপ ফেলে দিতে হ'লো।

মিস্টার হার্বার্ট ঘুমিয়ে পড়বার অনেককাল পরে পাদ্রে এসে বুড়ো হাকোবের দরজায় ঘা দিলে। বাড়িটা ভেতর থেকে কুলুপ আঁটা। ঘুমন্ত লোকটার শ্বাসপ্রশ্বাস এতটাই হাওয়া নিয়ে নিচ্ছে যে জিনিশপত্তর সব তাদের ওজন হারিয়ে ভেসে বেড়াতে শুরু করেছে।

'তাঁর সঙ্গে একটা কথা বলতে চাই আমি,' পাদ্রি বললে।

বুড়ো হাকোব জানালে, 'আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে।'

'হাতে বেশি সময় নেই আমার।'

'বসুন, পাদ্রে, সবুর করুন,' বুড়ো হাকোব ফের জানালে। 'আর এই ফাঁকে বরং আমার সঙ্গেই কথা বলুন। জগতে কী হচ্ছে না-হচ্ছে, আমি তা আর জানি না। —অনেক দিন ধ'রেই জানতে পারিনি।'

'লোকেরা সব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গেছে,' পাদ্রে বললে। 'শহরটার আর আগের মতো হ'য়ে উঠতে খুব বেশি দেরি হবে না। সেটাই একমাত্র নতুন খবর।'

'সমুদ্র থেকে আবার যখন গোলাপের গন্ধ ছড়াবে তখন ওরা সবাই ফের ফিরে আসবে,' বুড়ো হাকোব বললে।

'কিন্তু এর মধ্যে, যারা থেকে গেছে তাদের মোহ-বিভ্রম স্থিইয়ে রাখবার জন্যে কিছু-একটা চাই তো,' পাদ্রি বললে। 'গির্জেটা বানানো এখন খুবই জরুরি।'

'সেইজন্যেই আপনি মিস্টার হার্বার্টের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন?' বুড়ো হাকোব বললে।

'ঠিক,' বললে পাদ্রে। 'গ্রিঙ্গোরা ভারি দাতা হয়।'

'তাহ'লে, পাদ্রে, একটু সবুর করুন,' বুড়ো হাকোব বললে। 'উনি হয়তো এখুনি জেগে উঠবেন।'

তারা চেকার খেললো। ভারি দীর্ঘ আর জটিল হ'লো খেলাটা, বেশ কয়েক-

দিন ধ'রে একটানা খেলা চললো, তবু মিস্টার হার্বার্টের জাগবার কোনো লক্ষণই নেই।

হতাশায় মরিয়া, পাদ্রের মধ্যে সব কেমন তালগোল পাকিয়ে গেলো। সে একটা তামার রেকাবি হাতে ক'রে সবখানে ঘুরে বেড়ালে, গির্জে বানাবার জন্যে দান চাই, কিন্তু খুব-একটা চাঁদা উঠলো না। এত ভিক্ষে চেয়ে-চেয়ে সে ক্রমেই আরো-বেশি স্বচ্ছ টলটলে হ'য়ে উঠছিলো, তার হাড়গোড়গুলো ভ'রে যাচ্ছিলো শব্দে-ধ্বনিতে, আর এক রোববারে সে মাটি থেকে দু-হাত ওপরে উঠে গেলো, কিন্তু কেউই সেটা খেয়াল করলে না। তারপর সে একটা স্যুটকেসে তার কাপড়-চোপড় আর আরেকটা স্যুটকেসে চাঁদার টাকা বোঝাই ক'রে চিরকালের মতো বিদায় জানালে।

'ঐ গন্ধ আর ফিরে আসবে না,' যারা তাকে বিরত করতে চাচ্ছিলো তাদের বললে পাদ্রে। 'তোমাদের এই তথ্যটার মুখোমুখি হওয়া উচিত যে শহরটা চরম পাপে প'ড়ে আছে।'

মিস্টার হার্বার্ট যখন জেগে উঠলেন শহরটা আগে যেমন ছিলো তেমনি হ'য়ে উঠেছে। রাস্তায়-রাস্তায় ভিড় যে-আবর্জনা ছড়িয়েছিলো বৃষ্টি তা গাঁজিয়ে দিয়েছে ; মাটি আবারও ইটের মতো কঠিন আর উষর।

হাই তুলে, মিস্টার হার্বার্ট বললেন : 'অনেকদিন ঘুমোলাম।'

'কয়েক শতাব্দী,' বললে বুড়ো হাকোব।

'খিদেয় ম'রে যাচ্ছি।'

'ম'রে যাচ্ছে অন্য সকলেও,' বললে বুড়ো হাকোব। 'সমুদ্রের তীরে গিয়ে মাটি খুঁড়ে কাঁকড়া বার করা ছাড়া আর-কোনো খাবার নেই।'

তোবিয়াস তাঁকে দেখতে পেলে দু-হাত দিয়ে বালি আঁচড়াচ্ছেন, মুখ থেকে ফেনা বেরিয়ে আসছে, আর সে অবাক হ'য়ে আবিষ্কার করলে যখন বড়ো-লোকেরা খিদেয় হন্যে হ'য়ে যায় তখন তাদের ঠিক গরিবগুরবোদের মতোই দেখায়। মিস্টার হার্বার্ট যথেষ্ট কাঁকড়া পেলেন না। রাত্তিরে তিনি তোবিয়াসকে আমন্ত্রণ করলেন সমুদ্রের তলায় কোনো খাবার পাওয়া যায় কিনা খুঁজে দেখতে তাঁর সঙ্গে যেতে।

'শুনুন,' তোবিয়াস তাঁকে হুঁশিয়ারি দিলে, 'ঐ তলায় কী আছে না-আছে তা শুধু মড়ারাই জানে।'

'বৈজ্ঞানিকরাও জানে,' বললেন মিস্টার হার্বার্ট। 'জলে-ডোবা মানুষদের

যে-সমুদ্র, তার তলায় থাকে কাছিমরা—চমৎকার তাদের মাংস, তোফা। কাপড় খোলো, আর চলো, ঝাঁপিয়ে পড়ি।'

ঝাঁপিয়েই পড়লো দুজনে। গোড়ায় তারা সোজা নাকবরাবর সাঁৎরে গেলো, তারপর ডুব দিলে খুব গভীর জলে, যেখানে সূর্যের আলোই পৌঁছোয় না, তারপর যেখানে সমুদ্রের আলোও আর নেই, সবকিছু যেখানে দেখা যায় যার-যার আপন আলোয়। তারা একটা জলে-ডোবা গ্রাম পেরিয়ে গেলো, যেখানে ঘোড়ার পিঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে নরনারী, গানের শামিয়ানার চারপাশে। চমৎকার দিনটা, অলিন্দে পাতিওতে ঝলমলে সব ফুল ফুটে আছে।

'সকাল এগারোটা নাগাদ ডুবে গিয়েছিলো এই রোববারটা,' মিস্টার হার্বার্ট বললেন। 'নিশ্চয়ই কোনো মহাপ্লাবন হয়েছিলো।'

তোবিয়াস গ্রামটার দিকে যাবে ব'লে ঘুরেছিলো, কিন্তু মিস্টার হার্বার্ট ইশারায় বললেন আরো নিচে যেতে।

'গোলাপ ছিলো ওখানে,' তোবিয়াস বললে। 'আমি ক্লোতিল্‌দেকে জানাতে চাচ্ছিলাম, গোলাপ কাকে বলে।'

'অবসরমতো আবার তুমি এখানে এসো একদিন,' মিস্টার হার্বার্ট বললেন। 'এখন আমি খিদেয় ম'রে যাচ্ছি।'

তিনি নিচে নামলেন কোনো অক্টোপাসের মতো, হাত দিয়ে জল ঠেলছেন মন্থর চোরা ভঙ্গিতে। তোবিয়াস খুব চেষ্টা করছিলো তাঁকে চোখে-চোখে রাখতে, দৃষ্টি থেকে না-হারাতে, ভাবছিলো এইভাবেই নিশ্চয়ই বড়োলোকেরা সাঁতার দেয়। একটু পরে তারা পেছনে রেখে এলো সাধারণ সব সর্বনাশের সমুদ্রকে, এসে পৌঁছুলো মৃতদের সমুদ্রে।

সেখানে এত মড়া যে তোবিয়াস ভাবলে পৃথিবীতেও সে কখনও এত লোক দ্যাখেনি। তারা ভাসছে নিশ্চল, চিৎপাত, বিভিন্ন স্তরে, প্রত্যেককেই দেখাচ্ছে যেন হারিয়ে-যাওয়া ভুলে-যাওয়া আত্মা।

'এরা খুবই পুরোনো মড়া,' মিস্টার হার্বার্ট বললেন। 'এই শান্ত-সমাহিত অবস্থায় এসে পৌঁছুতে এদের অনেক শতাব্দী লেগেছে।'

আরো নিচে, সাম্প্রতিক মৃতদের জলে এসে, মিস্টার হার্বার্ট থামলেন। যেই তোবিয়াস তাঁর নাগাল ধ'রে ফেললে অমনি তাদের সামনে দিয়ে পরমা রূপসী ভারি কচি একটি মেয়ে ভেসে চ'লে গেলো। সে ভাসছে একপাশ ফিরে, তার চোখ দুটি খোলা, পেছন-পেছন ভেসে আসছে ফুলে-ফুলে ভরা স্রোত।

যতক্ষণ-না শেষ ফুলটা ভেসে চ'লে গেলো, মিস্টার হার্বার্ট ঠোঁটে আঙুল তুলে রইলেন।

বললেন: 'জীবনে যত মেয়ে দেখেছি তার মধ্যে এই-ই হ'লো সবচেয়ে সুন্দরী।'

'বুড়ো হাকোবের বৌ ও,' তোবিয়াস বললে, 'তার চেয়ে অন্তত পঞ্চাশ বছরের কচি হবে—তবে এ-ই সে। আমি ঠিক জানি।'

'অনেক ভ্রমণ করেছে সে,' মিস্টার হার্বার্ট বললেন। 'পেছনে যে-ফুল নিয়ে এসেছে, সে-ফুল জগতের সব সমুদ্রের ফুল।'

তারা তলায় এসে পোঁছুলো। ঝকঝকে মসৃণ শ্লেটের মতো মাটিতে বার কয়েক ডিগবাজি খেলেন মিস্টার হার্বার্ট। তোবিয়াসও তাঁরই অনুসরণ করলে। যখন সে গভীরের অর্ধেক আলোয় অভ্যস্ত হ'য়ে গেলো শুধু তখনই সে আবিষ্কার করলে যে কাছিমরা সবাই আছে এখানে, হাজার-হাজার কাছিম, এই তলায় তারা চ্যাপটা হ'য়ে গিয়েছে, এমনই নিশ্চল যে মনে হচ্ছে তারা যেন পাথরের মতো অভিভূত হ'য়ে আছে।

'ওরা জ্যান্তই,' মিস্টার হার্বার্ট বললেন, 'তবে কোটি-কোটি বৎসর ধ'রে ঘুমিয়ে আছে।'

একটাকে তিনি চিৎ ক'রে ফেললেন। হালকা একটা ঠেলা দিলেন তাকে ওপরমুখো আর ঘুমন্ত প্রাণীটি তাঁর হাত থেকে স'রে গিয়ে ওপরে ভেসে উঠতে লাগলো। তোবিয়াস তাকে যেতে দিলে। তারপর সে তাকিয়ে দেখলে ওপরতলটা, আর দেখতে পেলে পুরো সমুদ্রটাই যেন ডিগবাজি খেয়ে আছে।

'স্বপ্নের মতো দেখাচ্ছে,' সে বললে।

'তোমার নিজের ভালোর জন্যেই,' মিস্টার হার্বার্ট বোঝালেন, 'কাউকে এ-কথা বোলো না। লোকে যদি এ-সব কথা জেনে ফ্যালে তাহ'লে পৃথিবীতে কী-হুলুস্থুল প'ড়ে যাবে সেটা একবার ভাবো।'

যখন তারা গ্রামে ফিরে এলো তখন প্রায় মাঝরাত। ক্লোতিল্‌দেকে জাগিয়ে তারা একটু জল গরম করতে বললে। মিস্টার হার্বার্ট কাছিমটা কাটলেন কশাইয়ের মতো, কিন্তু হৃৎপিণ্ডটা তাড়া ক'রে গিয়ে দ্বিতীয়বার সেটা ধরতে তাদের তিনজনকেই ছুটোপাটি করতে হ'লো, কারণ যখন তাকে কাটা হচ্ছিলো হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে চ'লে গিয়েছিলো উঠোনে। অনেকক্ষণ ধ'রে তারা গবগব ক'রে খেলে, তারপর এত খেয়ে আর দম নিতেও পারে না যেন।

'তোবিয়াস,' অতঃপর বললেন মিস্টার হার্বার্ট, 'এবার তো আমাদের বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়।'

'নিশ্চয়ই।'

'আর বাস্তব বলে,' মিস্টার হার্বার্ট ব'লেই চললেন, 'যে গন্ধটা আর ফিরে আসবে না।'

'আসবে। ফিরবেই।'

'আর ফিরে আসবে না,' ক্লোতিল্‌দে বললে, 'অন্যকারণ বাদ দাও—এ তো এমনিতেই কোনোদিন সত্যি-সত্যি আসেনি। তুমিই শুধু সব্বাইকে তাতিয়ে তুলেছিলে।'

'তুমি নিজেও তো গন্ধটা পেয়েছো,' তোবিয়াস বললে।

'সে-রাতে আমি আদ্ধেক ঘোরের মধ্যে ছিলাম,' বললে ক্লোতিল্‌দে। 'কিন্তু এখন—এখন আমি ঠিক জানি না তার সঙ্গে সমুদ্রের কোনো যোগ ছিলো কি না।'

'তাহ'লে আমি আমার পথ দেখি,' মিস্টার হার্বার্ট বললেন। 'আর,' দুজনকেই লক্ষ্য ক'রে আরো জুড়ে দিলেন : 'তোমাদেরও এখান থেকে চ'লে-যাওয়া উচিত। এই শহরে না-খেয়ে মরার চাইতে, পৃথিবীতে তোমাদের কতকিছু করার আছে।'

মিস্টার হার্বার্ট চ'লে গেলেন। তোবিয়াস উঠোনেই থেকে গেলো, দিগন্ত অব্দি এক-এক ক'রে গুনলো তারাগুলো, আর আবিষ্কার করলো যে গত ডিসেম্বরের চাইতে এখন আকাশে তিনটে বেশি তারা। ক্লোতিল্‌দে তাকে শোবার ঘর থেকে ডাক দিলে, কিন্তু সে তাতে কোনো কান দিলে না।

'এখানে এসো, গাডল কোথাকার,' ক্লোতিল্‌দে চাপ দিলে। 'খরগোশের মতো করি না সে-যে কত বছর হ'য়ে গেলো!'

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলে তোবিয়াস। যখন সে শেষকালে ঘরে গেলো, ক্লোতিল্‌দে তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। আদ্ধেক জাগালে সে তাকে, কিন্তু ক্লোতিল্‌দে এতই ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলো যে দুজনেই সব কেমন যেন জট পাকিয়ে ফেললে—শেষটায় নিছক কেন্নোদের মতোই তারা আমোদ করতে পারলে।

'হাঁদার মতো ভাব করছো তুমি,' ঠোঁট ফুলিয়ে বললে ক্লোতিল্‌দে। 'অন্যকিছু ভাবার চেষ্টা করো।'

'আমি অন্যকিছুর কথাই ভাবছি।'

ক্লোতিল্‌দে জানতে চাইলো সেই অন্যকিছুটা কী, আর তোবিয়াস ঠিক করলে

তাকে সে বলবে তবে একটা শর্তে—সে আর-কাউকে সে-কথা বলবে না।

ক্লোতিল্‌দে কথা দিলে।

'সমুদ্রের তলায় না একটা গ্রাম আছে,' তোবিয়াস বললে, 'ছোটো-ছোটো শাদা-শাদা বাড়ি, অলিন্দে পাতিওয় লক্ষ-লক্ষ ফুল।'

ক্লোতিল্‌দে দু-হাত দিয়ে নিজের মাথা চেপে ধরলে।

'ওহ্, তোবিয়াস,' সে যেন আর্তনাদ ক'রেই উঠলো, 'ওহ্, তোবিয়াস, ভগবানের দোহাই, আবার ঐ গণ্ডগোল পাকিয়ে বোসো না।'

তোবিয়াস আর-কিছুই বললে না। বিছানার একপাশে সে গড়িয়ে গেলো, চেষ্টা করলে ঘুমিয়ে পড়তে। তবে ভোরের আগে সে ঘুমোতেই পারলে না—শুধু যখন ভোরবেলায় হাওয়া দিক বদলালো শুধু তখনই কাঁকড়ারা তাকে শান্তিতে ঘুমোতে দিলো।

১৯৬১

জগতের সবচেয়ে-সুন্দর জলে-ডোবা পুরুষ

ছোটোদের গল্প

যে-বাচ্চারা প্রথম দেখেছিলো ঐ কালো আর চুপি-চুপি-আসা ফোলা-ফোলা জিনিশটা সমুদ্দুরের মধ্য থেকে আসছে, তারা গোড়ায় নিজেদের বুঝিয়েছিলো এ নিশ্চয়ই শত্রুপক্ষের কোনো জাহাজ। তারপর তারা দেখতে পেলে যে এর কোনো নিশেনও নেই কিংবা নেই এমনকী মাস্তুলও, তখন তারা ভাবলে যে এ নিশ্চয়ই কোনো তিমিঙ্গিল। কিন্তু ঢেউ যখন সেটা ধুতে-ধুতে আছড়ে এনে ফেললো বেলাভূমিতে, তারা সরালে শ্যাওলার আস্তর, জেলিমাছের সব কর্ষিক আর মাছ আর জাহাজডুবির টুকিটাকি যা লেগে আছে গায়ে, আর তখনই তারা দেখতে পেলে এ-যে এক ডুবে-যাওয়া পুরুষমানুষ।

সারা বিকেলটা তারা তাকে নিয়ে খেলেছিলো, কবর দিচ্ছিলো তাকে বালিতে, ফের তাকে খুঁড়ে-খুঁড়ে তুলছিলো, এমন-সময় দৈবাৎ কে-একজন তাদের দেখতে পেলে আর গাঁয়ে গিয়ে বিপদের সংকেত ছড়িয়ে দিলে। যে-পুরুষরা তাকে ধরাধরি ক'রে সবচেয়ে কাছের বাড়িটায় নিয়ে এলো তারা খেয়াল করলে যে অ্যাদ্দিন তারা যত-সব মৃতদেহ দেখেছে তাদের সকলের চাইতেই এ-লাশটার ওজন অনেক বেশি, প্রায় কোনো-একটা ঘোড়ারই মতো ওজন, আর তারা পরস্পরকে বললে হয়তো সে অনেকদিন ধ'রেই জলে ভাসছিলো, আর তাইতে এমনকী তার হাড়ের মধ্যেও বোধহয় জল ঢুকে গিয়েছে। তারা তখন লাশটাকে মেঝেয় শুইয়ে দিলে আর তারা বলাবলি করলে সব লোকের চাইতেও এ-যে দেখছি লম্বা, ঘরটায় সে প্রায় আঁটেই না যে; তবে, তারা ভাবলে, হয়তো কোনো-কোনো ডুবে-মরা মানুষের প্রকৃতিই থাকে মৃত্যুর পরেও কেবলই বড়ো-হ'তে-থাকা। গায়ে তার দূর সিন্ধুর গন্ধ, শুধু তার আকৃতি দেখেই কেউ আন্দাজ ক'রে নিতে পারে যে সে এক মানুষেরই লাশ, কারণ চামড়াটা তার কাদা আর আঁশের একটা শক্ত আস্তরে ঢেকে গিয়েছে।

মৃত লোকটা যে অচেনা-কেউ, এটা জানবার জন্যে তাদের এমনকী তার মুখটাও ধুয়ে-মুছে সাফ করতে হ'লো না। গ্রামটা গ'ড়ে উঠেছে শুধুমাত্র বিশ-পঁচিশটা

কাঠের বাড়িতে ; সে-সব বাড়ির উঠোন শান-বাঁধানো, কিন্তু কোথাও কোনো ফুল নেই, আর গ্রামটা ছড়িয়ে গেছে কোনো-একটা অন্তরীপের মরুভূমির মতো উষর প্রান্তে। ডাঙা এখানে এতই কম যে মায়েরা সবসময়েই ভয়ে-ভয়ে থাকে কখন হাওয়া এসে তাদের ছেলে-মেয়েদের উড়িয়ে নিয়ে যায়, আর বছরগুলো তাদের মধ্যে যে-কজনকে এখানে সাবাড় করেছে, তাদের তীরের পাহাড় থেকে জলে ছুঁড়ে ফেলতে হয়েছে, কিন্তু সমুদ্র এখানে শান্ত, নিস্তরঙ্গ ও সুন্দর, আর সাত-সাতটা নৌকোতেই গ্রামের সব্বাই এঁটে যায়। কাজেই যখন তারা এই ডুবন্ত লোকটাকে আবিষ্কার করলে, পরস্পরের দিকে শুধু একবার তাকিয়েই তারা নিশ্চিত হ'য়ে নিলে যে সকলেই তারা এখানে আছে।

সে-রাতে তারা আর সমুদ্রে কাজ করতে গেলো না। যখন লোকে হদিশ নিতে গেলো যে আশপাশের গাঁগুলো থেকে কেউ হারিয়ে গেছে কি না, মেয়েরা থেকে গেলো পেছনে, এই ডুবন্ত লোকটার যত্ন-আত্তি করবার জন্যে। ঘাসের চাপড়া দিয়ে ড'লে-ড'লে তারা তার গা থেকে কাদা তুলে নিলে, তারা সরিয়ে দিলে জলের তলার যে-সব নুড়িপাথর তার চুলে জট পাকিয়ে ছিলো, আব যা দিয়ে তারা মাছের আঁশ ছাড়ায় তা-ই দিয়ে তারা তার গায়ের শক্ত আস্তরটা চেঁছে নিলে। এ-সব করতে-করতেই তারা খেয়াল ক'রে দেখলো যে উদ্ভিদ বা শ্যাওলা যা তার গায়ে লেপটে আছে সে-সব এসেছে দূর-দূরান্তরের সাগর থেকে, গভীর জল থেকে, তার জামাকাপড় সব ফালি-ফালি চিলতে মাত্র, যেন সে প্রবালের গোলকধাঁধার মধ্য দিয়েই পাল খাটিয়ে গিয়েছিলো। তারা আরো-খেয়াল করলো যে সে মৃত্যু বহন করেছে স্বগর্বেই, কারণ অন্য-যে-সব ডুবে-যাওয়া লোক আসে সমুদ্র থেকে সে-রকম কোনো নিঃসঙ্গ ভঙ্গি তার নেই, কিংবা নেই সেই কোটরে-বসা খ্যাপা কাতর চোখ যারা ডুবে মরে নদীতে। তবে শুধু যখন তারা তাকে আগাপাশতলা সাফ করলে তখনই আবিষ্কার করলে কেমনতর পুরুষ ছিলো সে আসলে, আর এই আবিষ্কার যেন তাদের দম আটকে দিলে। তাদের দেখা সব পুরুষের মধ্যে সে-যে শুধু সবচেয়ে লম্বা, বলবান, তেজস্বী আর সবচেয়ে সুঠাম সুগঠন পুরুষ ছিলো তা-ই নয়, আরো-কিছু-একটা ছিলো যেন তার মধ্যে ; তবে যদিও তারা তার দিকে হা ক'রে তাকিয়ে ছিলো তাদের কল্পনায় কিন্তু তার জন্যে কোনো ঠাঁই ছিলো না।

সারা গাঁ খুঁজে তারা এমন-একটা বড়ো বিছানা পেলে না যার ওপর তারা তাকে শোয়াতে পারে কিংবা কোনো শক্তপোক্ত টেবিলও মিললো না যেটা তারা

ব্যবহার করতে পারে মৃতদেহের নিশিজাগরের সময়। সবচেয়ে ঢ্যাঙা লোকের ছুটির দিনের পাৎলুনও তার গায়ে লাগে না, সবচেয়ে হোঁৎকা লোকের রোববারের জামাও তার খাটো হয়, আর সবচেয়ে বড়োমাপের পায়ের জুতোতেও তার পা গলে না। তার এই অতিকায় আকৃতি আর রূপে মোহিত হ'য়ে, মন্ত্রমুগ্ধ মেয়েরা ঠিক করলে মস্ত একটা পালের কেম্বিস কাপড় দিয়ে তারা তার জন্যে একটা পাৎলুন বানাবে, আর একটা জামা বানাবে কারু বিয়ের মূল্যবান ক্ষৌম বস্ত্রে, যাতে সে মৃত্যুর মধ্যেও নিজের মর্যাদা বজায় রেখে শুয়ে থাকতে পারে। গোল হ'য়ে ঘিরে ব'সে তারা যখন শেলাই করছে, আর শেলাইয়ের ফোঁড়ের মাঝে-মাঝে লাশটার দিকে তাকাচ্ছে, তখন তাদের মনে হ'লো সে-রাত্রির মতো হাওয়া যেন কখনও এমন অস্থির ছিলো না অথবা সমুদ্রও এমন অশান্ত ছিলো না, আর তারা আন্দাজ করলে এই বদলের সঙ্গে এই মৃতদেহের কোনো সম্বন্ধ আছে নিশ্চয়ই। তারা ভাবলে যে যদি এই গরীয়ান পুরুষ তাদের গাঁয়ে থাকতো, তবে তার বাড়ির দরোজা হ'তো সবচেয়ে প্রশস্ত, ছাত হ'তো সবচেয়ে উঁচু, মেঝে হ'তো সবচেয়ে পোক্ত, তার খাট বানানো হ'তো কোনো জাহাজের পাটাতন দিয়ে যেটা লোহার বলটু দিয়ে লাগানো থাকতো, আর তার স্ত্রী নিশ্চয়ই হ'তো পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মেয়ে। তারা ভাবলে, তার নিশ্চয়ই এতটাই কর্তৃত্ব থাকতো যে সে সমুদ্র থেকে মাছ নিয়ে আসতে পারতো শুধু তাদের নাম ধ'রে ডেকে-ডেকেই আর সে তার জমিতে এতই কাজ করতো যে পাথরের মধ্য থেকেও নিশ্চয়ই ফেটে বেরুতো ফোয়ারা, যাতে সে তীরের শৈলশিরায় বুনে দিতে পারতো ফুলগাছ। গোপনে-গোপনে তারা তাদের নিজেদের পুরুষদের সঙ্গে তার তুলনা করলে, এ-কথাই ভাবলে যে সারা জীবন ধ'রে তারা যা করতে পারতো না সে নিশ্চয়ই সে-কাজ করতে পারতো মাত্র একরাত্রের মধ্যেই, আর তারা তাদের হৃদয়ের একেবারে গভীরে নিজেদের পুরুষদের খারিজ ক'রে দিলে পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্বল, সবচেয়ে তুচ্ছ ও হীন, সবচেয়ে অপ্রয়োজনীয় জীব হিশেবে। তারা তাদের স্বপ্নবিলাসের গোলকধাঁধাতেই এলোমেলো ঘুরে বেড়াচ্ছে, এমন সময় তাদের মধ্যে সবচেয়ে যে প্রবীণা, যে বয়সে বুড়ি হ'য়ে গিয়েছে ব'লেই ডুবে-যাওয়া পুরুষটির দিকে কামনার চাইতে সহানুভূতির সঙ্গেই তাকিয়েছিলো, দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললে :

'এর মুখটা যেন এস্তেবানের।'

সে-কথা সত্যি। বেশির ভাগই তার দিকে আরেকবার তাকিয়ে নিয়েই বুঝতে পারলে যে এস্তেবান ছাড়া অন্য আর-কোনো নামই তার হ'তে পারতো না।

তাদের মধ্যে যারা একটু বেশি জেদি আর একরোখা, তারা আবার বয়েসেও সবার ছোটো ; তারা তখনও কয়েক ঘণ্টার জন্যে এই মায়াবিভ্রমে কাটিয়ে দিলে যে যখন তারা তাকে পোশাক পরাবে আর পেটেণ্ট চামড়ার জুতো পরিয়ে শোয়াবে ফুলের মধ্যে, তার নাম হয়তো হ'য়ে উঠবে লাউতারো। কিন্তু এ তো শুধু এক অলীক বিভ্রম। কেম্বিস কাপড় যথেষ্ট ছিলো না, বিচ্ছিরিভাবে কাটা আর শেলাই-করা পাৎলুনটা খুব আঁটো হ'লো, আর তার বুকের গোপন বল তার জামার বোতামগুলো পটপট ক'রে ছিঁড়ে ফেললো। মাঝরাতের পর হাওয়ার শিস ম'রে গেলো, সমুদ্র ঢুলে পড়লো তার বুধবারের ঘুমে। স্তব্ধতাই শেষ সন্দেহগুলোতে ইতি টেনে দিলে: এস্তেবানই ছিলো সে, এ স্তে বা ন। যে-মেয়েরা তাকে পোশাক পরিয়েছিলো, তার চুলে কাঁকই দিয়েছিলো, তার নোখ কেটে তার দাড়ি কামিয়ে দিয়েছিলো, তারা তাদের করুণার শিহরন চেপে রাখতে পারলে না যখন তাকে মাটির ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাবার ব্যাপারটা মেনে নিতে হ'লো। তখনই তারা বুঝতে পারলে কতটা অসুখী ছিলো সে, নিশ্চয়ই অসুখী ছিলো, তার ঐ বিশাল বপুটা নিয়ে, কারণ মৃত্যুর পরেও সেটা তাকে জ্বালাতন করছে। তারা তাকে যেন দেখতে পারছিলো সজীব, হেলে মাথা নুইয়ে দরোজার মধ্য দিয়ে যাতায়াত করবার দণ্ড পেয়েছে সে, মাথা ঠুকে-ঠুকে যাচ্ছে কড়িবরগায়, কারু সঙ্গে দেখা করতে গেলে দাঁড়িয়েই থাকতে হচ্ছে তাকে, তার নরম গোলাপি সী-লায়ন মাছের মতো হাত দুটি নিয়ে সে যে কী করবে ভেবেই পাচ্ছে না, বিশেষত যখন গৃহকর্ত্রী খুঁজছেন তাঁর সবচেয়ে দুর্দম্য চৌকি, আর তাঁকে অনুনয় করছেন, এদিকে যদিও আতঙ্কে মরো-মরো, বসুন এখানে, এস্তেবান, একটু বসুন, অনুগ্রহ ক'রে, আর সে, দেয়ালে হেলান দিয়ে, মৃদু হেসে, আপনি মোটেই ব্যস্ত হবেন না সেনিওরা, আমি এই-তো বেশ আছি, এখানে, তার গোড়ালি ঘায়ে-ঘায়ে দগদগে, তার পিঠ পুড়ে ঝামা, সেই একই জিনিশ ক'রে-ক'রে, এত বার, এত জায়গায়, যখনই কারু সঙ্গে দেখা করতে যায়, আপনি ব্যস্ত হবেন না সেনিওরা, আমি এই-তো বেশ আছি, শুধু একটা চৌকি ভেঙে দেবার ভয়ে আর সংকোচে, কখনও এটা না-জেনেই যে হয়তো তাঁরা বলতো যাবেন না এস্তেবান, অন্তত কফি খেয়ে যান, এই-তো তৈরি হ'য়ে গেছে, হয়তো তাঁরাই পরে ফিশফিশ করে বলাবলি করতেন, যাক, অবশেষে মস্ত আপদটা বিদেয় হয়েছে, কী ভালো, কী-যে সুপুরুষ এই খোকাটটা, কিন্তু অবশেষে চ'লে গিয়েছে। এইভাবেই মেয়েরা দেহটার পাশে ব'সে-ব'সে ভাব-ছিলো ভোরের একটু আগে। পরে, যখন তারা তার মুখ ঢেকে দিলে একটা

রুমালে, যাতে চোখে আলো প'ড়ে তাকে বিরক্ত না-করে, তাকে এমন মৃত দেখালো, এমন চিরকাল-মৃত দেখালো, এত অসহায় আর প্রতিরোধহীন, এত তাদের নিজেদের পুরুষদের মতোই যে তাদের বুকে খাঁজ কেটে-কেটে বেরুলো প্রথম অশ্রুর ফোঁটাগুলো। অল্প বয়েসীদের মধ্যে একজন সরাসরি কাঁদতে শুরু ক'রে দিলে। অন্যরা, যোগ দিয়ে, দীর্ঘশ্বাস থেকে বিলাপের পথে চ'লে গেলো, আর যত তারা ফোঁপালো ততই তাদের গলা ছেড়ে ডুকরে কাঁদতে ইচ্ছে করলো, কারণ এই জলে-ডোবা পুরুষটি ক্রমেই তাদের কাছে আরো এস্তেবান হ'য়ে উঠছে, আর ফলে তারা এতই কান্নাকাটি করলে যে তার যেন শেষই নেই, কারণ সে যে ছিলো পৃথিবীর সবচেয়ে নিঃস্ব, সবচেয়ে পরিত্যক্ত, সবচেয়ে শান্তিপ্রিয়, সবচেয়ে কৃতজ্ঞ, সবচেয়ে বাধ্য ও বশম্বদ পুরুষ, বেচারা এস্তেবান। কাজেই পুরুষরা যখন খবর নিয়ে ফিরে এলো যে জলে-ডোবা এই লোকটা আশপাশের গ্রামেরও কেউ নয়, মেয়েরা তাদের দরোদরো চোখের জলের মধ্যেও আনন্দ-উচ্ছ্বাসের একটা ফাঁক পেয়ে গেলো :

'ঈশ্বরই ধন্য,' দীর্ঘশ্বাস ফেললে তারা, 'এ শুধু আমাদেরই !'

পুরুষরা ভাবলে এই আদিখ্যেতা নেহাৎই মামুলি মেয়েলি খামখেয়াল। রাত্তির-জোড়া কঠিন খোঁজখবরের পর ক্লান্ত আর অবসন্ন, তারা শুধু চাচ্ছিলো এই নবাগত আপদটাকে এই ঊষর, হাওয়াবিহীন দিনটায় রোদ তেতে-ওঠার আগেই বিদেয় ক'রে দিতে। তারা মুখমাস্তুল আর কোঁচের ঝরতি-পড়তি দিয়ে উদ্ভাবন করে নিলে এক খাটুলি, সব জড়ো ক'রে দড়িদড়া দিয়ে শক্ত ক'রে বেঁধে, যাতে, যতক্ষণ-না তারা উপকূলের পাহাড়ে পৌঁছোয়, লাশটার ওজন সামলাতে পারে। তারা চেয়েছিলো এক মালের জাহাজের নোঙরও তার সঙ্গে বেঁধে দিতে যাতে সে গহন ঢেউয়ে সহজেই ডুবে যেতে পারে, যেখানে, গভীরে, মাছেরা সব অন্ধ আর ডুবুরিরা মরে পিছুটানে, আর মন্দ চোরাটানগুলো যাতে তাকে আর ফিরিয়ে না-আনে বেলাভূমিতে, যেমন ঘটেছিলো অন্য অনেক মৃতদেহের বেলায়। কিন্তু যতই তারা তাড়াহুড়ো করলে, ততই মেয়েরা সময় নষ্ট করার কৌশল বার করতে লাগলো। আঁৎকে-ওঠা মুরগিদের মতো হাঁটছিলো তারা, বুকের মধ্যে সমুদ্দুরের মাদুলি-তাবিজ ঠুকরে-ঠুকরে, কেউ তার কাঁধে সুবাতাসের অংসফলক বেঁধে দেবে ব'লে বাধা দিচ্ছে, অন্যপাশে কেউ তার মণিবন্ধে বেঁধে দিচ্ছে কব্জিদিগ্‌দর্শিকা, আর বহুৎ, 'ওখান থেকে সরো তো মেয়ে, কই, দেখি, পথ থেকে সরো,' 'এই দ্যাখো, তুমি আমাকে এক্ষুণি লাশটার ওপর ফেলে দিচ্ছিলে,' কথাবার্তার পর,

পুরুষরা টের পেতে শুরু করলে নিজের জীবনেরই অবিশ্বাস অনাস্থা, আর ঘ্যান-ঘ্যান করতে শুরু ক'রে দিলে অচেনা একটা লোকের জন্যে কেন এমন আদিখ্যেতা, কেন প্রধান বেদীর এত-সব শোভাভূষণ, কারণ যত-খুশি ক্রুশের পেরেক বা দিব্য-জলের শিশিই তার সঙ্গে দেখা যাক-না কেন, হাঙররা তাকে একইভাবে চিবিয়ে খাবে। তবু মেয়েরা তার ওপর স্তূপ ক'রেই চললো অর্থহীন সব প্রত্নিদর্শন, সাধু-সন্তের নখ-চুল ইত্যাদি, ছুটলো বারে-বারে সামনে-পেছনে, টাল-মাটাল, থুবড়ে পড়তে-পড়তে, যখন চোখের জলে যা তারা প্রকাশ করেনি তা প্রকাশ করতে শুরু করলে ঘন-ঘন দীর্ঘশ্বাসে ; শেষটায় পুরুষরা সব ফেটে পড়লো এই ব'লে 'কবে থেকে, শুনি, ভেসে-যাওয়া কোনো মড়ার জন্যে কেউ এমন আদিখ্যেতা করেছে, জলে-ডোবা একটা কেউ-না, বুধবারের মাংসের একটা হিমঠাণ্ডা চাক আর-কিছুই সে নয়,' তখন মেয়েদের একজন, এত অযত্নে মরমে ম'রে গিয়ে, মরা পুরুষটির মুখ থেকে একটানে খুলে দিলে রুমাল, আর পুরুষদেরও তার মুখ দেখে দম আটকে গেলো।

এ যে এস্তেবান। তাকে চেনবার জন্যে নামটা ফিরে আওড়াবারও দরকার নেই। যদি তাদের বলা হ'তো এ হ'লো সার ওয়ালটার র‍্যালে, তার গ্রিঙ্গো উচ্চারণের ঝোঁকে তাদের ওপর ছাপ ফেললেও ফেলতে পারতো, কাঁধে ল্যাজ-ঝোলা সবুজ টিয়া, নরখাদক-মারা গাদাবন্দুক ; কিন্তু জগতে শুধু একজনই এস্তেবান হ'তে পারে, আর এই-তো সে, হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ প'ড়ে আছে তিমিঙ্গিলের মতো, পায়ে জুতো নেই, প'রে আছে এক বাঁটকুল বাচ্চার পাৎলুন, আর হাত-পায়ের পাথুরে ঐ-সব নোখ যাকে কাটতে হ'লো একটা ছুরি দিয়ে। তার মুখ থেকে রুমালটা একবার সরাবামাত্র দেখা গেলো লজ্জায়শরমে সে গুটিয়ে আছে, এ-তো আর তার দোষ নয় যে সে এমন অতিকায়, কিংবা এত ভারি, কিংবা এত সুন্দর, আর যদি সে জানতো যে সে তা-ই হ'তে চলেছে তবে জলে ডুবে মরবার জন্যে সে নিশ্চয় আরো-দূর কোনো গহনগোপন জল বেছে নিতো, সত্যি, আমি হ'লে গলায় ঝুলিয়ে নিতাম এস্পানিয়ার বৃহৎ রণতরীর নোঙরটাই, আর টলতে-টলতে আছড়ে পড়তাম কোনো সুদূর শৈলচূড়া থেকে সেই-তার মতো যে খামকা-খামকা ব্যস্তসমস্ত ক'রে তুলতে চায় না লোকজনদের নিজের এই বুধবারের লাশটা দিয়ে, যেমন বাপু তোমরা বলো, কাউকে এই নোংরা ঠাণ্ডা মাংসের চাকটা দিয়ে বিরক্ত করতে চাই না বাপু—এই মাংসের টুকরোর সঙ্গে আমার কিন্তু কোনো সম্পর্কই নেই। তার ভাবেভঙ্গিতে এতটাই সত্য ছিলো যে এমনকী সবচেয়ে অবিশ্বাসী সন্দেহপ্রবণ

পুরুষও—সেই যারা সমুদ্রের মধ্যে অন্তবিহীন রাত্রির তিক্ততা টের পায় হাড়ে-হাড়ে যখন ভাবে যে তাদের স্ত্রীরা তাদের সম্বন্ধে স্বপ্ন দেখতে-দেখতে ক্লান্ত হ'য়ে গিয়ে শেষটায় কোনো জলে-ডোবা পুরুষেরই স্বপ্ন দেখবে—এমনকী তারাও, আর অন্যরাও—যাদের বুক আরো ডাকাবুকো কঠিন—তারা শুদ্ধ তাদের অস্থি-র মধ্যে মজ্জায়-মজ্জায় শিউরে-শিউরে উঠলো এস্তেবানের এই অকৃত্রিমতায়।

এমনি ক'রেই তারা সবচেয়ে জমকালো সবচেয়ে চমৎকার সবচেয়ে আশ্চর্য এক অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থা করলে, যতটা তারা ভাবতে পারে ততটাই, আর তা কি না কোনো এক নিঃস্ব দুঃস্থ পরিত্যক্ত জলে-ডোবা পুরুষের জন্যে। কয়েকজন মেয়ে গেলো আশপাশের গ্রাম থেকে ফুল আনতে, ফিরে এলো আরো-অনেক মেয়ের সঙ্গে, যারা শুনেও বিশ্বাস করেনি তাদের কী বলা হ'লো, আর যখন তারা নিজের চোখে দেখলো মৃতদেহটা ফিরে গেলো আরো, আরো ফুল আনতে, আর তারা আনলো তো আনলোই, আরো আরো ফুল, কত-কত ফুল, শেষটায় সেখানে স্তূপ হ'য়ে রইলো এত ফুল আর জড়ো হ'য়ে গেলো এত লোকজন যে সেখানে এক-পা হাঁটাও মুশকিল হ'য়ে উঠলো। শেষ মুহূর্তে তাদের ভারি কষ্ট হ'লো তাকে অনাথের মতো জলে ফিরিয়ে দিতে, আর তারা সেরা লোকজনদের মধ্য থেকে তার জন্যে বেছে নিলে বাবা আর মা, আর মাসি-পিশি, মামা-খুড়ো, তুতোভাই, তুতোবোন যে এর মারফৎই গাঁয়ের সবাই হ'য়ে উঠলো একে-আরের আত্মীয়। কয়েকজন খালাশি যারা দূর থেকে শুনলো কান্নার রোল, পথ ভুল করলো জাহাজের; আর লোকে শুনতে পেলো এমন-একজনের কথা যে নিজেকে বড়ো মাস্তুলটায় বাঁধিয়ে নিয়ে মনে করলো প্রত্নপ্রাচীন মোহিনী মায়াবিনী সাইরেনদের কথা ও কাহিনী। কারা তাকে কাঁধে ক'রে নিয়ে যাবে সেই গৌরবের অধিকারের জন্যে যখন তারা হাতাহাতি করলে—তারা যাবে উপকূলের শৈলচূড়ার খাড়া গড়খাই বেয়ে—নারীপুরুষ সকলেই প্রথম বারের মতো সচেতন হ'য়ে পড়লো তাদের পথঘাটের ঊষর নিরানন্দ অবস্থার কথা, কেমন শুষ্ক খরখরে তাদের উঠোন, কতটা সংকীর্ণ তাদের স্বপ্ন, যখন তারা মুখোমুখি দাঁড়ালে তাদের জলে-ডোবা পুরুষটির সুঠামসৌষ্ঠব আর সৌন্দর্যের সামনে। তারা তাকে যেতে দিলে কোনো নোঙর ছাড়াই যাতে সে ফিরে আসতে পারে, আবার যদি তার ইচ্ছে করে, আর তারা সবাই শতাব্দীর একটা টুকরোর জন্যে শ্বাস রোধ ক'রে রইলো যখন মৃতদেহ আছড়ে পড়লো পাতালের উদ্দেশে। পরস্পরের দিকে তাকাবারও কোনো দরকার হ'লো না তাদের এটা জানতে যে এখন আর তারা সকলে একসঙ্গে

উপস্থিত নেই, যে তারা কখনোই আর সবাই মিলে একসঙ্গে উপস্থিত থাকবে না। কিন্তু তারা এও জেনে গেলো যে সবকিছুই এখন থেকে অন্যরকম হ'য়ে যাবে, যে তাদের বাড়িঘরে থাকবে প্রশস্ত সব দরোজা, উঁচু-উঁচু কড়িবরগা, শক্তপোক্ত মেঝে যাতে এস্তেবানের স্মৃতি যে-কোনোখানেই ঘুরে বেড়াতে পারে থামে-ছাতে ঘা না-খেয়ে, যাতে কেউ পরে ফিশফিশ ক'রে বলতেও সাহস না-পায় যে মস্ত আপদটা অবশেষে টেঁশে গিয়েছে, খুবই খারাপ ব্যাপার, তবে সুপুরুষ হাঁদাটা অবশেষে ম'রেই গেলো, কারণ এখন তারা তাদের বাড়ি-ঘর রং ক'রে দেবে হাসিখুশির রঙে আর ছটায়, এস্তেবানের স্মৃতিকে শাশ্বত ক'রে তোলবার জন্যে ; আর তারা পাথর ফাটিয়ে জলের ফোয়ারা বার ক'রে দেবার জন্যে অক্লান্ত খেটে-খেটে তাদের শিরদাঁড়া ভাঙবে, শৈলচূড়ায় রুইবে ফুলগাছ যাতে ভবিষ্যৎ বছরগুলোয় উষার সময় বড়ো-বড়ো যাত্রীজাহাজের লোকেরা বারদরিয়ায় জেগে যায় বাগানের ফুলের গন্ধে ঝিম ধ'রে গিয়ে আর কাপ্তেন নেমে আসে তার পোশাকি উর্দি গায়ে সাঁকো থেকে, তার নভশ্চরী, তার ধ্রুবতারা, উর্দিতে তার যুদ্ধপদকের সারি-সারি ভূষণ বসানো, দিগন্তের দিকে অন্তরীপের গোলাপি ভাঙা টুকরোটা দেখিয়ে কাপ্তেন ব'লে উঠবে চোদ্দটা ভাষায়, দ্যাখো-দ্যাখো, দ্যাখো ওখানে, যেখানে হাওয়া এখন এত শান্ত যে এ যেন উনপঞ্চাশ বিছানার তলায় ঘুমোতে গিয়েছে, ঐ ওখানে, যেখানে রৌদ্র এত উজ্জ্বল যে সূর্যমুখিরা জানেই না কোনদিকে মুখ ফেরাবে, হ্যাঁ, ঐ ওখানে, ওটা তো এস্তেবানের গ্রাম।

১৯৬৮

বিশাল ডানাওয়ালা এক থুরথুরে বুড়ো

ছোটোদের গল্প

বৃষ্টির তৃতীয় দিনে ওরা বাড়ির ভেতরে এতই কাঁকড়া মেরেছিলো যে পেলাইওকে ভিজে-একশা উঠোন পেরিয়ে গিয়ে সেগুলোকে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হয়েছিলো, কারণ সারা রাত ধ'রে নবজাত শিশুটির ছিলো জ্বর, আর ওরা ভেবেছিলো জ্বরটা হয়েছে ঐ পচা বদ গন্ধটার দরুন। মঙ্গলবার থেকেই সারা জগৎ কেমন বিষণ্ণ হ'য়ে আছে। সমুদ্র আর আকাশ হ'য়ে উঠেছে একটাই ছাই-ধূসর বস্তু; আর বেলাভূমির বালি, মার্চের রাত্তিরে যা ঝকঝক করে গুঁড়ো-গুঁড়ো আলোর মতো, হ'য়ে উঠেছে কাদা আর পচা খোলকমাছগুলোর এক ভাপে-সেদ্ধ-হওয়া দগদগে স্তূপ। দুপুরবেলাতেই আলো এমন দুর্বল যে পেলাইও যখন কাঁকড়াগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বাড়ি ফিরছিলো, তার পক্ষে দেখাই মুশকিল ছিলো উঠোনেব পেছনকোণটায় কী-সেটা ছটফট ক'রে নড়তে-নড়তে কাৎরাচ্ছে। তাকে খুব কাছে গিয়ে তবেই দেখতে হয়েছিলো যে এক বুড়ো, খুবই থুরথুরে বুড়ো, কাদার মধ্যে মুখ গুঁজে উপুড় হ'য়ে শুয়ে আছে, আর, তার প্রচণ্ড সব চেষ্টা সত্ত্বেও, কিছুতেই উঠতে পারছে না, তার বিশাল দুই ডানায় কেবলই বাধা পেয়ে যাচ্ছে।

সেই দুঃস্বপ্ন দেখে আঁৎকে উঠে, পেলাইও ছুটে চ'লে গেলো এলিসেন্দার কাছে, তার বৌ, যে তখন অসুস্থ বাচ্চাটির কপালে জলপট্টি দিচ্ছিলো, আর পেলাইও তাকে ডেকে নিয়ে গেলো উঠোনের পেছনকোণায়। প'ড়ে-থাকা শরীরটার দিকে তাকিয়ে তারা কেমন হতভম্ব হ'য়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। বুড়োর পরনে ন্যাকড়া-কুড়ুনির পোশাক। তার টাক-পড়া চকচকে মাথাটায় কয়েকটাই মাত্র বিবর্ণ চুল রয়েছে, ফোগলা মুখটায় খুবই কম দাঁত, আর এককালে যদি-বা তার কোনো জাঁকজমক থেকেও থাকতো এখন এই ঝোড়ো কাকের প্র-প্রপিতামহের করুণ দশা সে-জাঁকজমক একেবারে উধাও ক'রে দিয়েছে। তার অতিকায় শিকারি পাখির ডানা—নোংরা, আদ্ধেকটাই পালক খশা—চিরকালের মতো কাদায় জট পাকিয়ে গিয়েছে। ওরা তার দিকে এতক্ষণ ধ'রে খুব কাছে থেকে হাঁ ক'রে তাকিয়েছিলো যে পেলাইও আর এলিসেন্দা খানিক বাদেই তাদের প্রথম চমকটা

জয় ক'রে নিলে, বরং শেষটায় একে বেশ চেনা-চেনাই ঠেকলো। তখনই সাহস ক'রে তার কথা কইবার একটা চেষ্টা করলে তারা, আর উত্তরে সে খালাশিদের যেমন গলা ফাটিয়ে কথা বলার অভ্যেস থাকে তেমনি রিনরিনে গলায় কী-এক দুর্বোধ্য বুলিতে জবাব দিলে। ঐ কারণেই ওরা ডানা দুটোর ঝামেলা-টামেলাকে বেমালুম কোনো পাত্তা না-দিয়েই বেশ বুদ্ধিধারীদের মতোই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুলো যে সে নিশ্চয়ই তুফানে উলটে-যাওয়া কোনো ভিনদেশী জাহাজের নিঃসঙ্গ ভরাডুবি নাবিক। অথচ তবু তাকে দেখাবার জন্যে ওরা এক পড়োশিনিকে ডেকে আনলে, সে আবার জীবনমৃত্যুর সব গলিঘুঁজিরই হদিশ রাখে; আর তার দিকে শুধু একবার তাকিয়েই সেই পড়োশিনির ওদের বোঝাতে দেরি হ'লো না যে ওরা একটা মস্ত ভুল করেছে।

'এ-যে এক দেবদূত,' পড়োশিনি তাদের বললে। 'নিশ্চয়ই বাচ্চাকে নিয়ে যেতে আসছিলো, কিন্তু বেচারা এমনই বুড়োহাবড়া যে এই মুষলবৃষ্টি তাকে একেবারে পেড়ে ফেলেছে।'

পরের দিনই সবাই জেনে গেলো যে পেলাইওদের বাড়িতে এক রক্তমাংসের জ্যান্ত দেবদূতকে কয়েদ ক'রে রাখা হয়েছে। জ্ঞানে বুনো ঐ পড়োশিনির বিচার-বুদ্ধিকে কোনো পাত্তা না-দিয়ে—তার কাছে তখন দেবদূতমাত্রেই কোনো স্বর্গীয় ষড়যন্ত্রের পালিয়ে-বাঁচা নিদর্শন—ওরা তাকে মুগুর পেটা ক'রে মেরে ফেলতে কোনো সায় পেলে না। রান্নাঘর থেকে পেলাইও সারা বিকেল তার ওপর নজর রাখলে, তাদের পালের খাটো মুগুরটায় সে সশস্ত্র; আর রাত্তিরে শুতে যাবার আগে তাকে সে কাদা থেকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে গিয়ে তারের জাল ঘেরা মুরগির খাঁচাটায় বন্ধ ক'রে রাখলে। মাঝরাত্তিরে, বৃষ্টি যখন ধ'রে এলো, পেলাইও আর এলিসেন্দা তখনও একটার পর একটা কাঁকড়া মারছে। একটু বাদেই বাচ্চাটাও জেগে উঠলো মস্ত এক খাই-খাই নিয়ে, তার গায়ে আর জ্বর নেই। তখন ওরা একটু দরাজদিল হ'য়ে উঠলো, ঠিক করলে যে এই দেবদূতকে ওরা তিনদিনের উপযোগী টাটকা জল আর খাবারদাবার দিয়ে একটা ভেলায় ক'রে বারদরিয়ার তার নিয়তির কাছে ছেড়ে দিয়ে আসবে। কিন্তু উষার প্রথম আলো ফোটবামাত্র যখন ওরা উঠোনে গিয়ে হাজির হ'লো, ওরা দেখতে পেলে পুরো পাড়াটাই মুরগির খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে দেবদূতকে নিয়ে মজা করছে, রঙ্গতামাশা করছে, কারু মধ্যে কোনো সম্ভ্রমবোধ নেই, তারের মধ্যে দিয়ে তাকে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে দিচ্ছে খাবার, যেন সে আদপেই কোনো অতিপ্রাকৃত জীব নয়—বরং যেন সে এক সার্কাসের জন্তু।

সকাল সাতটার আগেই পাদ্রে গোনসাগা এসে হাজির—এই অদ্ভুত খবরে বেশ শঙ্কিত হ'য়েই হন্তদন্ত হ'য়ে তিনি ছুটে এসেছেন। ততক্ষণে ভোরবেলাকার দর্শকদের মতো তত রংবাজ নয় এমন দর্শকরা এসে হাজির হয়েছে, আর তারা বন্দীর ভবিষ্যৎ নিয়ে নানারকম জল্পনা-কল্পনা করতে শুরু ক'রে দিয়েছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে সরল লোকটা ভেবে ফেলেছে যে একে সারা জগতের পুরপিতা নাম দেয়া উচিত। অপেক্ষাকৃত কঠিন হৃদয়ের লোকেদের মনে হ'লো একে এক পাঁচতারা সেনাপতির পদে উন্নীত ক'রে দেয়া হোক যাতে সব যুদ্ধবিগ্রহই সে জিতিয়ে দিতে পারে। কিছু-কিছু দূরদর্শীর মনে হ'লো তাকে দিয়ে যদি পৃথিবীতে কোনো ডানাওয়ালা জাতির জন্ম দেয়ানো যায় তবে সে-জাতি হবে জ্ঞানে-গুণে সবার সেরা, আর তারাই তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দায়িত্ব নিয়ে নেবে। কিন্তু পাদ্রে গোনসাগা—যাজক হবার আগে ছিলেন এক হট্টাকট্টা কাঠুরে—তারের বেড়ার পাশে দাঁড়িয়ে, মুহূর্তে জেরা করবার জন্যে প্রশ্নোত্তর সব ভেবে নিলেন, আর ওদের বললেন দরজাটা খুলে দিতে, যাতে ভেতরে গিয়ে কাছে থেকে তিনি এই হতশ্রী করুণ লোকটাকে দেখে নিতে পারেন—যাকে তখন এই ভ্যাবাচাকাখাওয়া মন্ত্রমুগ্ধ মুরগির ছানাগুলোর মধ্যে এক অতিকায় জরাজীর্ণ মুরগির মতো দেখাচ্ছিলো। সে শুয়ে আছে এক কোণায়, খোলা ডানাগুলো সে শুকোচ্ছে রোদ্দুরে, চারপাশে ছড়িয়ে আছে ফলের খোশা আর ছোটোহাজরির উচ্ছিষ্ট, ভোর-ভোর-ওঠা দর্শকরা এসে যে-সব তাকে ছুঁড়ে দিয়েছে। পাদ্রে গোনসাগা যখন মুরগির খাঁচার মধ্যে ঢুকে প'ড়ে তাকে লাতিনে সুপ্রভাত জানালেন, জগতের ধৃষ্টতা আর ঔদ্ধত্য তার অচেনা ব'লে সে শুধু তার প্রত্নপ্রাচীন চোখ তুলে গুনগুন ক'রে কী-একটা বললে তার ভাষায়। এ-যে এক জোচ্চোর ফেরেব্বাজ, এ-বিষয়ে এ-তল্লাটের যাজনপল্লির এই পুরুৎটির মনে প্রথম সন্দেহটা দানা বেঁধে উঠলো, বিশেষত যখন দেখতেই পেলেন যে এ ঈশ্বরের ভাষাই বোঝে না, কিংবা জানেও না কী ক'রে ঈশ্বরের উজির-নাজিরদের সম্ভাষণ করতে হয়। তারপর তিনি খেয়াল ক'রে দেখলেন যে খুব কাছে থেকে নজর করলে, তাকে বড্ড বেশি মানুষ-মানুষ দেখায়। তার গা থেকে বেরুচ্ছে খোলামেলার এক অসহ্য গন্ধ, তার ডানাগুলোর পেছন দিকে গজিয়েছে নানারকম পরভৃৎ আর তার প্রধান পালকগুলোর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে পার্থিব সব হাওয়া; দেবদূতদের সগর্ব মর্যাদার সঙ্গে তুলনা করা যায় এমন-কিছুই তার নেই। তারপর তিনি মুরগির খাঁচা থেকে বেরিয়ে এলেন এবং ছোট্ট একটি কথামৃত আউড়ে কৌতূহলীদের হুঁশিয়ার ক'রে দিলেন ছলাকলাহীন শাদাসিধে অকপট লোক হবার

ঝুঁকি কতটা ; তিনি ওদের মনে করিয়ে দিলেন যে রোম্যান ক্যাথলিকদের হুল্লোড়ে-উৎসবে এসে কৌশলে আচমকা ল্যাং মেরে দেবার একটা বিষম বদভ্যেস আছে শয়তানের যাতে অসাবধানীদের সে বেকায়দায় ফেলে দিতে পারে, বিপথে নিয়ে যেতে পারে। তিনি যুক্তি দিয়ে বোঝালেন যে কোনো ডানা যদি কোনো বাজ-পাখি আর উড়োজাহাজের তফাৎ নির্ধারণ ক'রে নেবার কোনো আবশ্যিক উপাদান না-হয়, তবে দেবদূতদের শনাক্ত করবার বেলায় ডানার গুরুত্ব তো আরোই কম। তৎসত্ত্বেও তিনি কথা দিলেন যে তিনি তাঁর বিশপকে একটি চিঠি দেবেন যাতে বিশপ তাঁর গির্জাশাসিত পল্লির আর্চবিশপকে লিখতে পারেন, আর তিনি তারপর লিখতে পারেন সর্বোচ্চ মোহান্তকে যাতে উচ্চতম আদালত থেকে সর্বাধিনায়কের চূড়ান্ত রায়টি পাওয়া যায়।

তাঁর বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা সকলই গিয়ে পড়লো বন্ধ্যা-সব হৃদয়ে। বন্দী দেব-দূতের খবর এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো যে কয়েকঘণ্টা বাদেই এক বড়ো হাটবাজারের ব্যস্ততা আর শোরগোল উঠলো উঠোনে, আর ভিড়কে সরিয়ে দেবার জন্যে ডাকতে হ'লো সঙিনসমেত সেনাবাহিনীকে, নইলে বাড়িটা তারা প্রায় ধসিয়েই দিতো। এই হাটবাজারের এত জঞ্জাল ঝাঁট দিয়ে-দিয়ে এলিসেন্দার শিরদাঁড়া যেন দুমড়ে গিয়েছে ; শেষটায় তার মাথায় ফন্দিটা খেলে গেলো, আরে, উঠোনের চারপাশে বেড়া দিয়ে সকলের কাছ থেকেই তো দর্শনী বাবদ পাঁচ সেণ্ট ক'রে চাওয়া যায়।

কৌতূহলীরা এলো দূর-দূরান্তর থেকে। এক ভ্রাম্যমাণ সার্কাস দলও এসে পৌঁছুলো যার ছিলো এক উড়ন্ত দড়বাজিকর, সে ভিড়ের ওপর বার-কয় ভোঁ-ভোঁও করলে, কিন্তু কেউ তার দিকে কোনো পাত্তাই দিলে না—কারণ তার ডানাগুলো মোটেই কোনো দেবদূতের মতো ছিলো না—বরং সেগুলোকে দেখাচ্ছিলো কোনো নাক্ষত্র বাদুড়ের মতো। জগতের সবচেয়ে দুর্ভাগা ও অশক্তরা এলো স্বাস্থ্যের সন্ধানে : এলো এক বেচারি মেয়ে জন্ম থেকেই যে গুনে যাচ্ছিলো তার বুকের ধুকপুক, গুনতে-গুনতে এখন সে সব সংখ্যাই শেষ ক'রে ফেলেছে ; এলো এক পোর্তুগিস কিছুতেই যে কখনও ঘুমোতে পারে না, কারণ তারাদের কোলাহল তার ঘুম কেবলই চটিয়ে দেয় ; এলো এক ঘুমে-হাঁটা লোক, যে দিনে জেগে-থাকা অবস্থায় যা-যা করেছে সব রাত্তিরে ঘুমের ঘোরে উঠে গুবলেট ক'রে দেয় ; এ ছাড়াও কত-কত জন, তাদের অবশ্য অত ভয়াবহ-সব অসুখ নেই। পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দিচ্ছিলো যে-জাহাজডুবির বিশৃঙ্খলা, তার মধ্যে পেলাইও আর এলিসেন্দা অবশ্য তাদের ক্লান্তিতেই সুখী, কারণ হপ্তা শেষ হবার আগেই তারা তাদের সবগুলো ঘর ঠেশেছে

টাকাকড়িতে, আর ভেতরে ঢোকবার পালা কখন আসে তার জন্যে যে-তীর্থযাত্রীর সার অপেক্ষা করছে বাইরে, তা এমনকী দিগন্তও পেরিয়ে কোথাও চ'লে গিয়েছে।

এই দেবদূতই ছিলো একমাত্র যে তার নিজের এই হুলুস্থুল নাট্যে কোনোই ভূমিকা নেয়নি। তার এই ধার-করা নীড়ে কীভাবে সে একটু আরাম পাবে, তারই চেষ্টায় সে কাটায় সারা সময়—তেলের বাতি বা উপাসনার মোমবাতিগুলোর নারকীয় জ্বালায় আর উত্তাপে তার প্রায় মাথা খারাপ হবার জোগাড়, অথচ ওগুলো সারাক্ষণ ঐ তারের খাঁচায় জ্বলছে। গোড়ায় তাকে ওরা ন্যাপথালিন খাওয়াবার চেষ্টা করেছিলো, সেই পরমজ্ঞানী পড়োশিনির প্রস্তা অনুযায়ী তা-ই নাকি দেবদূতদের খাদ্য হিশেবে বিধানবিদিত। কিন্তু সে ও-সব ফিরিয়ে দিয়েছে, যেমন সে ফিরিয়ে দিয়েছে পোপের ভোজ, পাপীতাপীরা প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যে মানৎ ক'রে এ-সব ভূরিভোজ তার কাছে নিয়ে এসেছিলো; আর তারা কখনও এটা বুঝে উঠতে পারেনি সে যে বেগুনভর্তা ছাড়া আর-কিছুই খায় না, সে কি সে একজন দেবদূত ব'লে না কি ফোগলা দাঁতের এক বুড়ো থুরথুরে ব'লে। তবে তার একমাত্র অতিপ্রাকৃত শক্তি মনে হ'লো তার ধৈর্য। বিশেষত প্রথম দিনগুলোয়, তার ডানায় যে-সব নাক্ষত্র পরভৃৎ জম্পেশ ক'রে গজিয়েছে তার খোঁজে যখন মুরগিরা তাকে ঠোকরাতো, আর পঙ্গুরা ছিঁড়ে নিতো তার পালক তাদের বিকল ঠুটো অঙ্গগুলোয় ছোঁয়াবার জন্যে, আর এমনকী যাদের প্রাণে অনেক দয়াধর্ম ছিলো তারাও যখন তাকে তাগ করে ঢিল ছুঁড়তো যাতে সে উঠে পড়ে আর দাঁড়ালে তাকে কেমন দেখায় সেটা দেখবার জন্যে—তখনও সে শান্তই থাকতো। একমাত্র যে-বার তারা তাকে উশকে তাতিয়ে দিতে পেরেছিলো সে তখনই যখন তারা তার পাশটা পুড়িয়ে ছিলো তপ্ত লোহায়, যা দিয়ে ছ্যাঁকা লাগিয়ে তারা বলদের গায়ে মার্কা দিতো—কারণ সে এতক্ষণ কেমন ঝিম মেরে নিশ্চল পড়েছিলো যে তারা ভেবেছিলো সে বুঝি ম'রেই গিয়েছে। আঁৎকে জেগে উঠেছিলো সে তখন, তার ঐ রুদ্ধ দুর্বোধ্য অচেনা ভাষায় চেঁচিয়ে প্রলাপ বকেছিলো, চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এসেছিলো তার, আর সে তার ডানা ঝাপটেছিলো বার-দুই, যা মুরগির বিষ্ঠা আর চান্দ্র ধুলোর এক ঘূর্ণিহাওয়া তুলে দিয়েছিলো, আর এমন একটা দমকা ঝাপটা তুলেছিলো আতঙ্কের যাকে কিছুতেই এই জগতের ব'লে মনে হয়নি। যদিও অনেকে ভেবেছিলো তার সাড়াটা ঠিক ক্রোধের নয়, বরং জ্বালার, ব্যথার। আর সেই থেকে তারা হুঁশিয়ার হ'য়ে যায় যাতে তাকে আর এমন চটিয়ে দেয়া না-হয়, কারণ বেশির ভাগ লোকই বুঝেছিলো তার এই নিষ্ক্রিয়

ঔদাস্য মোটেই কোনো বীরনায়কের বিশ্রাম নয়, বরং কোনো মহাপ্লাবনের পূর্বমুহূর্তের থমথমে ছমছমে ঘুম।

বাড়ির ঝি-চাকরানিদের প্রেরণা-পাওয়া সব সূত্র দিয়েই পাদ্রে গোনসাগা ভিড়ের ছ্যাবলামিটা ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। বন্দীর প্রকৃতি সম্বন্ধে চূড়ান্ত রায় কী আসে তারই জন্যে অপেক্ষা করছিলেন তিনি। কিন্তু রোম-থেকে-আসা চিঠিতে কোনো তাড়াই দেখা গেলো না। তারা তাদের সময় কাটিয়ে দিলে এইসব প্রশ্নে বন্দীর কোনো নাভি আছে কি না, তার কথাবার্তার সঙ্গে সিরিয়ার প্রাচীন ভাষার কোনো সম্পর্ক আছে কি না, একটা ছুঁচের ডগায় তার মতো ক-টা মাথা এঁটে যায়, অথবা সে কি নিছকই নরওয়ের কোনো লোক, গায়ে ডানা লাগিয়ে নিয়েছে। ঐ-সব তুচ্ছ অতি-সংক্ষিপ্ত চিঠিগুলো হয়তো সময়ের শেষ অব্দিই যাতায়াত করতে থাকতো, যদি-না এক দৈব ঘটনা পাদ্রে গোনসাগার সব নাজেহাল বিপত্তিতে একটা ইতি টেনে দিতো।

ঘটেছিলো কী, ঐ দিনগুলোয়, আরো-সব কত-কত উৎসব মেলা আর সার্কাসের হরেকরকমবা আকর্ষণের মধ্যে, শহরে এসে পৌঁছেছিলো একটি মেয়ের ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী, যে তার বাবা-মার কথার অবাধ্য হয়েছিলো ব'লে মাকড়শা হ'য়ে গিয়েছে। দেবদূতকে দেখতে যত পয়সা দিতে হয়, একে দেখতে যেতে তার চেয়ে যে কম পয়সা দর্শনী বাবদ দিতে হয়, শুধু তা-ই নয়, তার এই অসম্ভব দশার জন্যে লোককে যা-খুশি প্রশ্ন করবারও সুযোগ দেয়া হয়, এমনকী তাকে আগা-পাশতলা খুঁটিয়েও দেখতে দেয়া হয় যাতে তার এই বিভীষিকার সত্য-মিথ্যা সম্বন্ধে কারু মনেই কোনো সন্দেহ না-থাকে। সে-এক ভয়ংকর তারানতুলা, একটা মস্ত ভেড়ার মতো বড়ো, আর তার মাথাটা এক বিষাদময়ী কুমারী মেয়ের। যা ছিলো সবচেয়ে হৃদয়-বিদারক, তা কিন্তু তার এই তাজ্জব আকৃতি নয়, বরং তার অকৃত্রিম-দুঃখী করুণ গলা, যে-গলায় সে তার দুর্ভাগ্যের সব খুঁটিনাটি বর্ণনা করতো। যখন সে একেবারেই ছেলেমানুষ, এক নাচের আসরে যাবে ব'লে কাউকে কিছু না-জানিয়ে সে তার বাবা-মার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলো, আর অনুমতি না-নিয়ে সারা রাত ধ'রে নাচবার পর সে যখন এক বনের মধ্য দিয়ে ফিরছিলো তখন হঠাৎ এক ভয়ংকর বজ্রপাত আকাশকে দু-ভাগে ফেঁড়ে দিয়েছিলো আর ফাটলের মধ্য দিয়ে নেমে এসেছিলো জ্বলন্ত গন্ধকের এক বিদ্যুৎশিখা যা তাকে বদলে দিয়েছিলো এই আজব মাকড়শায়। যাদের প্রাণে দয়াদাক্ষিণ্য আছে তারা তার মুখে মাংসের বড়া ছুঁড়ে দেয়—একমাত্র তা-ই তাকে অ্যাদ্দিন ধ'রে বাঁচিয়ে রেখেছে। এ-রকম এক দৃশ্য, যার মধ্যে এতই মানবিক সত্য আর এমন-এক ভয়ংকর শিক্ষা

আছে, যে তা চেষ্টা না-ক'রেও হারিয়ে দিতে পারে কোনো উদ্ধত দেবদূতের প্রদর্শনী, যে-দেবদূত কি না কচিৎ-কখনও নাক সিঁটকে তাকায় মর্তবাসীদের দিকে। তাছাড়া, দেবদূতের নামে যে-ক-টা অলৌকিক অঘটনের দায় চাপিয়ে দেয়া হয়েছিলো তা শুধু এক ধরনের মানসিক বিশৃঙ্খলাই বোঝাচ্ছিলো। যেমন: এক অন্ধ আতুর, সে তার দৃষ্টি ফিরে পায়নি বটে, তবে তার তিনটে নতুন দাঁত গজিয়ে গিয়েছিলো; কিংবা এক পঙ্গু বেচারি যে হেঁটে-হেঁটে গিরিলঙ্ঘন করতে পারেনি বটে তবে একটা লটারি প্রায় জিতেই যাচ্ছিলো; কিংবা এক কুষ্ঠরোগী যার ঘাগুলো থেকে গজিয়েছিলো সূর্যমুখী ফুল। কোনো সান্ত্বনা পুরস্কারের মতো এ-সব অলৌকিক কাণ্ড আসলে প্রায় বিসদৃশ সব মশকরা বা কৌতুকের মতোই—আর এ-সবের ফলেই দেবদূতের মানসম্ভ্রম খ্যাতি ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছিলো। তারপর মাকড়শায়-বদলে-যাওয়া মেয়েটি আসতেই তার সব নামডাক একেবারেই ধ'সে পড়লো। এইভাবেই পাদ্রে গোনসাগা তাঁর অনিদ্রা রোগ থেকে চিরকালের মতো রেহাই পেয়ে গেলেন আর পেলাইওদের উঠোন সেইরকমই ফাঁকা হ'য়ে গেলো তিনদিন তিনরাত্তির যখন একটানা ঝমঝম ক'রে বৃষ্টি পড়েছিলো আর কাঁকড়ারা হাঁটছিলো তাদের শোবার ঘরে।

বাড়ির মালিকদের অবশ্য বিলাপ করার কোনোই কারণ ছিলো না। যে-টাকা তারা কামিয়েছিলো তা দিয়ে তারা এক চকমেলানো দোতলা বাড়ি বানিয়ে নিলে, সে বাড়ির ছিলো অলিন্দ আর বাগান আর উঁচু তারের জাল শীতের সময় যাতে কাঁকড়ারা আর ভেতরে ঢুকতে না-পারে, আর জানলায় ছিলো লোহার গরাদ যাতে কোনো পথহারা দেবদূতও ঢুকে পড়তে না-পারে আচমকা। শহরের কাছেই পেলাইও একটা খরগোশ পালন করবার ঘিঞ্জি গোলকধাঁধা বানিয়ে নিলে, চিরকালের মতো ইস্তফা দিলে তার সান্ত্রীপালের কাজে, আর এলিসেন্দা কিনে নিলে কতগুলো উঁচু খুরওয়ালা ঢাকা জুতো আর রামধনু-রঙা রেশমি কাপড়ের অনেক প্রস্থ পোশাক, তখনকার দিনে রোববারে-রোববারে যে-সব পোশাক পরতো সবচেয়ে অভিজাত ও কাঙ্ক্ষিত মহিলারা। যা-যা তাদের কোনো মনোযোগ পায়নি, তার মধ্যে মুরগির খাঁচাটাই একমাত্র জিনিশ ছিলো না। যদি তারা রাসায়নিক দিয়ে তা ধুয়ে দিয়ে থাকে আর তার ভেতরে বার-বার মস্তকির অশ্রু পুড়িয়ে থাকে, সে কিন্তু মোটেই এই দেবদূতের অর্চনায় নয়, বরং সেই গু-গোবরের স্তূপের দুর্গন্ধ তাড়িয়ে দিতেই—ভূতের মতো এখনও যা ঝুলে আছে সবখানে, আর নতুন দালানটাকে বানিয়ে দিচ্ছে পোড়োবাড়ি। গোড়ায়, যখন তাদের বাচ্চা

হাঁটতে শিখলো, তারা খুবই সাবধান ছিলো যাতে সে কখনও মুরগির খাঁচাটার খুব কাছে না-যায়। কিন্তু তারপর তারা ক্রমে-ক্রমে তাদের ভয় হারাতে শুরু করলে আর গন্ধটায় অভ্যস্ত হ'য়ে গেলো। বাচ্চার দ্বিতীয় দাঁতটি বেরুবার আগেই সে মুরগির খাঁচার ভেতর খেলতে চ'লে যেতো, খাঁচার তারগুলো ততদিনে অবহেলায় অযত্নে ছিঁড়ে-ছিঁড়ে গিয়েছে। অন্য-কোনো মর্তবাসীর সঙ্গে কোনো মাখামাখিই করেনি দেবদূত, বরং দূরে-দূরেই থাকতো, এখনও সে তেমন-একটা মাখামাখি করে না; তবে সব ভুল ধারণা হারিয়ে বসবার পর কোনো কুকুর যেমন বাচ্চাদের যাবতীয় যাচ্ছেতাই অপমান ও নিগ্রহ পরম ধৈর্যভরে সহ্য করে, তেমনি ধৈর্যের সঙ্গে দেবদূত এই বাচ্চাটিকে সহ্য করতো। একই সঙ্গে দুজনকেই পেড়ে ফেললো জলবসন্ত। যে-ডাক্তার বাচ্চাটির রোগ দেখতে এসেছিলো সে অবশ্য দেবদূতের হৃৎপিণ্ডের ধুকধুক শোনবার লোভ সামলাতে পারলে না, আর সে তার বুকে এত শিস শুনতে পেলে আর এতই শোরগোল শুনতে পেলে তার বুক্কে যে তার পক্ষে বেঁচে থাকাই সম্ভব ব'লে ডাক্তারের মনে হ'লো না। যেটা তাকে সবচেয়ে তাক লাগিয়ে দিলে সেটা এই ডানা দুটোর যুক্তি ও প্রকৃতি। এ-দুটি এমনই স্বাভাবিক যে পুরোপুরি কোনো মানুষেরই আবশ্যিক অঙ্গ ব'লে মনে হয়, আর তার অবাক লাগলো এই ভেবে যে অন্য-সব মানুষদেরই বা কোনো ডানা নেই কেন।

বাচ্চা যখন স্কুলে যাওয়া শুরু করলে, সেটা রোদে-বৃষ্টিতে মুরগির খাঁচার সম্পূর্ণ ধ্বংসের কিছুকাল পরে। দেবদূত এখন এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায়, পথহারা দিকভোলা কোনো মুমূর্ষুর মতো। ওরা তাকে ঝাঁটা মেরে বার ক'রে দেয় শোবার ঘর থেকে, কিন্তু পরক্ষণেই তাকে ঢ্যাখে রান্নাঘরে। একই সঙ্গে তাকে এত বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায় ব'লে মনে হয় যে তারা অবাক হ'য়ে ভাবে এর আবার আরো-কতগুলো সংস্করণ হ'য়ে গেলো নাকি—সে কি নিজেকেই তৈরি করছে বাড়ির সকল কোণায়-খামচিতে? আর বিপর্যস্ত ও তিতিবিরক্ত এলিসেন্দা ডুকরে গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে বলতে লাগলো দেবদূতে-দেবদূতে থৈ-থৈ-করা কোনো নরকে বাস করা কী যে জঘন্য কাণ্ড! দেবদূত এখন খেতেই পারে না কিছু, তার প্রত্নপ্রাচীন চোখও এখন এত ঘোলাটে হ'য়ে গেছে যে সবসময় সে জিনিশপত্তরে ধাক্কা খায়, তার শেষ পালকগুলোর নিছক সূক্ষ্ম জালের মতো দাঁড়গুলোই এখন আছে তার। পেলাইও একটা কম্বল ছুঁড়ে দেয় তার ওপর, তাকে করুণা ক'রে একটা আটচালার নিচে শুতে দেয়। আর শুধু তখনই তারা আবিষ্কার করলে যে রোজ রাত্তিরে তার জ্বর আসে, আর কোনো বুড়ো নরওয়েবাসীর জিভজড়ানো

ভাষায় সে বিকারের ঘোরে প্রলাপ বকে। যে-কয়েকবার তারা বিষম ভয় পেয়ে গিয়েছিলো, এ তারই একটা, কারণ তারা ধ'রেই নিয়েছিলো যে এ বুঝি মরতে বসেছে, আর তাদের জ্ঞানীগুণী পড়োশিনি অব্দি তাদের বলতে পারলে না কোনো মরা দেবদূতকে নিয়ে তারা কী করবে।

অথচ তবু যে সে তার সবচেয়ে জঘন্য শীতকালটাই টিকে গেলো তা-ই নয়, প্রথম রোদ্দুরে ভরা দিনগুলো আসতেই মনে হ'লো সে ক্রমেই সেরে উঠছে। উঠোনের সবচেয়ে দূর কোণায় সে কয়েকদিন নিশ্চল প'ড়ে থাকে, যেখানে কেউই তাকে দেখতে পায় না; আর ডিসেম্বরের গোড়ায় তার ডানায় মস্ত কতগুলো আড়-ধরা পালক গজিয়ে ওঠে, কোনো কাকতাড়ুয়ার পালক যেন সেগুলো, তার জরার আরেকটা দুর্ভাগা লক্ষণ ব'লেই মনে হ'লো এই পালকগুলোকে। কিন্তু সে নিজে নিশ্চয়ই জানতে পেরেছিলো এ-সব বদলের আসল কারণ, কেননা কেউ যাতে তা না-দেখতে পায় এ-বিষয়ে সে খুবই সজাগ ছিলো, সে খুবই সাবধান ছিলো কেউ যাতে শুনতে না-পায় আকাশভরা ঝিকিমিকি তারার তলায় সে যখন সিন্ধুরোলের গান গুনগুন করে। একদিন সকালে এলিসেন্দা যখন পেঁয়াজকলির গুচ্ছ কাটছে, তখন আচমকা মনে হ'লো হঠাৎ যেন দূর বারদরিয়ার এক ঝলক হাওয়া এসে ঢুকেছে রান্নাঘরে! তখন সে জানলায় গিয়ে দেখতে পেলে দেবদূত এই প্রথম তার ডানা ছড়িয়ে ওড়বার চেষ্টা করছে। কিন্তু এমনই অগোছালো ও অনভ্যস্ত তার এই অপচেষ্টা যে তার নখগুলো সবজিবাগানের মধ্যে গভীর সব খাঁজ কেটে দিচ্ছে। আর সে হয়তো তার জবুথবু উলটোপালটা ডানা ঝাপটানিতে আটচালাটাও ধসিয়ে দিতো, বিশেষত বারে-বারে সে যে-রকম হড়কে যাচ্ছিলো, কিছুতেই আঁটো ক'রে চেপে ধরতে পারছিলো না হাওয়া। তবু অবশ্য কেমন নড়বোড়েভাবে সে একটু উঠতে পারলে ওপরে। দেখে এলিসেন্দা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে—নিজের জন্যে স্বস্তি আর দেবদূতের জন্যেও স্বস্তি যখন সে দেখতে পেলে যে দেবদূত এখন শেষ বাড়িগুলোর ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে, কোনোরকমে সে নিজেকে ধ'রে রেখেছে উড়ালটায়, কোনো মতিচ্ছন্ন জরাগ্রস্ত শকুনের ঝুঁকিতে-ভরা ডানাঝাপটানি দিয়ে। পেঁয়াজ কাটা সারা হ'য়ে যাবার পরও এলিসেন্দা তাকে দেখতেই থাকে তাকিয়ে। দেখতেই থাকে যখন তাকে আর দেখাই সম্ভব ছিলো না—কারণ সে তো আর তখন তার জীবনের কোনো উৎপাত বা জ্বালাতন নয়, বরং সমুদ্রের দিকচক্রবালে নিছকই কাল্পনিক একটা ফুটকিই যেন।

পরিশিষ্ট ১

উইলিয়াম ফকনারের নোবেল পুরস্কার ভাষণ

কোনো ব্যক্তিমানুষ হিশেবে এই পুরস্কার আমাকে দেয়া হয়েছে ব'লে আমার মনে হয়নি, বরং দেয়া হয়েছে আমার কাজকে—মানবাত্মার মর্মযন্ত্রণা ও স্বেদরক্ত নিয়ে এক সারাজীবন-জোড়া কাজ, কোনো গৌরব জুটবে ব'লে যে-কাজ করা হয়নি, আর কোনো-কিছু লাভ করবার জন্যে তো নয়ই ; কাজটা ছিলো এই : মানবাত্মার বিভিন্ন উপাদান নিয়ে এমন-কিছু সৃষ্টি করতে হবে আগে যার কোনো অস্তিত্বই ছিলো না। কাজেই পুরস্কারটি যে আমার তা শুধু এই অর্থে যে আমি নিছক তার অছি মাত্র। এটা আমি বলতে পারি এর উৎসমুহূর্তের অভিপ্রায় বা তাৎপর্যের সঙ্গে সমানান কোনো উদ্দেশ্যে এই অর্থ উৎসর্গ করা কোনো কঠিন কাজ হবে না। কিন্তু আমি এই জয়ধ্বনির বেলাতেও সেই একই কাজ করতে চাই : এই মুহূর্তটিকে আমি ব্যবহার করতে চাই একটি শিখর হিশেবে যেখান থেকে [কথা বললে] হয়তো আমার কথা [আজকের সেই] তরুণতরুণীরা শুনতে পাবেন যাঁরা এর মধ্যেই নিজেদের উৎসর্গ করেছেন সেই একই মর্মযন্ত্রণা ও সৃষ্টিবেদনায় : এঁদের মধ্যে হয়তো এখনই এমন-কেউ আছেন যিনি, এখন আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, [ভবিষ্যতে] একদিন সেখানে এসে দাঁড়াবেন।

আজ আমাদের ট্র্যাজেডি একটি বিশ্বজোড়া সর্বব্যাপক এক শারীরিক আতঙ্ক—এতদিন ধ'রে এই আতঙ্ক আমরা বহন ক'রে এসেছি, কিন্তু এখন তা একেবারেই অসহনীয় হ'য়ে উঠেছে। আত্মার কোনো সমস্যাই আমার নেই। এখন শুধু এই প্রশ্নই আছে : কখন আমাকে বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেয়া হবে। এইজন্যেই আজ যে-তরুণতরুণীরা লিখছেন তাঁরা ভুলেই গিয়েছেন নিজের ভেতরকার সমস্যায় মানব-হৃদয় কী-রকম জট পাকিয়ে গিয়েছে—অথচ তা-ই শুধু ভালো লেখার জন্ম দিতে পারে, কেননা শুধু তা-ই লেখার যোগ্য, সব মর্মযাতনা আর স্বেদরক্তের যোগ্য।

তাঁকে আবার ফিরে শিখতে হবে সব ! নিজেকে তাঁকে শেখাতে হবে সবকিছুর মধ্যে সবচেয়ে অধম হ'লো আতঙ্কে-কুঁকড়ে-গুটিয়ে-যাওয়া ; আর নিজেকে তা শেখাবার পর, বরাবরের জন্যে তা ভুলে যেতে হবে, তাঁর কারখানাঘরে হৃদয়েরই

পুরোনো সব সত্য আর বিধান ছাড়া আর-কিছুই যেন না-থাকে, সেই পুরোনো বিশ্বব্যাপক সত্যগুলো—যা না-থাকলে সব গল্পই হয় ক্ষণস্থায়ী আর নরকগামী—ভালোবাসা আর ইজ্জৎ আর মর্যাদাবোধ আর দয়া ও দরদ আর গর্ব আর আত্মত্যাগ। যতদিন-না তিনি তা করছেন, তিনি পরিশ্রম ক'রে চলবেন এক অভিশাপের মধ্যে। তিনি লিখছেন—না, ভালোবাসার কথা নয়, কামের তাড়ার কথা; লিখছেন এমন পরাজয়ের কথা যেখানে এককোঁটাও মায়ামমতা বা দয়াদরদ নেই। তাঁর শোক কোনো বিশ্বব্যাপী অস্থিপঞ্জর নিয়ে আর্ত নয়—কোনো ঘা কোনো ক্ষতই তিনি রেখে যান না। তিনি হৃদয়ের কথা লেখেন না, লেখেন গ্রন্থি ও গ্রন্থিরসের কথা।

যতদিন-না এ-সব জিনিশ তিনি ফিরে শিখছেন তিনি এমনভাবে লিখবেন যেন তিনি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কেবলই দেখে চলেছেন মানুষের সংহার, মানুষের অবসান। আমি মানুষের অবসান মেনে নিতে অ স্বী কা র করি। এটা বলা খুবই সহজ যে মানুষ অমর কেননা সে টিকে থাকবে: যখন সর্বনাশের শেষ ঘণ্টা বেজে উঠবে ঢং ঢং ঢং আর শেষ মূল্যবিহীন শিলাখণ্ড ঝুলে থাকবে শেষ রক্তিম ও মুমূর্ষু সন্ধ্যায়, এমনকী তখনও সেখানে আরো-একটা ধ্বনি থাকবে: সেটা তার ক্ষীণ কিন্তু অফুরন্ত কণ্ঠস্বর, সে কিন্তু তখনও কথা ব'লে যাবে। আমি এটা মেনে নিতে প্র ত্যা খ্যা ন করি।

আমার বিশ্বাস মানুষ শুধুই টিকে থাকবে না—সে সফলতা পাবে। সে অমর—কিন্তু সেটা এই কারণে নয় যে প্রাণীদের মধ্যে শুধু তারই এক অফুরান কণ্ঠস্বর আছে; বরং এই কারণে যে তার আত্মা আছে—সেটা এমন-এক সত্তা যেটা মায়ামমতা ও আত্মত্যাগ ও ধৈর্যসহিষ্ণুতায় ভরপুর। কোনো কবির, কোনো লেখকের, কর্তব্য শুধু এই নিয়েই লেখা। তাঁর যে-বিশেষ অধিকার আছে, মানুষের হৃদয়কে উন্নীত ক'রে তিনি যে ধৈর্যসহিষ্ণুতায় বাঁচতে সাহায্য করতে পারেন, তাকে তিনিই মনে করিয়ে দিতে পারেন স্পর্ধা আর সাহস আর সম্মান আর আশা আর অহমিকা আর মায়ামমতা আর আত্মত্যাগ যা ছিলো তার অতীতমহিমা। নিছক মানবস্বরের প্রতিলিপি হ'য়ে-থাকার তো দরকার নেই কবির স্বরের, সেটা নানা কৃৎকৌশলের একটা হ'তে পারে, বরং আসল খুঁটিকৌশল একটাই হ'তে পারে—যা অসীম সহিষ্ণুতায় তাকে টিকিয়ে রেখে সাফল্য অর্জন করতে তাকে সাহায্য করবে।

স্টকহোম, ডিসেম্বর ১০, ১৯৫০

পরিশিষ্ট ২

লাতিন আমেরিকার নিঃসঙ্গতা

গার্সিয়া মার্কেসের নোবেল পুরস্কার ভাষণ

আন্তোনিও পিগাফেত্তা--তিনি ফ্লোরেন্সের এক নাবিক, মাগেলানের প্রথম বিশ্ব-ভ্রমণে তিনি ছিলেন তাঁর সহযাত্রী — লিখেছেন, আমাদের মধ্যরেখাসংলগ্ন আমেরিকা মহাদেশ দিয়ে যাবার সময়, এক প্রখর-যথাযথ কালপঞ্জি, যেটা মনে হয়, তাঁর [যথাযথ হবার দাবি সত্ত্বেও] কল্পনার এক তুলকালাম লাগামছেঁড়া অভিযান। তিনি বর্ণনা করেছেন তিনি নাকি এমন শুওর দেখেছেন যাদের নাভিকুণ্ডলি ছিলো তাদের পিঠে [পেটে নয়], নাকি দেখেছেন এমন অনেক পাখির প্রজাতি যাদের পা নেই, মেয়েগুলো ডিম পেড়ে তা দিচ্ছে তাদের পুরুষগুলোর পিঠে, আর এমন কোনো-কোনো পাখি যাদের দেখতে অ্যালবাট্রসের মতো, দেখেছেন এমন পাখি যাদের জিভ নেই, যাদের চঞ্চুগুলো যেন একেকটা শান-দেয়া ছুরির ফলা; পিগাফেত্তা বলেছেন তিনি দেখেছেন স্থগিতবৃদ্ধি সব প্রাণী — তাদের মুণ্ডু আর কানগুলো খচ্চরের মতো, শরীরটা উটের, পাগুলো হরিণীর, আর মৃদু হ্রেষাধ্বনিগুলো ঘোড়ার। তিনি বলেছেন পাতাগোনিয়ায় প্রথম যে-বাসিন্দাটির সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়েছিলো তাকে তাঁরা একটা আয়নার সামনে দাঁড় করিয়েছিলেন, আর তার নিজের প্রতিরূপ দেখে নাকি আতঙ্কে উত্তেজিত সেই মানুষটির বুদ্ধিশুদ্ধি সব অমনি লোপ পেয়ে গিয়েছিলো।

এই ছোট্ট দুর্ধর্ষ মনোমুগ্ধকর পুথিটি — এরই মধ্যে সে তো একটু-আধটু দেখাতে শুরু করেছে আমাদের আজকের সব আখ্যায়িকার বীজগুলো — আমাদের বাস্তবতারই একটি অতীব বিস্ময়কর স্বীকৃতিপত্র, এবং তা ঐ সময়ের বাস্তবতারও দলিল। ইণ্ডিয়াগুলোর কালপঞ্জিলেখকরা আমাদের আরো-অগুনতি [লেখা] উত্তরাধিকার হিশেবে দিয়ে গিয়েছেন। এল দোরাদো, আমাদের সেই অলীক এবং বিপুলভাবে গূঢ়-লেখাঙ্কিত দেশটি, বহু-বহু দীর্ঘ বছর জুড়ে অগুনতি মানচিত্রে দেখা দিয়েছে — মানচিত্রআঁকিয়ের কল্পনা অনুযায়ী সে অবশ্য তার আকৃতি আর অবস্থান বারে-বারে পালটেছে। চিরযৌবনের ফোয়ারার খোঁজে বেরিয়ে পৌরাণিক আলভার নুনিয়েস

কাবেসা দে ভাকা ন-বছর ধ'রে তন্নতন্ন ক'রে সন্ধান চালিয়েছিলেন মেহিকোর উত্তরে খ্যাপাটে এক অভিযানে যার শেষে অভিযাত্রীরা পরস্পরকে খেয়ে ফেলেছিলো—যে-ছশো জন অভিযানে বেরিয়েছিলো তার মধ্যে শেষটায় মাত্র পাঁচজন বেঁচে ফিরেছিলো। অনেক যে-সব রহস্যের কোনো সমাধান করা যায়নি তার মধ্যে একটা হ'লো এগারো হাজার খচ্চরের রহস্য, যাদের প্রত্যেকের পিঠে চাপানো ছিলো একশো পাউণ্ড ক'রে সোনার তাল : তারা একদিন বেরিয়েছিলো কুস্‌কো থেকে, আতাউয়ালপার মুক্তিপণ পৌঁছে দেবে ব'লে, অথচ কোনোদিনই যারা তাদের গন্তব্যে এসে পৌঁছোয়নি। পরে, উপনিবেশ স্থাপনের প্রক্রিয়া যখন পুরোদমে চলেছে, বদ্বীপের মধ্যে পালন করা হয়েছিলো কিছু মুরগি, যাদের বিক্রি করা হয়েছিলো কার্তাহেনা দে ইন্দিয়াসে, আর তাদের পাকস্থলির মধ্যে পাওয়া গিয়েছিলো খুদে-খুদে সোনার ঢেলা। সোনা সম্বন্ধে আমাদের প্রতিষ্ঠাতাদের এই তীব্র লালসা ও আবেশ আমাদের পেছন-পেছন ধেয়ে এসেছে এই কিছুকাল আগে অব্দি। এই-তো, গত শতাব্দীতেও, এক আলেমান শিবির—তাদের ওপর দায়িত্ব ছিলো পানামার যোজকের মধ্য দিয়ে রেলপথ তৈরির সম্ভাবনা কতটা খতিয়ে দেখা—শেষটায় এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছিলো যে প্রকল্পটি কাজে পরিণত করা যেতেই পারে, তবে একটাই শর্ত : রেলপথগুলো যেন লোহায় বানানো না-হয়, সে-ধাতু এ-অঞ্চলে দুর্লভ, বরং যেন বানানো হয় সোনায়।

এস্পানি অধীনতা থেকে মুক্তিলাভও কিন্তু আমাদের এই অস্থির বিকার থেকে রেহাই দেয়নি। হেনেরাল আন্তোনিও লোপেস দে সান্তানা, তিন-তিনবার যিনি মেহিকোর একনায়ক বা ডিক্টেটর হয়েছিলেন, কবর দিয়েছিলেন, বেজায় জমকালো এক অন্ত্যেষ্টি উৎসবে, তাঁর ডান পা—যেটা তিনি খুইয়েছিলেন তথাকথিত 'পিঠে-পার্বণের যুদ্ধে' [ওয়ার অভ দি কেকস]। হেনেরাল গাবরিয়েল গার্সিয়া মোরেনো ষোলো বছর শাসন করেছিলেন একুয়াদোর, পরম ভট্টারক একচ্ছত্র অধিপতি হিশেবে, আর তাঁর মৃতদেহ, বর্মখচিত পদকভূষিত, পুরো জমকালো উর্দির কাফনে সাজিয়ে, বসানো ছিলো রাষ্ট্রপতির সিংহাসনে। হেনেরাল মাহিমিলিয়ানো এরনান্দেস মার্তিনেস—এল সালভাদোরের সেই দিব্যজ্ঞানী স্বৈরাচারী শাসক—যিনি এক বর্বর নৃশংস নির্বিচার তাণ্ডবে বধ করেছিলেন তিরিশ হাজার চাষীকে—একটা ঘড়ি উদ্ভাবন করেছিলেন যেটা ব'লে দিতো তাঁর খাবারে কোনো বিষ দেয়া হয়েছে কিনা, স্কারলেট ফিভারের মহামারীর প্রকোপ থেকে লোককে বাঁচাবার জন্যে তিনি নিদান দিয়েছিলেন আলোগুলো সব লাল কাগজে মুড়ে রাখতে হবে।

হেনেরাল ফ্রানসিস্কো মোরাসান-এর স্মৃতিস্তম্ভ, তেগুসিগালপার প্রধান স্কোয়ারে যেটা বসানো হয়, আসলে ছিলো মার্শাল নেঈ-এর একটা প্রতিমূর্তি, পারীর এক সেকেণ্ডহ্যাণ্ড ভাস্কর্যশিল্পের দোকান থেকে সেটা কিনে আনা হয়।

এগারো বছর আগে, আমাদের কালের একজন অতি সুপ্রসিদ্ধ কবি, চিলের পাবলো নেরুদা, এই সীমান্ত [স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া] আলো ক'রে তুলেছিলেন তাঁর ভাষণে। ইওরোপের সুবিবেককে—কখনো-কখনো অবশ্য তার নৃশংস বিবেকদংশনেও—সেখানে ফেটে পড়েছিলো, আগের চাইতেও অনেক বেশি আবেগতাড়নায় ও প্রেরণায়, লাতিন আমেরিকার মায়ামূর্তির বার্তা—লাতিন আমেরিকা, সেই বিশাল ভূখণ্ড—দিব্যদ্রষ্টা পুরুষ ও ইতিহাসমান্য নারীদের সেই দেশ যাঁদের অনিঃশেষ প্রতিরোধে জট পাকিয়ে গেছে সব ব্যাপারটা—সব পুরাণ-কিংবদন্তি-পুরাবৃত্ত। কখনও একটিও শান্ত সুস্থির মুহূর্ত ছিলো না আমাদের।

একজন প্রমেথিউসকল্প রাষ্ট্রপতি [চিলের সালভাদোর আইয়েন্দে] তাঁর শিখাদাউদাউ প্রাসাদে নিহত হয়েছেন একটা আস্ত সামরিক বাহিনীর সঙ্গে একা লড়াই করতে-করতে, আর দুটি ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা—সন্দেহ প্রচণ্ড হ'লেও কখনও যদিও তার কোনো স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা হয়নি—ছিনিয়ে নিয়েছিলো আরো-একটি মহান হৃদয় এবং সেই সঙ্গে সামরিক গণতান্ত্রিক ব্যক্তিত্বকেও যিনি তাঁর দেশের মানুষের হৃত সম্মান ও মর্যাদা ফিরিয়ে এনেছিলেন। ঘটেছে পাঁচ-পাঁচটা যুদ্ধ এবং সতেরোটা কু দে'তা, উঠে এসেছে এক লুসিফারপ্রতিম একনায়ক, যে ঈশ্বরের নাম ক'রে প্রথম নির্বিচার জাতিহত্যা চালিয়েছে আমাদের কালের লাতিন আমেরিকায়। এদিকে দু-বছর বয়েসে পড়বার আগেই কুড়ি লক্ষ লাতিন আমেরিকার শিশু ম'রে যাচ্ছে, ১৯৭০ থেকে ইওরোপে যত শিশু জন্মেছে তাদের মোট যোগফলের চাইতেও বেশি। দমননীতির ফলে যারা উধাও হ'য়ে গিয়েছে তাদের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার, এ যেন আজকে যদি উপসালা নগরীর সব মানুষ কোথায় মিলিয়ে গেলো তা-ই কেউ জানতে পেলো না। অগুনতি স্ত্রীলোক গ্রেফতার হয়েছে পোয়াতি অবস্থায়, আর্হেন্তিনার জেলে-হাজতে জন্ম দিয়েছে তাদের শিশু, কিন্তু মায়েরা কেউ জানেও না কোথায় গেছে তাদের সন্তান অথবা কী-ই বা এখন তাদের পরিচয়—গোপনে, চোরাগোপ্তাভাবে, তাদের বেচে দেয়া হয়েছে যারা ছেলেপুলে দত্তক নিতে চায় তাদের কাছে অথবা তাদের অন্তরীণ ক'রে রাখা হয়েছে সামরিক কর্তৃপক্ষের অনাথ আশ্রমে। ঘটনাটা যাতে এই পথে আর না-এগোয় সেজন্যে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে এই মহাদেশে প্রায় দু-লক্ষ

নারী-পুরুষ নিহত হয়েছেন—আর একলক্ষরও বেশি মানুষ তিনটে ছোট্ট স্বেচ্ছাচারী দেশে লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত হ'য়ে চলেছেন : নিকারাগুয়া [সান্দিনিস্তারা তখন কোন্‌ত্রাদের সঙ্গে মরণপণ লড়ছে], এল সালভাদোর আর গুয়াতেমালায়। এ যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হ'তো তবে সমানুপাতিক সংখ্যা হ'তো মাত্র চার বছরে একলক্ষ ষাটহাজার মৃত্যু।

চিলে, সেই দেশ যার ঐতিহ্য অতিথিবৎসল, সেই দেশ থেকে দশ লক্ষেরও বেশি লোক পালিয়ে গিয়েছেন : তার জনসংখ্যার দশ শতাংশ। উরুগুয়াই, খুদে একটা দেশ, জনসংখ্যা পঁচিশ লক্ষ, যাকে মনে করা হ'তো এই মহাদেশের সবচাইতে সুসভ্য দেশ, সেখানে প্রতি পাঁচজনে একজন ক'রে নির্বাসনে আছেন। ১৯৭৯ থেকে এল সালভাদোরে যে-গৃহযুদ্ধ চলেছে, সেখানে প্রায় প্রতি কুড়ি মিনিট পর-পর একজন ক'রে শরণার্থী দেশ ছেড়ে চ'লে যাচ্ছেন। যদি লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের নির্বাসিতদের নিয়ে একটা দেশ গড়া হয় তবে তার জনসংখ্যা নরওয়ের সমগ্র জনসংখ্যাকেও বহুগুণ ছাপিয়ে যাবে।

আমার [অন্তত] এটা ভাবতে সাহস হয় যে এই বিশাল বাস্তবতাই—শুধু তার সাহিত্যিক অভিব্যক্তিই নয়—এ-বছর [১৯৮২] সুইডেনের সাহিত্য অ্যাকাডেমির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এটা এমন-এক বাস্তবতা যেটা শুধুমাত্র কাগজের পাতাতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং যেটা সবসময় আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে বাঁচে, প্রতি মুহূর্তে নির্ধারণ করে অগুনতি দৈনন্দিন মৃত্যু, যেটা খাদ্য জোগায় এক চিরঅতৃপ্ত সৃষ্টির প্রবাহকে, লাঞ্ছনা নির্যাতনে দুর্ভাগায় ভরা, সেইসঙ্গে সৌন্দর্যময়, দীপ্ত, এই পলাতক ও স্মৃতিমেদুর কোলোম্বিয়ার মানুষটি নিছক ভাগ্যের বদান্যতা পাওয়া মানুষ ছাড়া আর-কিছু নয়। কবি ও ভিক্ষুক, সংগীতস্রষ্টা ও প্রবক্তা, যোদ্ধা ও বদমায়েশ—সেই ঘোর দৌরাত্ম্যেভরা বাস্তবতার সমস্ত জীব, কল্পনার কাছে আমাদের অতি অল্প অনুদানই চাইতে হয়, কারণ আমাদের সামনে সবচেয়ে বড়ো যুদ্ধ এটাই যে আমাদের চাই নতুন কৃৎকৌশল—আমাদের জীবনকে বিশ্বাসযোগ্য ক'রে তোলবার জন্যে প্রচলিত কৃৎকৌশলে মোটেই কুলোয় না। এটাই, কোম্পানিয়েরোগণ, আমাদের নিঃসঙ্গতার সবচাইতে জটিল ঘোঁট।

যদি, তাহ'লে, এই-যে-সব অসুবিধে আমাদের পদে-পদে বাধা দেয়, আমরা যারা তারই নির্যাস, আমাদের এটা বুঝতে মুশকিল হয় না। যে কেন জগতের এ-প্রান্তে যুক্তিশৃঙ্খলার প্রতিভা, নিজেদের সংস্কৃতির দিগ্বিজয়ের উল্লাসে যা ভরপুর, আমাদের অবস্থা ব্যাখ্যা করবার জন্যে নির্ভরযোগ্য কোনো পদ্ধতি বার করতে

পারেনি। এটাও বোঝা যায় যে কেন তারা আমাদের মাপতে চায় সেই একই গজকাঠি দিয়ে যেটা দিয়ে তারা নিজেদের মাপে, এটা তারা ভুলে যায় যে জীবনের যে-অপূরণীয় ক্ষতি তা মোটেই সকলের জন্যে সমান [বা একরকম] নয়, কারু নিজের সারূপ্যের সন্ধান তেমনি দুঃসাধ্য ও রক্তাপ্লুত যেমন একদিন সেটা তাদের নিজেদের ছিলো। অন্য লোকের নকশা বা সংহিতা দিয়ে আমাদের বাস্তবতার আন্তর-আখ্যান দেবার চেষ্টা প্রতিবারই কেবল আমাদের ব্যবধান ও অপরিচয়ই বাড়িয়ে যায়, প্রতিবারই আরো-বেশি রুদ্ধ হ'য়ে ওঠে তা, প্রতিবারই আরো-বেশি নিঃসঙ্গ। হয়তো মাননীয় ইওরোপ আমাদের একটু বুঝতে পারতো যদি সে আমাদের দেখতে চেষ্টা করতো তার নিজের পুরাবৃত্তের মধ্য দিয়ে। যদি এটা মনে করা যায় যে লণ্ডনের প্রথম গড়পরিখা তৈরি করতে তার তিনশো বছর লেগেছিলো, আর আরো একশো বছর লেগেছিলো নিজেদের একজন বিশপ পেতে, যদি মনে করতো যে কোনো এক্রুস্কীয় নরপতি তাকে ইতিহাসে রোপণ করার আগে রোম কুড়িটি শতাব্দী কাটিয়েছিলো অনিশ্চয়তার তমসায়, যদি মনে করতো যে এমনকী ষোড়শ শতাব্দীতেও আজকের 'শান্তিপ্রিয়' সুইৎজারল্যাণ্ডের মানুষ যারা আমাদের ভোগসুখ বাড়িয়ে দেয় তাদের স্নিগ্ধ পনীর আর তাদের দুর্দম সব ঘড়ি দিয়ে, সারা ইওরোপ লণ্ডভণ্ড তোলপাড় ক'রে বেরিয়েছিলো লুণ্ঠনপ্রিয় দস্যু হিশেবে। এমনকী রেনেশাঁসের অপভূ-তেও সম্রাটের বাহিনীর বারো হাজার ভাড়াটে ধনুর্ধর অবাধ লুঠতরাজ চালিয়ে সর্বনাশ ঘটিয়েছিলো রোমের, আর ছুরির ঘায়ে জবাই করেছিলো তার আট হাজার বাসিন্দাকে।

আমি টোনিও ক্রোগারের বিভ্রমকে মূর্তিমন্ত ক'রে তুলতে চাচ্ছি না — অপাপবিদ্ধ উত্তর আর ইন্দ্রিয়াসক্ত দক্ষিণের মধ্যে মিলনের যে-স্বপ্ন সে দেখেছিলো, তা তিপ্পান্ন বছর আগে টোমাস মানকে এখানে রোমাঞ্চিত ক'রে তুলেছিলো। তবে আমি বিশ্বাস করি আলোকপ্রাপ্ত সত্তার ইওরোপীয়েরা, যাঁরা এখানেও সংগ্রাম ক'রে চলেছেন আরো-মানবিক আরো-ন্যায়পরায়ণ কোনো স্বভূমির জন্যে, তাঁরা আমাদের অনেকবেশি সাহায্য করতে পারতেন যদি তাঁরা গভীরভাবে পরিমার্জিত ক'রে নিতে পারতেন আমাদের দিকে তাকাবার ধরনটাকে। আমাদের স্বপ্নগুলোর সঙ্গে সংহতির বোধ আমাদের যে কম নিঃসঙ্গতা অনুভব করাবে তা নয় — যদি-না বৈধ অনুমোদনের ক্রিয়াকলাপ মারফৎ তাঁরা তাকে মূর্ত ক'রে তুলতে না-পারেন, জগতের সঙ্গে ব্যাবহারিক সম্পর্ক মারফৎ অলীক আশার উদ্দেশে যাঁরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন।

লাতিন আমেরিকা চায় না, তার সে-সংগতি বা উপায়ও নেই, শতরঞ্জ খেলার ছকে সেই বিশপ হ'তে যেখানে তার নিজের ইচ্ছা ব'লে কিছু থাকবে না—তার স্বাধীনতার পরিকল্পনা ও মৌলিকতা বিষয়ে অসার অদ্ভুত দানবীয় কিছুও তার নেই যে সে পশ্চিমের প্রত্যাশায় নিজেকে দীক্ষিত করবে। তৎসত্ত্বেও, নৌযাত্রার অগ্রগতি আমাদের আমেরিকাগুলো আর ইওরোপের মধ্যে অনেক দূরত্বই কমিয়ে ফেলেছে, অন্যদিকে আবার মনে হয় বাড়িয়েও দিয়েছে আমাদের সাংস্কৃতিক দূরত্ব। এটা কেন হবে যে সর্বান্তঃকরণে আমাদের যে-মৌলিকতা স্বীকার করা হয়েছে, সামাজিক পরিবর্তনের কাজে সেই আমাদেরই কঠিনপ্রখর সংগ্রামকে সন্দেহের চোখে দেখা হবে—কেন সমাজবদলের চেষ্টায় তার মৌলিকতাকে অস্বীকার করা হবে? কেন ভাবা হবে যে যে-সামাজিক ন্যায়বিচার, যা অগ্রসর ইওরোপীয়রা নিজেদের দেশে প্রতিষ্ঠা করেছে, তা লাতিন আমেরিকী লক্ষ্য নয়—ভিন্ন অবস্থায় স্পষ্ট ভিন্ন পদ্ধতি সমেত তার ন্যায়বিচারের দাবি কেন মানা হবে না? নাঃ, আমাদের ইতিহাসের হিংসাহিংস্রতা আর দুঃখবেদনা তো সেই চিরপুরাতন ও তিক্ত অন্যায় বিচারেরই ফল সংখ্যা যাদের অপরিমেয়—এমনকী যে-শলাষড়যন্ত্র হিংসা-হিংস্রতা তা দিয়ে ডিম ফুটিয়ে বার করা হয়েছে আমাদের ভবন থেকে সাড়ে-তিন হাজার লিগ দূরে। কিন্তু অনেক ইওরোপীয় নেতা ও চিন্তাবিদ বিশ্বাস ক'রে এসেছেন দুই বিরাট প্রভুর দয়া ছাড়া অন্য-কোনো সম্ভাব্য ভবিতব্য আমাদের নেই। এইই হ'লো, কোম্পানিয়েরোগণ, আমাদের নিঃসঙ্গতার আকৃতি।

তৎসত্ত্বেও, সমস্ত দমনপীড়ন, নির্যাতন, লুঠতরাজ, আত্মবিক্রয় সত্ত্বেও, আমাদের উত্তর হচ্ছে: জীবন। না বন্যা না মহামারী, না বুভুক্ষা না প্রলয়-ঝড়, এমনকী শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে চিরকাল-চলা যুদ্ধবিগ্রহেও মৃত্যুর ওপর জীবনের নাছোড় প্রাধান্যকে হ্রাস ধ'রে দিতে পারেনি। এ এমনই এক সুযোগ বা অধিকার যে তা ক্রমবৃদ্ধি পায়, দ্রুত হারে বাড়ে: প্রতিবছর সেখানে মৃত্যুর চাইতেও, বেশি হয় নবজন্ম ৭৪,০০০,০০০—নব-জীবনের এ এক এমন পরিমাণ যা নিউ-ইয়র্কের জনসংখ্যাকে প্রতিবছর সাতগুণ বাড়িয়ে দিতে পারে। তাদের বেশির ভাগই জন্মায় এমন-সব দেশে যাদের বিত্তসম্পদ খুবই কম, আর তাদের মধ্যে বলাই বাহুল্য আছে লাতিন আমেরিকা। অন্যদিকে, অধিকতর সমৃদ্ধ দেশগুলো যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করার ব্যাপারে এমনই সাফল্য লাভ করেছে যে তার একশোগুণ লোককে তারা মুহূর্তে নির্মূল ক'রে দিতে পারে, শুধু-যে আজকের পৃথিবীর সব

মানুষকেই নিশ্চিহ্ন ক'রে দিতে পারে তা নয়, এই দুর্ভাগা গ্রহে এ-যাবৎ যত মানুষ জন্ম নিয়েছে সাকুল্যে তাদের সকলকেই ধ্বংস ক'রে দিতে পারে।

আজকেরই মতো অন্য-একটি দিনে আমার গুরু, মায়েস্ত্রো, উইলিয়াম ফকনার এখানে বলেছিলেন : 'মানুষের অবসান মেনে নিতে আমি অস্বীকার করি।' যে-আসন একদিন তাঁর ছিলো সে-আসনে বসবার যোগ্য ব'লে আমি নিজেকে মনে করতাম না যদি-না আমার বিবেকে এই সত্য অবিচল থাকতো যে মানুষের জন্ম হবার পর এই প্রথম যে অতিকায় মহাপ্রলয় তিনি বত্রিশ বছর আগে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলেন তা আজ সহজ সরল বৈজ্ঞানিক সত্য [ও সম্ভাবনা]। এই ভয়াল বাস্তবতার সামনে—সমস্ত মানুষী কালে যাকে মনে হয়েছিলো নিছক কোনো কল্পলোক ব'লেই, আমরা যাঁরা কথা বানাই, কাহন গড়ি, আমরা তবু কিন্তু বিশ্বাস করি সবকিছু, বিশ্বাস করবার দাবি ও অনুভূতি রাখি যে এখনও এক বিকল্প / বিরুদ্ধ কল্পরাজ্য গড়বার কাজে আত্মনিয়োগ করার সময় আছে—এখনও সময় চ'লে যায়নি। এক নূতন ও সব-সমান-করা কল্পরাজ্য—জীবনেরই কল্পরাজ্য—যেখানে অন্যদের কাছে আর-কেউ এসে ঠিক ক'রে দেবে না তার মৃত্যুর রূপ কী হবে, যেখানে, সত্যিই, ভালোবাসা হয়ে উঠবে নিশ্চয় আর সুখ হ'য়ে উঠবে সম্ভব, যেখানে যে-সব দেশ একশো বছরের নিঃসঙ্গতার দণ্ড পেয়েছে, শেষটায়, চিরকালের জন্যে, পাবে পৃথিবীতে এক দ্বিতীয় সুযোগ।

সরলা এরেন্দিরা আর তার সঙ্গীসাথীরা